তত্ত্ববোধ
(Cognizance Of Reality)
Complied And Authored By
Sri Umacharan Mukhopadhyay

काशी के सचल विश्वनाथ

महायोगेश्वर श्री तैलंग स्वामी जी

শ্রীউমাচরণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত

বাঁশবেড়িয়া, হুগলি।

Published By

Shri Tailanga swami Math

K-23/95, Pancha Ganga Ghat, Varanasi - 221001

काशी के सचल विश्वनाथ

महायोगेश्वर श्री तैलंग स्वामी जी

प्रकाशक : श्रीश्री तैलंग स्वामी मठ

प्राप्ति स्थान : तैलंग स्वामी मठ, पंचगंगाघाट, वाराणसी

सहयोग राशि : रु. 200.00

मुद्रक : एस.टी.एस.जे. कम्प्यूटर्स
बुलानाला, वाराणसी
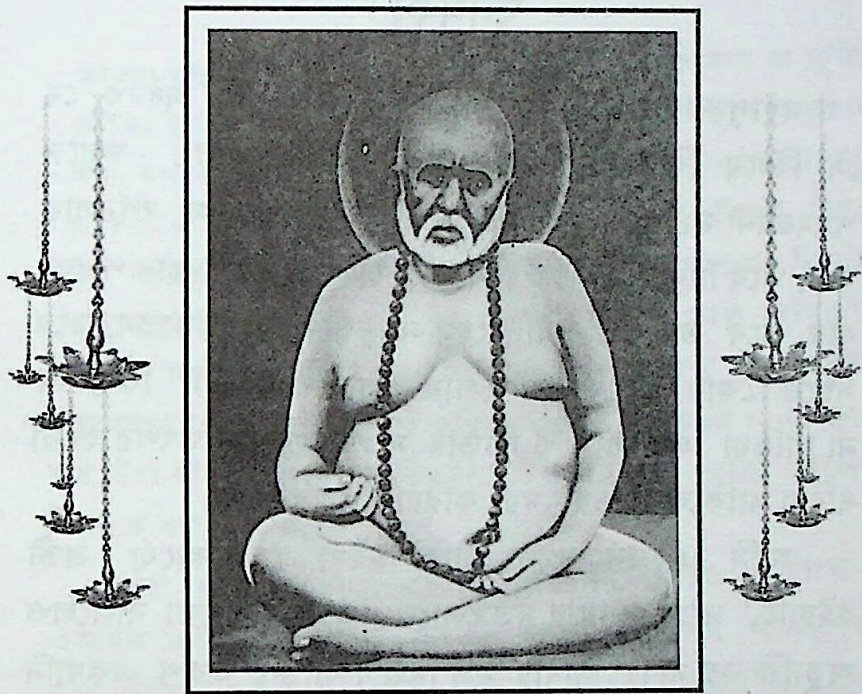
श्रीमद् शिव रामानन्द सरस्वती

आविर्भाव : 1607 ई. **तिरोधान : 1887 ई.**

पौष शुक्ल एकादशी : 1014 बी.एस. **पौष शुक्ल एकादशी : 1294 बी.एस.**

योगीन्द्राय नमस्तुभ्यं त्यागीष्वराय वै नमः।
भूमानन्द स्वरूपाय तैलंग स्वामीने नमः ।।

ভূমিকা

মহাপুরুষগণের নিকট সকলেই ঋণী। এ অধমও যে সে বিষয়ে বিশেষরূপে ঋণী তাহা বলাই বাহুল্য। জগতে পরমজ্ঞানী মহাপুরুষ অতি দুর্ল্লভ। যদি ভাগ্যক্রমে দর্শনলাভ ঘটে, তবে নিকটে বসিতে দেন না; যদিও বসিবার স্থান পাওয়া যায়, তবে ভালরূপ কথা কহেন না; যদিও কথা কহেন, তবে সহজে কোন উপদেশ বা উপায় বলিয়া দেন না। কিন্তু সঙ্গ না ছাড়িয়া অধ্যবসায় ও দৃঢ়তার সহিত একমনে তৎপর হইয়া ধরিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই দয়া করিয়া থাকেন।

আমি একজন নগণ্য ব্যক্তি হইয়া যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি, তাহা আমার মত লোকের পক্ষে বাতুলতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমার মত নির্গুণ ব্যক্তির এরূপ একখানি গ্রন্থ সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাওয়া, আর বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার আশা করা উভয়ই সমান। আমি নিজে নির্গুণ, তবে পরমারাধ্য শ্রীমৎ গুরুদেবের কৃপাই আমার একমাত্র বল, কেবল তাঁহারই বলে বলীয়ান্ হইয়া, ও তাঁহারই শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া এবং মহাপুরুষদিগের সাহায্যে বহু আয়াস, যত্ন, উদ্যম ও অধ্যবসায় সহকারে এই সমস্ত গুরুতর বিষয় সংগ্রহ করিয়া আজ পুস্তকাকারে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি।

লোকে যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হউক না কেন, মূলে তাহার

কামনা থাকে,—অর্থ কামনা, যশ কামনা, বিষয় কামনা বা মুক্তি কামনা ইত্যাদি। আমার এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া, অর্থ কামনায়ও নহে, যশ কামনায়ও নহে, বিষয় কামনায়ও নহে; তবে কামনা একেবারে নাই, তাহাও নহে। মহাপুরুষদিগের নিকট যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তাহা সাধারণ মহাত্মাগণের নিকট প্রকাশ করাই আমার ইচ্ছা, কেননা কোন একটী ভাল সামগ্রী পাইলে সকলে মিলিয়া ভোগ করিলে বড়ই আনন্দ হয়; সেই জন্য সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। এক্ষণে যদি ইহা দ্বারা সাধারণের কিছুমাত্র উপকার হয়, তাহা হইলে নিজেকে ধন্য মনে করিব।

আর্য্য জাতির জীবন প্রদীপ প্রায় নির্ব্বাপিত হইয়াছে। একদিন এই আর্য্য-সন্তান মাত্রেই মহাপুরুষদিগের সৎগুণের মালা গাঁথিয়া গলায় পরিতেন, এক্ষণে সকলের হৃদয় আর সে হৃদয় নাই, মালা গাঁথিয়া পরিবার ইচ্ছাও নাই; কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আজকাল অনেকের মনের ভাব কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে; বর্ত্তমান সময়ে দেখা যায় যে, অনেকের প্রাণে আবার সেই শক্তি ও ইচ্ছা বলবতী হইতেছে; তাহাতে আশা করা যায়, সেই আর্য্য-সন্তান সহৃদয় মহোদয়গণের নিকট যে এরূপ উপদেশপূর্ণ একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ মহা আদরের বস্তু হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

বিনীত—
গ্রন্থকার।

উৎসর্গ।

যাঁহার অপরিসীম দয়া ও অসীম স্নেহের গুণে হৃদয়ের
আবিলতা দূর হইয়া
ভক্তিভাব প্রস্ফুরিত হইয়াছে,
যিনি অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিয়া
হৃদয়ে নির্ম্মল ও পবিত্র জ্ঞানালোক সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন,
যিনি সংসার সমুদ্রের অগাধ সলিলরাশির ভীষণ আবর্ত্তে
একমাত্র কর্ণধার হইয়া
পথ নির্দ্দেশন করিয়া দিতেছেন,
যিনি কৃপা করিয়া নিজ করুণাকল্পতরুর সুশীতল চরণছায়ায়
এ অধমকে আশ্রয় দান করিয়া
চিরশ্রান্তি বিদূরিত করিয়া দিয়াছেন,
যিনি আমার মেঘাচ্ছাদিত ঘোরান্ধকারময় হৃদয়াকাশে
ধ্রুবতারা রূপে সর্ব্বক্ষণ বিরাজিত,
যাঁহার পবিত্র করস্পর্শে
আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত,
সেই পরমারাধ্য, শ্রদ্ধাস্পদ, ভক্তিভাজন শ্রীমৎ গুরুদেবের
শ্রীচরণ কমলে,
এই অমূল্যরত্ন ভক্তি পুষ্পাঞ্জলিরূপে
উৎসর্গীকৃত
হইল।

"দাসানুদাস উমাচরণ"

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

বিষয়			পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীউমাচরণ মুখোপাধ্যায়।

তত্ত্ববোধ

প্রথম অধ্যায়

বিশ্ব বা জগৎ

সমস্ত পৃথিবীকে বিশ্ব বলিয়া জানা যায়। ইহা কি প্রকারে উৎপন্ন হইল, তাহা জানা আবশ্যক। প্রথমতঃ, বিন্দু কাহাকে বলে ? যাহার অস্তিত্ব আছে, অংশ নাই, তাহাই বিন্দু। বিন্দু-সমষ্টিই মহৎ বস্তু। বিন্দুসমষ্টির যোগে একটি মহান্ পদার্থ; আবার ঐ মহান্ পদার্থের অংশানু-অংশই বিন্দু। পঞ্চভূত ও কালের পরমাণু-সমষ্টি লইয়া এই জগৎ সৃষ্ট হই-য়াছে; অর্থাৎ মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এবং কালের পরমাণু-সমষ্টি লইয়া এই বিশাল জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। বিশ্বের যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, যে বস্তুতে বুদ্ধিপ্রয়োগ করি, তাহা-তেই দুইটি পদার্থের অনুমান প্রতীত হয়,—একটি চিৎ আর একটি অচিৎ। চিৎ জ্ঞাতা রূপে, অচিৎ জ্ঞেয় রূপে; চিৎ ভোক্তা রূপে, অচিৎ ভোগ্য রূপে বিরাজিত। চিৎ সৎ, তাহার বিকার নাই, সুতরাং অপরিণামী, নিত্যকাল একরূপেই স্থিত, সেই জন্য ধ্বংসরহিত, সুতরাং সৎ। আর অচিৎ বিকারী, সেই

জন্য পরিণামী, সুতরাং ধ্বংসশীল ও অসৎ। সেই হেতু বিশ্ব সদাত্মক বিন্দুসমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

একগাছি কেশের অগ্রভাগকে শত ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার এক ভাগকে সহস্র অংশে বিভক্ত কর, পরে ঐ সহস্রাংশের একাংশকে পুনরায় অর্দ্ধাংশ করিয়া তাহার এক এক অংশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলে, এক একটি অংশ যেরূপ সূক্ষ্ম হয়, চিন্ময় ব্রহ্মও সেইরূপ সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম পদার্থ। ইহা দ্বারা চিদ্-বিন্দুসমষ্টি-যোগে মহৎ চিদ্‌ব্রহ্ম। বিশ্ব যখন এক চিতেরই বিকাশ, সেই মহৎ চিৎই যখন বিন্দুসমষ্টি, তখন বিশ্বও বিন্দু-সমষ্টি।

যাহার শব্দ আছে শ্রুত হয় না, স্পর্শ আছে অনুভূত হয় না, রূপ আছে দৃষ্ট হয় না, রস আছে স্বাদ পাওয়া যায় না, গন্ধ আছে ঘ্রাণ পাওয়া যায় না,—এইপ্রকার যে আধার, তাহাই শক্তিবিন্দু। মনে কর, তুমি একটা কার্য্য করিতেছ, ঘণ্টা দুই পরে তোমার ক্লান্তিবোধ হইল। কেন ক্লান্তি বোধ হইল? পাঁচ মিনিট কার্য্য করিয়া কোন পরিশ্রম বোধ হয় নাই। ইহার কারণ এই, দুই ঘণ্টা কার্য্য করিয়া তোমার যতখানি শক্তিবিন্দু হ্রাস হইয়াছে, পাঁচ মিনিট কার্য্য করিয়া তোমার ততখানি শক্তিবিন্দু হ্রাস হয় নাই, প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই বিন্দু বিন্দু করিয়া শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে; তাহা না হইলে দুই ঘণ্টা পরে কেন পরিশ্রম বোধ হইল? ইহাতেই অনুমান করা যাইতে পারে—প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই শক্তি কিছু কিছু করিয়া হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছিল, পাঁচ মিনিটে অনুভব হয় নাই, দুই ঘণ্টায়

তাহা অনুভব হইল। একবারেই শক্তিবিন্দু কমে নাই, এক-বারেই পরিশ্রম অনুভব হয় নাই, বিন্দু বিন্দু করিয়া, বিন্দু বিন্দু বোধে দুই ঘণ্টা পরে তাহা অনুভূত হইল। বালকেরা একেবারে শক্তিশালী হয় না, ক্রমে ক্রমে বিন্দু বিন্দু শক্তি আয়ত্ত করিয়া বিশেষ শক্তিশালী হয়; শক্তির আয়ত্ততাই বৃহত্ব। ছোট আমে কম রস, বড় আমে বেশী রস; ইহার কারণ এই, বড় আমে রসবিন্দু যত বেশী আছে, ছোট আমে তত নাই; রসের কম বেশী লইয়াই আমের ক্ষুদ্রত্ব ও বৃহত্ব। এই বিশ্বমধ্যে যাহা কিছু আছে, সমস্তই এইপ্রকার। ইহাই শক্তির বিন্দুবিভাগ।

প্রকৃতির যাহা শেষ বিভাজ্য,—যাহা আর ভাগ করা যায় না, বিভাগের যাহা শেষ সীমা, তাহাই পরমাণু। পদার্থ মাত্রেই বিভাজ্য। শক্তির যাহা শেষ বিভাগ, তাহাই বিন্দু; প্রকৃতির যাহা শেষ বিভাগ, তাহাই পরমাণু; সুতরাং বিন্দু ও পরমাণু একই পদার্থ, কারণ শক্তি ও প্রকৃতি একই পদার্থ। জগৎ পরমাণুপুঞ্জ। বিন্দু বিন্দু মৃত্তিকার যোগে বড় বড় পাহাড় হইয়াছে, বিন্দু বিন্দু জলে বৃহৎ সমুদ্র হইয়াছে, বিন্দু বিন্দু তেজে বৃহৎ সূর্য্য হইয়াছে। বিশ্ব যখন শক্তির বিকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়, আবার সেই শক্তি যখন বিন্দুসমষ্টি, তখন বিশ্বও বিন্দুসমষ্টি।

বিশ্ব যখন শক্তির বিকাশ, তখন বিশ্ব সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক বিন্দুসমষ্টি। বিশ্বের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতিও বিন্দুসমষ্টি। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম বিন্দুসমষ্টি। বিন্দু বিন্দু কাল-যোগে কলা, বিন্দু বিন্দু কলা-

যোগে কাষ্ঠা, বিন্দু বিন্দু কাষ্ঠা-যোগে এক অনুপল ; এই প্রকারে বিপল, পল, দণ্ড, প্রহর, সমস্তই বিন্দুসমষ্টি ; সুতরাং কাল বিন্দুসমষ্টি। বিন্দু বিন্দু ব্যোম-যোগে এই মহাব্যোম ; সুতরাং মহাব্যোমও বিন্দুসমষ্টি। সেইরূপে বিন্দু বিন্দু যোগে এই বিশ্ব বা জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে ; সুতরাং বিশ্ব বিন্দুময়,—বিশ্বও বিন্দুসমষ্টি ব্যতীত আর কিছু নহে।

যে যে বস্তু জন্মে, তাহারই স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণাম, পরিবর্ত্তন, ক্ষয় বা হ্রাস ও বিনাশ হয়। আত্মা ব্যতীত সকল পদার্থই পরিণামী। চেতন হউক, অচেতন হউক, স্থাবর হউক, জঙ্গম হউক, অচল হউক বা সচল হউক, মহানগর হউক বা মহা বিজন হউক, সাগর হউক বা শৈল হউক,—আব্রহ্ম কীট পর্য্যন্ত কেহই কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। রজোগুণ বিশ্বব্যাপী; প্রকৃতির রজোগুণে সকলকে অবশ ভাবে কর্ম্ম করিতেই হইবে। কেহই কর্ম্ম ছাড়া থাকিতে পারিবে না, প্রকৃতি দেবীর ইহাই আদেশ। এই যে জড় পদার্থ লতা ও বৃক্ষ দেখিতেছ, এই যে পৃথিবী, পর্ব্বত, গ্রহ, উপগ্রহ দেখিতেছ, ইহারাও অবশ ভাবে নিরন্তর কর্ম্ম করিতেছে ; জড়জগতে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ কার্য্য নিয়তই চলিতেছে ; এক মুহূর্ত্তও কর্ম্মগতির বিরাম নাই,—ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, স্ববশে হউক, অবশে হউক, ক্ষুদ্রতম কীট হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত কেহই কর্ম্মশূন্য হইয়া সংসারে থাকিতে পারিবে না,—আদ্যা শক্তি মহামায়ার ইহাই অভিপ্রায়, সুতরাং বিশ্ব কর্ম্মশীল।

বিশ্ব বা জগৎ

বিশ্ব গতিশীল ও কর্ম্মশীল বলিয়া অপূর্ণ। যাহা পরিবর্ত্তনশীল, তাহাই গতিশীল। যাহা গতিশীল, তাহাই জগৎ। গন্তব্য স্থান প্রাপ্ত হয় নাই যে, গতিশীল সে। গন্তব্যস্থানে যে পর্য্যন্ত কোনও পদার্থ পঁহুছিতে না পারে, যে স্থানে পঁহুছিলে আর চলিবার প্রয়োজন থাকে না অর্থাৎ বাঞ্ছিতস্থানে না পঁহুছান পর্য্যন্ত পদার্থের গতি। যখন জগৎ নিয়ত গতিশীল, অবিরাম গতিতে অনন্তাভিমুখে ছুটিয়াছে, অবিরাম গতাগতির উপর রহিয়াছে, তখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, এখন পর্য্যন্ত গন্তব্য স্থানে পঁহুছায় নাই, বা বাঞ্ছিত স্থান বা বস্তু এখন পর্য্যন্ত পায় নাই। যদি গন্তব্য স্থানে পঁহুছিত, তবে গতি স্থির হইত, গতাগতির বিরাম হইত ; তাহা যখন হয় নাই, তখন বিশ্ব অপূর্ণ।

বিশ্ব যে কারণে গতিশীল, সেই কারণেই ক্রিয়াশীল। ক্রিয়াশীল কে ? বাঞ্ছিত পদার্থ পায় নাই যে। বাঞ্ছিত পদার্থ পায় নাই কে ? কর্ম্মশীল যে। সেই ক্রিয়াশীল, যে বাঞ্ছিত পায় নাই ; সেই বাঞ্ছিত পায় নাই, যে ক্রিয়াশীল। যে কর্ম্মশীল, বাঞ্ছিত পায় নাই, সেই অপূর্ণ। বাঞ্ছিত পদার্থ না পাওয়া পর্য্যন্তই ক্রিয়া। জগতের যে কোনও পদার্থের যে কোনও ক্রিয়া হউক, সকলেরই মূল বাঞ্ছিত-পদার্থ-প্রাপ্তি ; অর্থাৎ প্রাণী মাত্রেই অভীষ্ট প্রাপ্তির জন্য ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয় ; অভীষ্ট প্রাপ্ত হইলে ক্রিয়াও নিবৃত্ত হয়। জগৎ যখন ক্রিয়াশীল তখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, এখন পর্য্যন্ত অভীষ্ট প্রাপ্ত হয় নাই ; যদি

অভীষ্ট প্রাপ্ত হইত, তবে কর্ম্মের বিরতি হইত, কর্ম্মচক্র স্থগিত হইত। অপূর্ণই পূর্ণ হইবার চেষ্টা করে, অভাববিশিষ্ট হইলেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়; বাঞ্ছিত পদার্থ যাহার করগত হয় নাই, সেই কর্ম্মপরায়ণ হয়, কর্ম্মে তাহারই অধিকার, কর্ম্মভূমিতে অবশ ভাবে তাহারাই যাতায়াত করিয়া থাকে। জগৎ কর্ম্মভূমি, কর্ম্ম বা পরিবর্ত্তনই জগতের রূপ। কোনও জাগতিক পদার্থই কর্ম্মশূন্য হইয়া ক্ষণকালের জন্যও থাকিতে পারে না। যাহা অপূর্ণ, তাহাই কর্ম্মশীল। সংসার যখন কর্ম্মশীল, তখন নিশ্চয়ই বাঞ্ছিত পদার্থ পায় নাই, সুতরাং অপূর্ণ; সেইজন্য বিশ্বও অপূর্ণ।

সাধারণ রঙ্গভূমির নাট্যশালাতে নাটক অভিনয় দেখিতে যাইলে প্রত্যেক পট-পরিবর্ত্তনেই যেমন নূতন নূতন দৃশ্য দর্শকের নয়নগোচর হইয়া থাকে, সেইরূপ ভব-রঙ্গভূমেও প্রত্যেক পট-পরিবর্ত্তনেই অভিনব দৃশ্য দর্শকের দৃষ্টিতে ভাসমান হয়, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ধীরভাবে জগৎ-রঙ্গভূমির নাটকাভিনয় পর্য্যবেক্ষণ করিলে দ্রষ্টা বুঝিতে পারেন যে, বিশ্বনাটক-অভিনেতৃগণ প্রত্যেক পট-পরিবর্ত্তনেই অভিনব দৃশ্য তাহার সম্মুখে ধরিলেও তাহার কোনটাই নূতন নহে; তাহারা এমন কোনও দৃশ্য দেখাইতে পারে না, যাহার কোন-না-কোন অংশ পূর্ব্বদৃষ্ট দৃশ্যের সদৃশ নহে। এরূপ কোনও অভিনয় বিশ্বরঙ্গভূমিতে অভিনীত হয় না, যাহা পূর্ব্বাভিনীত অভিনয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। বিশ্বনাট্যালয় শূন্য নহে

বিশ্ব বা জগৎ

ইহার অভিনেতৃবর্গ তালজ্ঞান-বিহীন নয়। বিশ্ব যখন এক-বার আবির্ভাব, একবার তিরোভাব হইতেছে, তখন ইহা নিয়ত গতিশীল, নিয়ত নর্ত্তনশীল। গতিমাত্রেরই তাল আছে, ক্রিয়ামাত্রেই তালে তালে হইয়া থাকে। কাল ও ক্রিয়ার যাহা মান, প্রতিষ্ঠ নিয়ম হেতু, তাহাকে তাল বলে। বিশ্ব তাল-বিহীন নহে। জগতের আবির্ভাব, স্থিতি ও তিরোভাব তালে তালেই হইতেছে, অনিয়মে হয় না; অনিয়মে হইলে জগতের অস্তিত্ব থাকিত না। সমুদ্রে তরঙ্গের পর তরঙ্গ, লহরীর পর লহরী উঠিতেছে, পড়িতেছে, ছুটিতেছে, তাহাও তালে তালে হইতেছে। যাহার যাহা নিয়ম, তাহাই তাহার তাল। যে-কোনরূপ রাগিণী হউক না কেন, তাহাই ষড়্জাদি-স্বরযুক্ত হইবে, মধ্যমানাদি-তালযুক্ত হইবে। বিশ্ব-বীণা তালে বাজে, প্রকৃতি-নর্ত্তকী তালে নৃত্য করে। জগৎ-গায়ক তালে গায়, অর্থাৎ জগৎ নিয়মাধীন। জগৎ অনিয়মে পরিবর্ত্তন হয় না। জন্মাদি-জড়ভাব বিকার নির্দ্দিষ্ট-নিয়মাধীন। বিশ্ব-নাট্যশালা একটি অপূর্ব্ব রঙ্গালয়, এ রঙ্গের বিরাম নাই।

জগৎ অনিত্য, জাগতিক পদার্থ অস্থায়ী। জাগতিক পদার্থের যোগ বিয়োগ অনিত্য হইলেও তাত্ত্বিক পদার্থ নিত্য, জগৎ প্রবাহরূপে নিত্য। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় বা আবির্ভাব ও তিরোভাবাত্মক জগৎ অনাদিকাল হইতে আছে এবং অনন্ত কালের জন্য থাকিবে। যে সূর্য্য, চন্দ্র, দ্যুলোক, ভূলোক, দেব, মনুষ্য এখন দেখিতেছি, হয় ত ইহারা থাকিবে না; কিন্তু না

থাকিলেও, অন্য পদার্থ এই স্থান অধিকার করিবে, সুতরাং ইহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই, ইহা অনাদিকাল হইতে আছে, থাকিবেও অনন্ত কালের জন্য। বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে উদ্ভিদ, উদ্ভিদ হইতে পত্র, পুষ্প ও ফলের উৎপত্তি হয়, তাহার পর আবার তাহার ক্রমে অবনতি হইয়া থাকে। প্রকৃতিতে সকলই নিত্য নূতন,—নিত্য উৎপত্তি, উৎপত্তির পর শৈশব, শৈশবের পর যৌবন, যৌবনের পর বার্দ্ধক্য, আবার বার্দ্ধক্যের পর বাল্য ইত্যাদি। এইরূপে নিত্যই প্রলয়, নিত্যই উৎপত্তি, নিত্যই নবভাব। কাহারও এককালে লয় নাই, শূন্যত্ব নাই ; কেবল অবস্থান্তর। কাহারও হঠাৎ উৎপত্তি হয় না, কাহারও শূন্য হইতে আবির্ভাব হয় না। যাহা ছিল তাহাই আসিতেছে, যাইতেছে, আবার আসিতেছে। কিছুই শূন্য ছিল না, বা শূন্য হইবে না ; কেবল পরিবর্ত্তন, কেবল নবভাবের আবির্ভাব মাত্র। এই নিয়মেই সমুদ্র, পর্ব্বত, ক্ষিতি, তেজ, অঙ্কুর, বৃক্ষ, কীট, পতঙ্গ,—এই নিয়মেই মানব,—এই নিয়মেই দানব—আসিতেছে, যাইতেছে, আবার আসিতেছে।

সমুদ্রবক্ষে তরঙ্গ উঠিয়া সমুদ্রেই লীন হয়, আবার সমুদ্রবক্ষেই উঠে, পড়ে ; সেইরূপ বিশ্বের যে সকল পদার্থকে আমরা যায় আসে মনে করি, তাহারা বিশ্বের মধ্যেই যায় আসে, আগন্তুক নূতন কিছু আসে না, নূতন কিছু যায় না ; যাহা আসে তাহাই যায়, যাহা যায় তাহাই আসে। অসতের উৎপত্তি ও সতের ধ্বংস নাই সুতরাং একটু যায়ও না, আসেও না, জগৎ যাহা

তাহাই আছে। যাহাকে আমরা যায় মনে করি, সে রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়া অন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় এই মাত্র বিশেষ; পদার্থ যাহা তাহাই থাকে, কেবল ভাবান্তর মাত্র; সুতরাং জগতের কিছু যায়ও না আসেও না।

জগৎ যখন একমাত্র প্রকৃতিরই বিকাশ, শক্তিরই বিকাশ, শক্তিরই খেলা; সেই শক্তিই যখন স্ত্রীলিঙ্গ, তখন বিশ্বও স্ত্রীলিঙ্গ। বিশ্ব—শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধময়, সুতরাং শক্তিময়; বিশ্ব—ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ও ব্যোমময়, সুতরাং প্রকৃতিময়। জগতের আদ্যন্ত যখন শক্তিময় ও প্রকৃতিময়, তখন বিশ্ব স্ত্রীলিঙ্গময়। যাহাকে আমরা পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া মনে করি, তাহা একমাত্র স্ত্রীলিঙ্গেরই নানা সাজ; যেমন একজন স্ত্রীলোক—কাহারও মাতা, কাহারও কন্যা, কাহারও ভগিনী, কাহারও পত্নী ইত্যাদি নানারূপ উপাধি ধারণ করে, সেইরূপ একই স্ত্রীলিঙ্গের কোনরকম বিকাশকে আমরা পুংলিঙ্গ ও কোনরকম বিকাশকে ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া থাকি। এই স্ত্রীলিঙ্গেই রঙ্গ, আদ্যা শক্তি বা মূল প্রকৃতির খেলা।

পতির শরীর-মধ্যে যে চিতের বিকাশ, পত্নীর শরীর-মধ্যেও সেই চিতের বিকাশ; পতির মধ্যে যে চিৎপুরুষ রহিয়াছেন, পত্নীর মধ্যেও সেই চিৎপুরুষ রহিয়াছেন; চিৎ সম্বন্ধে উভয়ই সমান। চিৎশরীরে ও সূক্ষ্মশরীরে লিঙ্গভেদ নাই; একমাত্র চিৎশরীরই ভোগায়তন, তাহাতেই লিঙ্গভেদ কল্পিত হয়। কেবল স্থূল শরীরের লিঙ্গভেদ হইয়া থাকে। পঞ্চ-

ভূতের দ্বারা গঠিত যে শরীর, তাহাই স্থুল শরীর, সুতরাং উহাও স্ত্রীলিঙ্গ। পতির স্থুল শরীর যাহার দ্বারা গঠিত, পত্নীর স্থুল শরীরও তাহারই দ্বারা গঠিত; উভয়েই প্রকৃতি সম্বন্ধে সমান, সুতরাং উভয়ে স্ত্রীলিঙ্গ সম্বন্ধেও সমান। পতি ও পত্নী চিৎ সম্বন্ধে এক পাইলাম, সূক্ষ্ম শরীর সম্বন্ধে এক পাইলাম, স্থুল শরীর সম্বন্ধেও এক সমান পাইলাম, প্রকৃতি ও শক্তি উভয় সম্বন্ধই সমান পাইলাম; সুতরাং স্ত্রী ও পুরুষের ভেদ কোথায় রহিল ? সব একলিঙ্গ ও একপ্রকার হইয়া গেল। এক স্ত্রীলিঙ্গেরই লিঙ্গভেদ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। এক স্ত্রীলিঙ্গের উপর পুংলিঙ্গের মহানর্ত্তন এই মহাবিশ্ব। স্ত্রী পুরুষের আলিঙ্গন যাহা, তাহা পরস্পর স্থুল শরীরেই হইয়া থাকে; সুতরাং বলিতে হইবে, স্ত্রীলিঙ্গই স্ত্রীলিঙ্গকে আলিঙ্গন করিতেছে, প্রকৃতিই প্রকৃতিকে সম্ভোগ করিতেছে। তুমি যাহা দেখিতেছ, ধরিতেছ, তাহা প্রকৃতিই প্রকৃতিকে দেখিতেছে ও ধরিতেছে। যদি বল, এ সকল মনের কার্য্য, অহঙ্কারের কার্য্য, তাহা ঠিক; তাহারও প্রকৃতি স্ত্রীলিঙ্গ; অর্থাৎ আমি, তুমি, তিনি—সমস্তই প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছু নহে। আত্মা সম্বন্ধে পুরুষে যাহা, স্ত্রীতেও তাহা। যাহা কিছু ভেদ—শরীর সম্বন্ধে।

শরীর দুইপ্রকার—স্থুল শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর। এই অস্থি-চর্ম্মাবৃত স্থুল শরীরের ভিতর সূক্ষ্ম শরীর রহিয়াছে; সূক্ষ্ম শরীর শক্ত্যাত্মক, শক্তির অষ্টাদশ অবয়ব দ্বারা সূক্ষ্ম শরীর গঠিত। শক্তি স্ত্রীলিঙ্গবাচক, সুতরাং সূক্ষ্ম শরীর স্ত্রীলিঙ্গ। স্থুল শরীর

বিশ্ব বা জগৎ

প্রকৃতাত্মক : প্রকৃতি স্ত্রীলিঙ্গবাচক, সুতরাং স্থূল শরীরও স্ত্রীলিঙ্গ। বিশ্বের সমস্তই যদি স্ত্রীলিঙ্গ হইল, তবে পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গভেদ কোথা হইতে আসিল? যেমন হস্তের পাঁচটি আঙ্গুল, একই উপাদানে গঠিত অথচ আকৃতিতে ভিন্ন,—কোনটা ছোট, কোনটা বড়, নামগত ভেদ মাত্র, যেমন অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা, সেইরূপ একই স্ত্রীলিঙ্গ উপাদানে সর্ব্ব বিশ্ব গঠিত, আকৃতিগত ও নামগত ভেদে পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ লিঙ্গভেদ কল্পিত হইতেছে।

"বিশ্ব-মূল" খুঁজিতে গিয়া দেখি, কেহ বলেন মূল দুই, কেহ বলেন তিন, কেহ বলেন বহু, এইপ্রকার মতভেদ। বেদান্ত ও সাংখ্যের মত দুই না হইলে সৃষ্টি হয় না, সুতরাং মূল দুই। গণিত-ভায়া বলেন, দাদারা সকলেই দিগ্‌গজ পণ্ডিত বটেন, কিন্তু মূলে ভুল। যদি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যায়, তিন ও দুয়ের মূল কি? তখন তাঁহারা মাথা চুলকাইবেন। শত বল, সহস্র বল, দশ বল, বিশ বল, এক বাদ দিবার কাহারও সাধ্য নাই; এক বাদ দিলে সকলেই অস্তিত্ব হারায়, মূল নির্ম্মূল হইয়া পড়ে। লক্ষ বল, অনন্ত বল, কোটী বল, সকলেরই মূল এক; এক সকলের মধ্যে আছে, এক সকলের মূলে দণ্ডায়মান; কিন্তু একের মূলে কেহই নাই। একের বিকাশ অনন্ত, সহস্রকে ভাগ কর, একে যাইয়া পর্য্যবসিত হইবে। কিন্তু একাকে অনন্ত ভাগ কর, একই অবশিষ্ট থাকিবে, কদাচ শূন্য হইবে না। শত শূন্য যোগ দিলেও এক হইবে না। সুতরাং শূন্যবাদীদের শূন্য

হইতে জগৎ-আবির্ভাব কল্পনা ভ্রম ভিন্ন আর কি বলিব ? বেদান্তের দ্বৈত কল্পনা ব্রহ্ম ও মায়া, সাংখ্যের দ্বৈত কল্পনা প্রকৃতি ও পুরুষ ভ্রম। একের বিকাশ দুই, তাই অমূল বেদ মূল বাহির করিলেন এক বা একমেবাদ্বিতীয়ম্ ; সুতরাং বিশ্বমূল এক। বিশ্ব অনন্ত ; ব্যোমের যদি অন্ত কল্পনা করিতে পার, তবে অনন্ত বিশ্বেরও অন্ত কল্পনা করিও, নচেৎ করিও না।

এমন কোনও সৃষ্টি নাই, যাহার আদি আছে। এমন কোনও প্রলয় নাই, যাহার পর আর সৃষ্টি নাই। এমন কোনও মহাপ্রলয় নাই, যাহা অনন্ত বিশ্বকে ধ্বংস করে। মহাপ্রলয়ে কোনও কোনও বিশ্ব, বিশ্ববীজে লীন হয় ; সর্ব্বধ্বংসরূপ মহাপ্রলয় কস্মিন্‌কালে হয় নাই, হইবেও না। কালের যদি আদি কল্পনা করিতে পার, তবে সৃষ্টির আদি কল্পনা করিও। আর কালের যদি আদি কল্পনা করিতে না পার, তবে সৃষ্টিরও আদি কল্পনা করিও না। কালের আদি অন্ত যাহা, সৃষ্টিরও আদি অন্ত তাহা। বিশ্ব অনাদিকাল হইতে একবার ব্যক্ত আর একবার অব্যক্ত এইরূপে আবর্ত্তিত হইতেছে, হইবেও অনন্ত কালের জন্য।

তুমি বিছানায় শয়ন কর যে কারণে, বিশ্বও অব্যক্তে শয়ন করে সেই কারণে। তোমার বিছানায় শয়ন করিবার অর্থ এই যে, দিবসে নানা কার্য্যে পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইয়াছ, সেই ক্লান্তি নিবারণার্থ বিছানায় শয়ন করিয়া রাত্রে নিদ্রা যাও। বিশ্বও দিবসের কার্য্যে ক্লান্ত হইয়া তাহা নিবারণ করিবার

বিশ্ব বা জগৎ

জন্তু রাত্রে অব্যক্ত প্রকৃতিশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যায়। তোমার যেমন দিবা রাত্রি আছে, বিশ্বেরও সেইরূপ দিবা রাত্রি আছে। তুমি ক্ষুদ্র, তোমার দিবা রাত্রিও ক্ষুদ্র; বিশ্ব বড়, তাহার দিবা রাত্রিও বড়। তোমার সামান্য পরিশ্রমের পর সামান্য নিদ্রা; বিশ্বের মহাপরিশ্রমের পর মহানিদ্রা। তুমি যেমন এই নিয়মে অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছ এবং চলিবেও অনন্ত কাল; বিশ্বও সেইরূপ এই নিয়মে অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, এবং চলিতে থাকিবেও অনন্ত কাল; ইহাই প্রলয় ও মহাপ্রলয়। তুমি নিদ্রাভঙ্গে যেমন জাগরিত হও, বিশ্বও সুষুপ্তিভঙ্গে সেইরূপ জাগরিত হয়। তোমার নিদ্রাভঙ্গের যে কারণ, জগৎসুষুপ্তি ভঙ্গেরও সেই কারণ। বিশ্বেরও জাগ্রৎ সুষুপ্তির নিয়ম আছে। তোমার যেমন সারাদিন জাগিবার নিয়ম এবং রাত্রে নিদ্রা যাইবার নিয়ম। বিশ্বেরও সেই নিয়ম। বিশ্বও যতক্ষণ জাগিবে, ততক্ষণ নিদ্রা যাইবে।

আমাদের যেমন ছোট নিশা বড় নিশা আছে, বিশ্বেরও সেইরূপ ছোট নিশা বড় নিশা আছে। আমাদের ছোট নিশা গ্রীষ্মকালের রাত্রি, বড় নিশা শীতকালের রাত্রি। বিশ্বেরও মন্বন্তরপ্রলয়, দিবাপ্রলয় ছোট নিশা; মহাপ্রলয় মহানিশা। মন্বন্তরপ্রলয়ে মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক ব্যতীত তাবৎ সংসার প্রলয়শয্যায় শয়ন করে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি ৭১ বার অতিক্রান্ত হইলে এক মন্বন্তর হয়। এইপ্রকার রাত্রি; ইহাই বিশ্বের ছোট রাত্রি। এই প্রকারে

তত্ত্ববোধ

চতুর্দ্দশ মনুর অবসানে ব্রহ্মার একদিন অতিবাহিত হয় ; ব্রহ্মার রাত্রিও এইরূপ। বিশ্বেরও দিবা রাত্রি এইরূপ। বিশ্বের মহারাত্রি হইতেছে মহাপ্রলয়, তাহাই বিশ্বের বড় নিশা ; মহাপ্রলয়ে আব্রহ্ম কীট কিছুই থাকে না। ৮০০০০০৬৪০০০০০০০, আট পদ্ম চৌষট্টি কোটী সংবৎসরে ব্রহ্মার অহোরাত্র ; এইরূপ শত বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু।

আর্য্যভূমি ভারতবর্ষ

ভারত-শ্রেষ্ঠ স্থান নাই, আর্য্য-শ্রেষ্ঠ জাতি নাই, ব্রহ্মচর্য্য-শ্রেষ্ঠ শক্তি নাই, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। ভারত, রাজর্ষি-পালিত এক-মাত্র আদি স্থান। মহামোক্ষধাম, মহাপুণ্যস্থান, মহাতীর্থস্থান যে আর্য্যভূমি, তাহাই ভারতবর্ষ। প্রভা-বর্ষণে বড় যে স্থান, তাহাই ভারতবর্ষ। যাহা সর্ব্বপ্রভার স্থান অর্থাৎ যে স্থানে সকল পদার্থের দীপ্তি, সকল পদার্থের প্রকাশ আছে, যে ভাণ্ডারে সকল পদার্থেরই এবং সমস্ত রত্নের সমাবেশ আছে, তাহাই ভারতবর্ষ। তপোবলে প্রভাবিত যে ব্রহ্মলোক, তাহা এই ভারতেরই প্রভা। সূর্য্য, চন্দ্র, ধ্রুব, নক্ষত্রাদির যে প্রভা, তাহা এই ভারতেরই প্রভা। জ্ঞান বিজ্ঞানে আলোকিত যে মহর্লোকাদি, তাহা এই ভারতেরই দীপ্তি। বেদ, বেদান্ত, দর্শন, সাহিত্য, আয়ুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ব-বেদ, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতির যে প্রভা, তাহা এই ভারতেরই প্রভা। সুতরাং সর্ব্বপদার্থের আকর যে স্থান, সর্ব্বপ্রভা বর্ষণের কেন্দ্র যে স্থান, তাহাই ভারতবর্ষ।

যাহা বিশ্বকেন্দ্র, তাহাই ভারতবর্ষ। কেন্দ্রস্থানেই সকল পদার্থের সংযোগ, সকল পদার্থের প্রকাশ। পদার্থের যাহা কিছু শক্তি, যাহা কিছু ভাব, যাহা কিছু কার্য্য, সমস্তই কেন্দ্র হইতে বহির্গত হয়। কেন্দ্রে যাহার প্রকাশ নাই, বিস্তারেও তাহার বিকাশ নাই; বিস্তারে যাহার প্রকাশ আছে, কেন্দ্রেও তাহার

বিকাশ আছে ; সুতরাং বিস্তারিত বিশ্বে যে পদার্থের বিকাশ আছে, বিশ্বকেন্দ্রেও সেই পদার্থের প্রকাশ আছে। সকল পদার্থই কেন্দ্র-আশ্রয়ী, সকল পদার্থেরই কেন্দ্র আছে। বিশ্ব যখন পদার্থ, তখন বিশ্বেরও কেন্দ্র আছে। যাহা বিশ্বকেন্দ্র, তাহাই ভারতবর্ষ ; সুতরাং ভারতে সর্ব্বপদার্থেরই সমাবেশ আছে। যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই সৃষ্টিতে ; যাহা আছে সৃষ্টিতে, তাহা আছে ভারতে ; সুতরাং ভারত বিশ্বকেন্দ্র। ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি—কর্ম্মস্থান ; ভারত ছাড়া আর সমস্তই নরক ও ভোগস্থান। কর্ম্ম ব্যতীত ভোগ অসিদ্ধ। আব্রহ্ম কীট সকলই ভোগদেহ, একমাত্র আর্য্যজীবনই কর্ম্মদেহ। ব্রহ্ম-লোকাদি যখন ভোগস্থান, ব্রহ্মকায়াদি যখন ভোগদেহ, তখন তাহাদিগের কর্ম্মদেহ এবং কর্ম্মস্থান থাকা চাই ; সেই কর্ম্ম-স্থান ভারতবর্ষ, এবং কর্ম্মদেহই আর্য্যদেহ। যে ব্রহ্মজ্ঞান-প্রভায় প্রভাবিত ব্রহ্মলোক, সেই ব্রহ্মার ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তির কর্ম্ম-স্থান এই ভারতবর্ষ এবং কর্ম্মদেহ আর্য্যদেহ। দেবের দেবত্ব, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, পশুর পশুত্ব, কীটের কীটত্ব, সমস্তই ভার-তের আর্য্যের কর্ম্ম। এই ভারতে যে যেরূপ কর্ম্ম করিবে, সে সেইরূপ ফল পাইবে। সৎকার্য্য কর, ক্রমেই ঊর্দ্ধগতি হইয়া ব্রহ্মত্ব, শেষে মুক্তি পর্য্যন্ত পাইবে। অসৎ কার্য্য কর, ক্রমে অধোগতি হইয়া কীটাদি নারকী গতি প্রাপ্ত হইবে।

মনুষ্যজীবন জীবশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী অবস্থা। এই মনুষ্য-জন্মে যিনি যেরূপ কর্ম্ম করিবেন, তিনি তদুপযুক্ত লোকে গমন

করিবেন। দেবের দেবত্ব, পশুর পশুত্ব, সমস্ত শক্তিই আর্য্য-শক্তির অন্তর্নিবিষ্ট ; সমস্ত শক্তিই মনুষ্যশক্তিতে নিহিত আছে ; মনুষ্য সর্ব্বশক্তির আধার। ভারতের সমস্তই যখন ভোগস্থান—স্বর্গই হউক বা নরকই হউক ; বিশ্ব যখন প্রাণিব্যাপ্ত—দেবই হউক, পশুই হউক বা কীটই হউক ; সমস্তই ভারত হইতে আগত।' বিশ্ব আর্য্যময়, আর্য্য প্রাণিময়। ভারতের আর্য্য-জীবনের কর্ম্মের ফল হইতে উৎপন্ন ভোগাক্রান্ত তমোগুণী জন্মই পশুপক্ষ্যাদি ভোগদেহ, সত্ত্বগুণান্বিত দেহই দেবদেহ। বিশ্ব যখন প্রাণিব্যাপ্ত, সুতরাং বলিতে হইবে বিশ্ব আর্য্যময়, আর্য্য প্রাণিময় ; সুতরাং ভারতবর্ষ বিশ্বকেন্দ্র, এবং আর্য্য শক্তি-কেন্দ্র।

যত কিছু শক্তি, সমস্তই মনুষ্য-সমাবেশ ; অন্য যত কিছু শক্তি, সমস্তই বদ্ধশক্তি। মনুষ্যশক্তিকে দেবগুণে উন্নত কর, দেবত্ব প্রাপ্ত হইবে ; পশুগুণে অবনত কর, পশুত্ব প্রাপ্ত হইবে। মনুষ্যকেন্দ্র হইতে দেবতাও নির্গত হইয়াছে, পশুও নির্গত হইয়াছে : যাহার যেরূপ কর্ম্ম, তাহার সেইরূপ জন্ম।

শক্তি দুইপ্রকার,—বদ্ধশক্তি ও মুক্তশক্তি। যে শক্তি বাড়াইবার উপায় নাই, তাহাই বদ্ধ শক্তি ; আর যে শক্তি বাড়াইবার উপায় আছে, তাহাই মুক্ত শক্তি। একমাত্র মনুষ্যই মুক্ত শক্তির অধিকারী। আব্রহ্ম কীট সকলই বদ্ধ শক্তির অধিকারী। দেব ও পশু যে শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই শক্তিই ভোগ করিতেছে ; তাহাদের সেই শক্তির উৎকর্ষ

বা বর্দ্ধন করিবার উপায় নাই, কারণ প্রকৃতি কর্ত্তৃক সীমাবদ্ধ। ইন্দ্র যদি ইচ্ছা করেন, আমি ইন্দ্রত্বে অবস্থিতি করিয়া কর্ম্ম-প্রভাবে শক্তি বর্দ্ধিত করিয়া ব্রহ্মত্ব লইব, তাহা তিনি পারিবেন না; সেইরূপ পশু পক্ষী কাহারও কোন ক্ষমতা নাই। আর্য্য ছাড়া অন্যান্য জীবগণের জ্ঞান কেবল আহারবিহারাদি-ভোগ-মূলক। ইহারা যে জ্ঞানের সহিত জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, যাব-জ্জীবন তাহাই লইয়া বাস করে; সহজাত জ্ঞানের বৃদ্ধি করিবার শক্তি বা সহজাত জ্ঞানকে অতিক্রম করিবার সামর্থ্য ইহাদের নাই, অর্থাৎ প্রকৃতিদত্ত সীমা লঙ্ঘন করিতে ইহারা পারে না। মনুষ্য কিন্তু তাহার বিপরীত, মনুষ্য যাহা ইচ্ছা করিবে, তাহাই করিবার তার শক্তি আছে।

ব্রহ্মা যদি মনে করেন আমি মুক্ত হইব, মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিব, তাহা তিনি পারেন না; তাঁহার সীমাবদ্ধ আয়ুর অন্তে মুক্ত হইবেন। দেবতারা মন্বন্তরজীবী; যদি কেহ মনে করেন মরিয়া যন্ত্রণার হাত এড়াইব, তাহা পারিবেন না; মন্বন্তরের এদিকে কিছুতেই মৃত্যু নাই। আবার যদি মনে করেন মন্বন্তরের অতীতে বাঁচিব, তাহাও পারিবেন না; কারণ ভোগদেহ কর্ম্ম-রহিত, সুতরাং সহজাত ক্ষমতার বৃদ্ধি নাই। পক্ষান্তরে মনুষ্য সকলই পারে; মনুষ্য ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্ত্তেই মরিতে পারে, ইচ্ছা করিলে দেবায়ুর অধিক বাঁচিতে পারে, ইচ্ছা করিলে এই জীবনে দেবত্ব লইতে পারে, পশুত্ব লইতে পারে, ব্রহ্মত্ব লইতে পারে, এমন কি মুক্তি পর্য্যন্ত লইতে পারে। যদি বল, দেবতারা

আর্য্যভূমি ভারতবর্ষ

অণিমাদি-ঐশ্বর্য্যশালী, তবে কেন মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ হইবেন না? না হইবার কারণ এই, শক্তি স্বোপার্জ্জিত নহে, জ্ঞানোৎকর্ষ হেতু প্রাপ্ত নহে; প্রকৃতিদত্ত। যেমন মধুমক্ষিকা সুন্দর মধুচক্র নির্ম্মাণ করে, মনুষ্য তাহা পারে না; তাই বলিয়া কি মনুষ্য, শক্তিতে অথবা জ্ঞানে মধুমক্ষিকা হইতে ন্যূন? ইহাও সেইরূপ। মনুষ্য যখন এই জীবনে ঈশ্বরত্ব লইতে পারে, তখন অণিমাদি ত অতি তুচ্ছ বিষয়। ইহা দ্বারা বেশ জানা যায় যে, শক্তিতে আর্য্য শ্রেষ্ঠ; সেইজন্য দেবতারাও আর্য্যভূমি ভারতে মনুষ্যজন্ম গ্রহণকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন।

স্বর্গের দেবত্ব অপেক্ষাও ভারতে মনুষ্যদেহ লাভ করা, ভাগ্যবানেরই হইয়া থাকে; কেননা সুকৃতিগণই ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বর্গভোগ ও মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। এই ভারতে পুরুষগণ জন্মলাভ করিয়া স্ব স্ব সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কর্ম্ম করিয়া যথাক্রমে আপনাদের স্বর্গ ও নরকগতি আপনারই বিধান করে; যে হেতু এই ভারতে সকল ব্যক্তির সকলপ্রকার গতিই কর্ম্মানুসারে হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম সর্ব্বপুরুষার্থের সাধন বলিয়া দেবতারাও গান করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, এই সকল মানব কি অনির্ব্বচনীয় পুণ্য করিয়াছিল, যেহেতু স্বয়ং ভগবান্ সাধন ব্যতিরেকেও ইহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। এই সকল লোক ভারতভূমির মধ্যে মানবকুলে মুকুন্দসেবার উপযোগী জন্ম লাভ করিয়াছেন; আর আমরা কল্পান্ত পর্য্যন্ত

পরমায়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া এই যে স্বর্গরাজ্য জয় করিয়াছি, ইহার পরেও ত আবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে; অতএব আমাদের এস্থান জয় করা অপেক্ষা, মানবগণ অল্পায়ু হইয়া যে ভারতভূমি জয় করে, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ সেই সকল ব্যক্তি মানবদেহ দ্বারা, ক্ষণকালেই স্ব স্ব কৃতকর্ম্ম দ্বারা ভগবানের অভয়পদ বা মুক্তিপদ সম্যক্ প্রকারে প্রাপ্ত হইতে পারে, যাহা আমরা কিছুতেই পারি না।

যে সকল প্রাণী এই ভারতভূমিতে জ্ঞান, ক্রিয়া ও ঐশ্বর্য্য-পূর্ণ মানবজন্ম প্রাপ্ত হইয়াও মোক্ষার্থ যত্ন না করে, তাহারা পক্ষীদিগের ন্যায় পুনরায় বন্ধন প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ জালবদ্ধ পক্ষিগণ ব্যাধ কর্ত্তৃক মুক্ত হইয়াও পুনর্ব্বার যেমন অসাবধানতা প্রযুক্ত সেই বৃক্ষে বিহার করিতে গেলে বদ্ধ হয়, তাহাদের ন্যায় ঐ সকল লোক ভারতভূমিতে মোক্ষার্থ জন্মলাভ করিয়াও স্ব স্ব কর্ম্মদোষে পুনর্ব্বার বদ্ধ হয়।

ভারতে যে যাহা কামনা করিয়া ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাই তাহার সফল হয়। ভারতবর্ষ প্রকৃতি দেবীর লীলাভূমি। প্রকৃতিতে যাহা কিছু ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য আছে, ভারতে তাহার কিছুরই অভাব নাই। প্রকৃতি সমগ্র পৃথিবীর যে প্রদেশে যে ভাবে বিরাজিত, এই ভারতবর্ষে সেই সেই ভাবেই বিরাজমান। পরমেশ্বর প্রকৃতির সেই রূপ, সেই দৃশ্য, সেই চিত্র, সেই ঐশ্বর্য্য ও সেই মাধুর্য্য ভূমণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন ভাগে যথাযোগ্য ভাবে জীবের ভোগের নিমিত্ত অর্পণ করিয়া, পরে ঐ সকল ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্যের

আৰ্য্যভূমি ভারতবর্ষ

একত্র সমাবেশে কিপ্রকার শোভা হয় দেখিবার জন্যই যেন, ধরাধামে আদর্শস্বরূপ আর্য্যজাতির লীলাক্ষেত্র কর্ম্মভূমি ভারত-ভূমির সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রকৃতিতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহার কিছু আভাস ভারতে পাওয়া যায় না। ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যপূর্ণ সর্ব্ববিধ দৃশ্য একত্র ভারত ভিন্ন আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।

ভারত যেমন সৃষ্টিবৈচিত্র্যের পূর্ণ লীলাভূমি, এমন আর পৃথিবীতে দ্বিতীয় দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারতের ভূভাগ যত প্রকারের উদ্ভিদ ও শস্য প্রসব করিতে সমর্থ, পৃথিবীর কোন একটি এমন দেশ দেখিতে পাওয়া যায় না, যে তাহার প্রতি-যোগিতা করিতে সমর্থ হয়। ভারতের পর্ব্বতমালার নিকট ভূমণ্ডলের সমস্ত শৈলশিখর মস্তক অবনত করিয়া রহিয়াছে। গন্ধপুষ্পে সুশোভিত, বিচিত্র সৌরভে আমোদিত ভারতের বন উপবন চিত্র বিচিত্র রঙ্গে ত্রিজগতের মন ভুলাইতে যেমন সমর্থ, পৃথিবীর কোন বন উপবন তাদৃশ রূপের ছটা লইয়া তাহাদের পরিচর্য্যার আসনও গ্রহণ করিতে পারে না। পৃথিবীর দক্ষিণ প্রান্তে একটি গৌরবর্ণ মনুষ্য জন্মান যেমন কঠিন, উত্তরপ্রান্তেও সেইরূপ একটি কৃষ্ণকায় মনুষ্য জন্মান অসম্ভব ; কিন্তু ভগবানের বিচিত্র বিহারভূমি ভারতবর্ষে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। কি জানি, ভগবান্ কিরূপ তুলাদণ্ডে তৌল করিয়া তাঁহার অনন্ত শক্তি-রাশির অনন্ত বিকাশভাণ্ডার সাম্যাবস্থায় এই ভূমিতে, স্তরে স্তরে, থরে থরে, সাজাইয়া রাখিয়াছেন। অন্যান্য দেশের কোথাও কেবল কৃষ্ণবর্ণ কোথাও কেবল গৌরবর্ণ, কোথাও

কেবল কপিলবর্ণ ইত্যাদির মেলা বসিয়াছে। ভারতে কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ, শ্যামবর্ণ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, গৌরবর্ণ, অথবা পৃথিবীর কোষে যত বর্ণমালা আছে, সকল বর্ণের ঢেউ খেলিয়া ভারত-মহিমাকে অবর্ণনীয় করিয়া তুলিয়াছে। অতি শীতে পৃথিবীর কত দেশ চিরদিন থর থর কাঁপিতেছে, অতি তাপের জ্বালায় কত দেশ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে ; কিন্তু ভারতের বিচিত্র প্রকৃতিতে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত, সকল ঋতুই সখ্যভাবে হাত ধরাধরি করিয়া নিয়মপূর্ব্বক যথাসময়ে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। ভারতপ্রকৃতির শিল্পশালায় যাহা চাহিবে, তাহাই পাইবে। একই স্থানে বসিয়া যদি পৃথিবীর সকল স্থানের শোভা সমৃদ্ধি, সুখ সম্ভোগ করিতে হয়, তবে এক ভারতেই বসিয়া তাহা করিতে পারা যায়। সকল রসই ভারতপ্রকৃতির পদসেবা করিয়া ঝির ঝির ধীর ধীর ধারায় বহিয়া যাইতেছে। যিনি যে রসের রসিক হউন না কেন— ভারতের বিচিত্র রসময়ী প্রকৃতি তাঁহার সাধ মিটাইতে সমর্থ হইবে। ভারতনিবাসীই আদিম মনুষ্য, আদিম শিক্ষিত, আদিম সভ্য, আদিম কবি, আদিম বিজ্ঞানবিৎ, আদিম ধার্ম্মিক, আদিম জ্ঞানী, আদিম যোগী, আদিম মননশীল, এবং আদিম ভগবদ্‌ভক্ত। আদিম শাস্ত্র, আদিম ভাষা, ভারতবর্ষেই প্রথম প্রচারিত হয়। এই সেই ভারতবর্ষ, যেখানে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য বক্তা, বশিষ্ঠাদি উপদেষ্টা, শুকদেবাদি তপস্বী জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সেই অগস্ত্যমুনির জন্মস্থান ভারতবর্ষ, যিনি

আর্য্যভুমি ভারতবর্ষ

গণ্ডুষে সপ্তসমুদ্র শোষণ করিয়াছিলেন। বাল্মীকির কোমল প্রকৃতি ও ভক্তিভাব, বশিষ্ঠের ক্ষমা ও শান্ত ভাব, কর্ণের বদান্যতা ও বৈরাগ্যভাব—জানি না কি কুহকে সমস্তই যেন, নাট্যশালায় অভিনয়ের ন্যায়, কিছুক্ষণের জন্য কিয়ৎ পরিমাণে কার্য্য করিয়া, লীলাময়ীর লীলাপটের অন্তরালে প্রবেশ করিল।

এই সেই ভারতবর্ষ, যাহার কন্দরে কন্দরে, গুহায় গুহায়, কত তেজঃপুঞ্জ মহা মহা যোগী ও ঋষিগণ ধ্যানস্তিমিত নেত্রে মহাধ্যানে মগ্ন আছেন। এই সেই ভারত—রাজর্ষি-পালিত রত্নাকরবেষ্টিত রত্নবর্ষি ভারতবর্ষ, যেখানে আদ্যা শক্তি পতিতপাবনী গঙ্গা পতিতপাবন গাঙ্গেয়কে গর্ভে ধারণ করিয়া ভীষ্মজননী নামে খ্যাত হইয়াছেন। এই সেই ভারত, যেখানে সুরধুনী সুরলোক ত্যাগ করিয়া আর্য্যগলে বরমাল্য দোলাইবার জন্য মর্ত্তে আগমন করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়াছেন। এই সেই ভারত, যেখানে পতিতপাবনী গঙ্গা কুল্ কুল্ নাদে প্রবাহিত হইতেছেন, যাঁহার পবিত্র বারিতে কত পাপী তাপী উদ্ধার পাইতেছে, যাঁহার তটে ঘাটে কত তপস্তেজঃপূর্ণ তাপসগণ, মুনিগণ ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীযুক্ত সামগান করিতেন,—যে সামধ্বনিতে গন্ধর্ব্বলোক, দেবলোক, ব্রহ্মলোক পুলকিত হইত। যেখানে সামগানে পাষাণ বিগলিত, শক্তি দ্রবীভূত হইত, আজ সেই ভারত কালের বশে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিয়াছে, ইহা অপেক্ষা আমাদের দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে!

তত্ত্ববোধ

বিশ্ব বা জগৎ দুই ভাগে বিভক্ত,—এক আর্য্য বিশ্ব, আর এক অনার্য্য বিশ্ব। শক্তিকেন্দ্র মনুষ্য এবং বিশ্বকেন্দ্র ভারত। প্রাণীও দুইভাগে বিভক্ত,—এক আর্য্য আর এক অনার্য্য। শক্তিও দুইভাগে বিভক্ত,—এক আর্য্যশক্তি আর এক অনার্য্যশক্তি। যে শক্তি সত্ত্বগুণী, তাহাই আর্য্যশক্তি; যাহা রজঃ ও তমোগুণী শক্তি, তাহাই অনার্য্যশক্তি। যাহাদের বিধিতে উপবাসের ব্যবস্থা আছে, তাহারাই আর্য্য। উপবাসবর্জ্জিত অর্থাৎ যাহাদের বিধিতে উপবাসের নিয়ম নাই, তাহারাই অনার্য্য।

উপবাস কারে বলি? পাপ হইতে নিবৃত্ত এবং সর্ব্বভোগবর্জ্জিত যে অবস্থা, তাহাই উপবাস। সাধারণতঃ অনশনকেই উপবাস বলা হয়। একমাত্র অনশনে সমস্ত কুপ্রবৃত্তি অর্থাৎ রজঃ ও তমোগুণ দমিত থাকে, সুতরাং সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হয়। উপবাস সত্ত্বগুণ-বর্দ্ধক, অনুপবাস তমোগুণ-বর্দ্ধক; সত্ত্বগুণ-বর্দ্ধক উপবাস বিধেয়। বিধিবদ্ধ যে জাতি, তাহাই আর্য্যজাতি; উপবাসবর্জ্জিত যে প্রাণী, তাহাই অনার্য্য। উপবাসব্রতী প্রাণী যে স্থানে বাস করে, তাহাই আর্য্যবিশ্ব; আর উপবাসবর্জ্জিত প্রাণী যে স্থানে বাস করে, তাহাই অনার্য্যবিশ্ব। আর্য্যবিশ্ব ভারত, অনার্য্যবিশ্ব ভারত ব্যতীত সমস্ত দেশ। আর্য্যবিশ্ব কর্ম্মভূমি, আর অনার্য্যবিশ্ব স্বেচ্ছাবিধিচালিত একমাত্র ভোগস্থান যে সকল দেশ। যেহেতু ভোগস্থান, সেই হেতু কর্ম্মবর্জ্জিত, সুতরাং বিধিবর্জ্জিত। আব্রহ্ম কীট সকলই অনার্য্য, যে হেতু উপবাসবর্জ্জিত। আর্য্য আশ্রয়, অনার্য্য আশ্রয়ী।

আর্য্যভূমি ভারতবর্ষ

আর্য্য দাতা, অনার্য্য গ্রহীতা। অনার্য্য প্রাণী সকলেই আর্য্যদত্ত অন্ন ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। উপবাসব্রত ভারতে আর্য্য ছাড়া আর কাহারও নাই; কারণ তাহারা কর্ম্মী নয়, কেবল ভোগী; ভোগী বলিয়াই ক্ষুধাতুর, ক্ষুধাতুর বলিয়াই সকলেই আর্য্যের শরণপ্রার্থী—আর্য্যগৃহে অতিথি। একমাত্র আর্য্যই অতিথিসৎকারী—নিজে না খাইয়াও অতিথিকে দেয়, আর্য্যগৃহে দেবতারাও অতিথি।

বিশ্বে একমাত্র আর্য্যই রক্ষক। বিমল সত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট আর্য্যের মহাবিজ্ঞান—রক্ষা পাইবার উপায় আবিষ্কারের হস্ত, সকলকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত। নিজের প্রাণ অন্যকে দিয়া অপরের জীবন বাঁচাইতে আর্য্যই অভ্যস্ত, ইহারা ভিন্ন আর কেহ নাই। আর্য্যের সত্ত্বগুণী বুদ্ধির বিমল বিকাশ হইতে বিমল মহাবিজ্ঞান আবিষ্কৃত হইয়া থাকে।

যাঁহারা মহাবিজ্ঞানে আরূঢ় হইয়া মৃতকে অমৃতময়, অশান্তিকে শান্তময়, দুঃখকে সুখময় করিয়াছেন,—রাক্ষসিক, পৈশাচিক ও পাশবিক তমোগুণ হইতে রক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য। বহু জন্মের পুণ্যপ্রভাবে ভারতে আর্য্যজন্ম লাভ হয়। ভারতে যখন আর্য্যজন্ম লাভ হইবে, তখনই প্রাণ শীতল হইবে, জীবন কৃতার্থ হইবে, ধার্ম্মিক ও পুণ্যবান্ হইবে, সুতরাং মুক্তির অধিকারী হইবে।

অহংতত্ত্ব

অহংতত্ত্ব শব্দের অর্থ—আমি কে? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গেলেই বিষম সমস্যায় পতিত হইতে হয়। মনে মনে স্থিরচিত্তে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের প্রতি যখন দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, তখন মনে সর্ব্বদাই এই প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, কি জন্য আসিয়াছি, কে আনিয়াছে, কি জন্য আনিয়াছে, আমার কর্ত্তব্যকার্য্য কি, যে কার্য্যের জন্য আসিয়াছি তাহারই বা করিলাম কি? যখন কোন মানব তাঁহার আকৃতি, প্রকৃতি, শক্তি ও অবস্থিতির বিষয় আলোচনা করিতে করিতে বাহ্যজগৎ পর্য্যবেক্ষণ করেন, তখনই এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার চিন্তাপথে পতিত হইয়া, একটি অতি ক্ষুদ্র ও একটি অতি বৃহৎ, এই দুইটি পরস্পরবিরোধী ভাবের আবির্ভাব করাইয়া দেয়। তিনি তখন বোধ করেন, আমি যে পৃথিবীতে বাস করিতেছি, তাহা এই অসীম বিশ্ব সম্বন্ধে, একটি ক্ষুদ্র বালুকাকণা হইতেও ক্ষুদ্রতর এবং আমি স্বয়ং স্বকীয় ক্ষমতাবলে, বুদ্ধিবলে, সসাগরা ধরার ও সমস্ত জীবের উপর আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াও ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্রতর। ক্ষুদ্রতম নিকৃষ্ট কীটের যে দশা, আমি উৎকৃষ্ট মানব—আমারও সেই দশা। সেও কালে উৎপত্তি দ্বারা প্রকাশ

পাইয়া সুখ দুঃখ, আহার নিদ্রা, ধর্ম্ম কর্ম্ম ভোগ করিয়া কালেই বিলীন হইতেছে, আমিও কালধর্ম্মে জন্মলাভ করিয়াছি এবং সুখ দুঃখ, আহার নিদ্রা, ধর্ম্ম কর্ম্ম উপভোগ করিয়া আবার কাল-গর্ভেই মিশিয়া যাইব। এই কি আমি ? এই কি আমার পরি-ণাম ? এই পর্য্যন্তই কি আমার আমিত্বের শেষ ? কি কার্য্য করিতে আসিয়াছি, কি করিয়াই বা যাইব ?

ভাবনা বা চিন্তা, ইহা জ্ঞান-ক্রিয়া ; ভাবিতেছি বা চিন্তা করিতেছি বলিলে বুঝা যায় যে, এক্ষণে জ্ঞান কার্য্য করিতেছে, কার্য্যমাত্রই শক্তিসাধ্য ; জ্ঞান কার্য্য করিতেছে বলিলে বুঝা যায়, আত্মশক্তির প্রকাশ হইতেছে। শক্তিমাত্রই সত্ত্বাশ্রিত, বিনা আশ্রয়ে শক্তি থাকিতে পারে না। আত্মশক্তি আছে বলিয়াই, মূলে ধীমান্ চেতন পুরুষ অর্থাৎ আমি আছি।

আমাদের স্ব স্ব আত্মা আছে, ইহা নিশ্চিত অর্থাৎ সত্য। আমি আছি, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যদি কেহ বলেন আমি নাই, তিনি যদি বাস্তবিকই না থাকেন, তবে আমি নাই এ কথা বলিলেন কে ? আমি চিন্তা করি, আমি মনন করি, আমি কত মতলব করি, এই হেতু আমি আছি। চিন্তা আত্মার স্বকীয় গুণ, এই জন্য চিন্তা দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। অন্যের সহিত আলাপ করিতে হইলে, বাক্য ব্যবহার করিতে হয় ; কিন্তু আপনার সহিত আলাপ করিতে হইলে, বাক্যের অর্থস্বরূপ পদার্থ সকলের আন্তরিক চিন্তা করিতে হয়। এখানে বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন হয় না, এখানকার আমি

স্বয়ং তাহা জ্ঞান হয়। আমি আছি ইহা যেমন আত্মার একটী স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান, আমি হই ইহাও সেইরূপ আত্মার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান ; মনে কর, আমি একজন দরিদ্র আছি, আমার সর্ব্বদাই ইচ্ছা হয় যে বড় লোক হই ; সেইরূপ আমি আছি, সেও ইচ্ছা করে তৎ হই অর্থাৎ ব্রহ্ম হই।

চেতন ও অচেতনের গ্রন্থিস্থানই অহংকার। পুরুষ ও প্রকৃতির আসক্তিতে বা মিলনে অহংবুদ্ধি উৎপন্ন হয়, ঐ বুদ্ধিস্থ জ্ঞানাংশই আমি-পদবাচ্য জীবাত্মা। আমি ধ্যানদৃষ্টি দ্বারা বা চিন্তা দ্বারা অহংকারতত্ত্বকে বিদিত হইতে পারি। অতএব অহংকারতত্ত্ব জ্ঞেয় ও ভোগ্য। আমি যে বস্তুকে জানিতে সমর্থ হই, সে বস্তুটি আমি হইতে পারে না। আমার চক্ষু যে সকল বস্তু দর্শন করিতে সমর্থ হয়, সেই দৃষ্ট বস্তুর একটিও আমার চক্ষু নহে বা চক্ষু হইতে পারে না, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। সেইরূপ আমি যে সকল বিষয় জানিতে পারি, তাহার একটিও আমি নহি ; এই হেতু যখন আমি আমাকে জানিতে পারি, তখন আমি যে আমি নই, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। প্রকৃত আমি যে, সে আমি জ্ঞানের অবগাহনস্থান। এ আমি বদ্ধ, সে আমি মুক্ত ; এ আমি-বিকার, সে আমি নির্ব্বিকার ; এ আমি জড়, সে আমি অজড় ; এ আমি অধীন, সে আমি স্বাধীন।

জীবাত্মা যতদিন আত্মহারা হইয়া প্রকৃতিকে নিজ অভীষ্ট বলিয়া বরণ করিতে থাকিবে, প্রকৃতির শব্দ, স্পর্শ, গন্ধাদিতে মোহিত থাকিবে, ততদিন যাতায়াত ক্ষান্ত হইবে না। জীব

অহংতত্ত্ব

যত দিন ফল ফুলের দ্বারা শোভিত, দেহ মন বুদ্ধির দ্বারা পরম সুখের প্রস্রবণরূপে প্রকাশিত, প্রকৃতির আলিঙ্গনে মুগ্ধ থাকিবে, ততদিন জীবের নিরাশ ভাবে প্রবাসভ্রমণ ক্ষান্ত হইবে না। যতদিন আত্মনিবাসে দৃষ্টি না পড়িবে, ততদিন তাহার ভ্রমণ নিবৃত্ত হইবে না। জীব সংসারে নিত্যস্থায়ী বাসিন্দা নহে।

ক্ষণিক জ্ঞানের মধ্যে আত্মাকে নিত্য বলিয়া অনুভব করার নাম অহংকার। ক্ষণিক জ্ঞানের মধ্যে নিত্যত্বের অর্থ এই যে, এখন আমি সুখবোধ করিলাম, পরক্ষণেই দুঃখবোধ করিলাম; এই এতক্ষণ উষ্ণ বোধ হইতেছিল, পরক্ষণেই শীতল অনুভব হইল; ইহারই নাম ক্ষণিক জ্ঞান। এই ক্ষণিক জ্ঞানের মধ্যে যাহা নিত্য অর্থাৎ যখন সুখবোধ হইতেছিল, তখনও আমি ছিলাম; যখন দুঃখবোধ হইল, তখনও আমি আছি; যখন উষ্ণ বোধ হইল, তখনও আমি আছি; যখন শীতল বোধ হইল, তখনও আমি আছি। সুখ গেল দুঃখ আসিল, শীত গেল গ্রীষ্ম আসিল; আমি কিন্তু গেলামও না, আসিলামও না,—সকল-টাতেই সমান ভাবে রহিলাম; ইহারই নাম ক্ষণিকের মধ্যে নিত্যত্ব বা অহংকার। একদিকে আত্মজ্ঞানের যেমন পরিস্ফূর্তি সংসাধিত হইতে থাকে, তেমনি অপর দিকে অব্যক্তের অস্তিত্ব অনুভব বদ্ধমূল হইতে থাকে, ক্রমেই প্রকৃতির আলিঙ্গন গাঢ় হইতে থাকে, কি একটা যেন আমাকে অভিভূত করিতেছে এই-রূপ জ্ঞান জন্মে; তৎপরে আর একপদ অহংকার অগ্রসর হইলে

ইহা আমার রসজ্ঞান, ইহা আমার স্পর্শজ্ঞান প্রভৃতি আবি-
র্ভূত হয়; আমি ইচ্ছা করি বা না করি, তবু যেন আমার
ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইহা আমাকে অভিভূত করিতেছে; এটা কি
ওটা কি করিয়া কত ভাবনা ভাবি, তথাপি অব্যক্তের কোন
অন্তই পাই না; যেমন গোড়ায় অব্যক্ত, শেষেও তেমনি অব্যক্ত।
আমরা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার রঙ্গ দেখিতে থাকি।
তাহা আমাদিগকে হাসাইতেছে, কাঁদাইতেছে, তাহার আবেগে
আমরা চঞ্চল। হাসিয়া আবার কিরূপে সেইরূপ হাসিব তাহার
চেষ্টা, কাঁদিয়া আবার কিসে সেইরূপ কাঁদিতে না হয় তাহার
চেষ্টায় থাকি। এই অহঙ্কাররূপ পর্ব্বতে মনরূপ কেশরী অন-
বরত গর্জ্জন করিতেছে। এই দেহরূপ অরণ্যে অহঙ্কাররূপ
মত্তমাতঙ্গ সগর্ব্বে অনবরত বিচরণ করিতেছে। এইজন্য অহ-
ঙ্কারী ব্যক্তি মাত্রেই লোকের ঘৃণার বস্তু, ত্যাজ্য ও অশ্রদ্ধেয়
হইয়া থাকে। এই অহঙ্কারের উদয়ে শান্তি লুক্কায়িত হয়,
সুখ অন্তর্দ্ধান করে। আমি ভিন্ন এ সংসার আর কিছুই নহে।
আমি আছি বলিয়াই সমস্ত বস্তু রহিয়াছে। আমি না থাকিলে
কিছুই থাকে না। আমি জাত ও আমি অজাত উভয়স্বরূপ।
আমি স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, যুবা। আমি সর্ব্বপ্রাণীতে
ব্যাপ্ত, আমিত্বের অস্তিত্বে বন্ধন, আমিত্ব ছাড়িলেই মুক্তি।

তুমি আমি যেমন পৃথিবী হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া,
বাড়ী, ঘর, উদ্যান, ঘটী, বাটি প্রস্তুত করি, কিন্তু ঐ সকল
উপাদান আমাদের সৃষ্ট পদার্থ নহে; সেইরূপ ব্রহ্মা

জগৎ-লীন উপাদান সংগ্রহ করিয়া অর্থাৎ পঞ্চবিধ পরমাণু লইয়া, পৃথিবী, বন, পর্ব্বত, সমুদ্র, ভূলোক, দ্যুলোক, অন্তরীক্ষলোক যথাযোগ্য বিন্যাস করেন। ঐ পঞ্চবিধ পরমাণু, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এবং জীব শরীর, ইহারা ব্রহ্মার সৃষ্ট নহে, ঐ সকল প্রকৃতির সৃষ্টি; উহাদের যথাযথ বিন্যাস করাই ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব। ইহা তুমি আমি পারি না, তাঁহার তুল্য ক্ষমতাশালীরাই পারেন। তুমি আমি যে নিয়মে মানস সৃষ্টি করি, দেবগণও সেই নিয়মে মানস সৃষ্টি করেন। তুমি যেমন মানসিক চিন্তা দ্বারা নানাপ্রকার শিল্প উদ্ভাবন কর, ইহারাও সেইরূপ মানসিক চিন্তা দ্বারা নানাপ্রকার মানস সৃষ্টি উদ্ভাবন করেন। তুমি যদি উপাসনা দ্বারা, সাধনা দ্বারা বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিতে পার, বিশুদ্ধ করিতে পার, তাহা হইলে তোমারও সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে; বুদ্ধিকে যথেচ্ছ নিয়োগ করিতে পারিবে, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে সমর্থ হইবে, স্বয়ং ব্রহ্ম-ঐশ্বর্য্য ধারণ করিতে পারিবে।

জগতে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে জীব নাই; জগৎ জীব-পূর্ণ। মনে কর, একটি পুংপক্ষী ও একটি স্ত্রীপক্ষিণী-সংযোগে স্ত্রীপক্ষিণীর গর্ভে কতকগুলি ডিম্ব জন্মিয়াছে, সেইরূপ প্রকৃতি ও পুরুষসংযোগে, প্রকৃতির গর্ভে, সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্ব-প্রকাশক জ্যোতির্ম্ময় একটি অণ্ড জন্মিয়াছে; উহারই নাম বৃহৎ অণ্ড বা ব্রহ্মাণ্ড। আদ্যা শক্তি মূল প্রকৃতি দিগম্বরী কেন? আঁতুড়ঘরে প্রসূতির প্রসবের সময় কাপড় পরিবার

ইহা আমার রসজ্ঞান, ইহা আমার স্পর্শজ্ঞান প্রভৃতি আবি-র্ভূত হয়; আমি ইচ্ছা করি বা না করি, তবু যেন আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইহা আমাকে অভিভূত করিতেছে; এটা কি ওটা কি করিয়া কত ভাবনা ভাবি, তথাপি অব্যক্তের কোন অন্তই পাই না; যেমন গোড়ায় অব্যক্ত, শেষেও তেমনি অব্যক্ত। আমরা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার রঙ্গ দেখিতে থাকি। তাহা আমাদিগকে হাসাইতেছে, কাঁদাইতেছে, তাহার আবেগে আমরা চঞ্চল। হাসিয়া আবার কিরূপে সেইরূপ হাসিব তাহার চেষ্টা, কাঁদিয়া আবার কিসে সেইরূপ কাঁদিতে না হয় তাহার চেষ্টায় থাকি। এই অহঙ্কাররূপ পর্ব্বতে মনরূপ কেশরী অন-বরত গর্জ্জন করিতেছে। এই দেহরূপ অরণ্যে অহঙ্কাররূপ মত্তমাতঙ্গ সগর্ব্বে অনবরত বিচরণ করিতেছে। এইজন্য অহ-ঙ্কারী ব্যক্তি মাত্রেই লোকের ঘৃণার বস্তু, ত্যাজ্য ও অশ্রদ্ধেয় হইয়া থাকে। এই অহঙ্কারের উদয়ে শান্তি লুক্কায়িত হয়, সুখ অন্তর্দ্ধান করে। আমি ভিন্ন এ সংসার আর কিছুই নহে। আমি আছি বলিয়াই সমস্ত বস্তু রহিয়াছে। আমি না থাকিলে কিছুই থাকে না। আমি জাত ও আমি অজাত উভয়স্বরূপ। আমি স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, যুবা। আমি সর্ব্বপ্রাণীতে ব্যাপ্ত, আমিত্বের অস্তিত্বে বন্ধন, আমিত্ব ছাড়িলেই মুক্তি।

তুমি আমি যেমন পৃথিবী হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া, বাড়ী, ঘর, উদ্যান, ঘটী, বাটি প্রস্তুত করি, কিন্তু ঐ সকল উপাদান আমাদের সৃষ্ট পদার্থ নহে; সেইরূপ ব্রহ্মা

অহংতত্ত্ব

জগৎ-লীন উপাদান সংগ্রহ করিয়া অর্থাৎ পঞ্চবিধ পরমাণু লইয়া, পৃথিবী, বন, পর্বত, সমুদ্র, ভূলোক, দ্যুলোক, অন্তরীক্ষলোক যথাযোগ্য বিন্যাস করেন। ঐ পঞ্চবিধ পরমাণু, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এবং জীব শরীর, ইহারা ব্রহ্মার সৃষ্ট নহে, ঐ সকল প্রকৃতির সৃষ্টি: উহাদের যথাযথ বিন্যাস করাই ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব। ইহা তুমি আমি পারি না, তাঁহার তুল্য ক্ষমতাশালীরাই পারেন। তুমি আমি যে নিয়মে মানস সৃষ্টি করি, দেবগণও সেই নিয়মে মানস সৃষ্টি করেন। তুমি যেমন মানসিক চিন্তা দ্বারা নানাপ্রকার শিল্প উদ্ভাবন কর, ইহারাও সেইরূপ মানসিক চিন্তা দ্বারা নানাপ্রকার মানস সৃষ্টি উদ্ভাবন করেন। তুমি যদি উপাসনা দ্বারা, সাধনা দ্বারা বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিতে পার, বিশুদ্ধ করিতে পার, তাহা হইলে তোমারও সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে; বুদ্ধিকে যথেচ্ছ নিয়োগ করিতে পারিবে, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে সমর্থ হইবে, স্বয়ং ব্রহ্ম-ঐশ্বর্য্য ধারণ করিতে পারিবে।

জগতে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে জীব নাই; জগৎ জীব-পূর্ণ। মনে কর, একটি পুংপক্ষী ও একটি স্ত্রীপক্ষিণী-সংযোগে স্ত্রীপক্ষিণীর গর্ভে কতকগুলি ডিম্ব জন্মিয়াছে, সেইরূপ প্রকৃতি ও পুরুষসংযোগে, প্রকৃতির গর্ভে, সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্ব-প্রকাশক জ্যোতির্ম্ময় একটি অণ্ড জন্মিয়াছে; উহারই নাম বৃহৎ অণ্ড বা ব্রহ্মাণ্ড। আদ্যা শক্তি মূল প্রকৃতি দিগম্বরী কেন? আঁতুড়ঘরে প্রসূতির প্রসবের সময় কাপড় পরিবার

সময় থাকে না, প্রকৃতিদেবীও অনবরত অনন্ত বিশ্বের অনন্ত ডিম্ব প্রসব করিতেছেন, প্রসবের বিরাম নাই, সুতরাং বাস পরিধানের সময় নাই, সেইজন্য দিগম্বরী। প্রকৃতিগর্ভে সকল দিকে সকল পদার্থই অনন্ত ; বিশ্বও অনন্ত, দেশ বা গ্রাম, নগর বা সহরও অনন্ত ; ব্রহ্মাদি জীব এবং পশু পক্ষী কীটাদিও অনন্ত। পাখীর গর্ভে ডিম ছিল, সেই ডিমের গর্ভে অব্যক্ত অহংকারাত্মক জীব ছিল ; সেই ডিম ভাঙ্গিল, অমনি অব্যক্ত অহংকার ব্যক্ত হইল ; অহংকার যেমন ব্যক্ত হইল, অমনি ইচ্ছা জন্মিল, সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছানুযায়ী দ্রব্য অন্বেষণার্থ কর্ম্মক্ষেত্রে বহির্গত হইল। এখন মনে কর, মহান্ বিরাট্ অণ্ড ভাঙ্গিল; ব্রহ্মাদির বিকাশ হইল। সংসার কর্ম্মভূমি। ব্রহ্মলোক হইতে নরক পর্য্যন্ত সমস্তই সংসার। বিরাট্ হইতে বহির্গত হইয়া সংসারে আসিয়া ক্ষুদ্রতম কীট হইতে আদিশরীর হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাদি পর্য্যন্ত কেহই কর্ম্মশূন্য হইয়া থাকিতে পারিবেন না। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, স্ববশে হউক বা অবশে হউক, সজ্ঞানে হউক বা অজ্ঞানে হউক, স্বভাবে হউক বা অভাবে হউক, কর্ম্ম করিতেই হইবে এবং ভোগও করিতেই হইবে, প্রকৃতিদেবীর ইহাই আদেশ। কর্ম্ম করিলেই সুখ দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে। ভোগাদি বিষয়ে ব্রহ্মাদি দেবগণের যে দশা, পশু, পক্ষী, কীটাদিরও সেই দশা।

সর্ব্ব ভোগের আস্পদ, সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের আগার, সর্ব্ব শোভার আধার ত্রিলোক,—বিষ্ণুলোক, ব্রহ্মলোক ও শিবলোক;

অহংতত্ত্ব

-স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল, এই সমস্ত সৃষ্টি দৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মা সন্তোষ লাভ করিতে পারিলেন না। কেন পারিলেন না? দেখিলেন যতই ঐশ্বর্য্য থাক, যতই ভোগ থাক, যতই শোভা থাক, সমস্তই কিন্তু অপূর্ণ, সমস্তই সীমাবদ্ধ। ঐশ্বর্য্য ও ভোগাদি বাড়াইবার উপায় নাই, সীমা ছাড়াইবার সাধ্য নাই, সমস্তই বদ্ধ, বদ্ধ বলিয়া মুক্তধাম নয়। অসন্তোষ হইয়া বিষণ্ণ মনে ভাবিতেছেন—এই ভোগাস্পদ প্রাণী কোথা হইতে আসিল, ইহার কেন্দ্র কোথায়? এই যে ভোগ, ইহার মূল কারণ কি? যত কিছু ভোগ, সমস্তই কর্ম্মানুযায়ী, কর্ম্মই তাহার মূল; সুতরাং কর্ম্মস্থান- থাকার প্রয়োজন। ত্রিভুবন সমস্তই ভোগস্থান, তবে ইহাদের কর্ম্মভূমি কোথায়? ইহাদের ভোগের কর্ম্মকেন্দ্র কোথায়? ইহাদের মোক্ষকেন্দ্র কোথায়? ইহাদের শোভা ও মাধুর্য্যকেন্দ্র কোথায়? ঐশ্বর্য্য ও শৌর্য্যের কেন্দ্র কোথায়? ব্রহ্মাদি দেবগণের, কীটাদি পতঙ্গের কর্ম্মকেন্দ্র কোথায়? ভাবিতে ভাবিতে ব্রহ্মার বিশ্বকেন্দ্রে দৃষ্টি পড়িল; যাহা দেখিলেন তাহাতে স্তম্ভিত হইলেন। কেন স্তম্ভিত হইলেন? উল্লাসে। কেন উল্লাস? দেখিলেন বিশ্ব-কেন্দ্রে সমস্তেরই অসীমতা রহিয়াছে। ঐশ্বর্য্য বল, মাধুর্য্য বল, শৌর্য্য বল, বীর্য্য বল, শোভা বল, সৌষ্ঠব বল, সুখ বল, আমোদ বল, সমস্তই অপূর্ব্ব ও অসীম। আরও দেখি-লেন, কেন্দ্রে কোটী সূর্য্য প্রকাশিত, কোটী চন্দ্র সুশীতল, কি এক মহান্ মার্ত্তণ্ড ব্রহ্মলোকাতীত লোক স্নিগ্ধ উত্তাপে

আলোকিত করিতেছে; সুতরাং স্তম্ভিত হইয়াছেন। যে সূর্য্য-কিরণ ব্রহ্মলোকে ম্লান, সেই ব্রহ্মলোক ছাড়িয়া সে কিরণ ব্রহ্মাতিলোক আলোকিত করিতেছে, সুতরাং স্তম্ভিত হইয়াছেন। কেন্দ্র ছাড়িলে যাহা কিছু সমস্তই অপূর্ণ ও অসীম।

অহংএর প্রধান লক্ষণ আত্মার জীবভাব। লৌহ একীভূত অগ্নির ন্যায় প্রকাশ পাইলে তাহারই নাম অহংতত্ত্ব। আত্মার নাম দৃক্‌শক্তি, আর বুদ্ধির নাম দর্শনশক্তি। চিৎস্বরূপ আত্মা বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হন, বলিয়া সেই সেই বুদ্ধিবৃত্তি প্রকাশিত হয়; এস্থলে তিনি দৃক্‌শক্তি অর্থাৎ দ্রষ্টা, আর সেই সেই বুদ্ধিবৃত্তিগুলি তাঁহার প্রতিবিম্বপাতের আধার বলিয়া, সে সকলের নাম দর্শনশক্তি। একখণ্ড লৌহ অগ্নির সহিত গাঢ় সহবাস করিয়া অগ্নিতুল্য হয়, সেইরূপ হইয়া যাওয়ার নাম আমি। লৌহ ও অগ্নি পৃথক্ বস্তু, অথচ একের ন্যায় প্রতিভাত হয়; আত্মাও বুদ্ধির সহিত সেইরূপ প্রতিভাত হইয়া অহংতত্ত্বাত্মক জীব উপাধি ধারণ করিয়াছে। সেই জীব আপন বুদ্ধিকে চৈতন্য হইতে পৃথক্ বলিয়া জানে না, বুদ্ধি বা চিত্তের প্রতি যে অক্ষুণ্ণ "আমি জ্ঞান" পাতাইয়া রহিয়াছে, তাহার নাম অহংতত্ত্ব।

দর্শন

দৃশ্ ধাতুর উত্তর অনট্ প্রত্যয় করিয়া দর্শন নিষ্পন্ন হইয়াছে। দৃশ্ ধাতুর অর্থ দেখা। যাহা দ্বারা দেখা যায় অর্থাৎ যাহা দেখায় তাহাই দর্শন। দেখায় কি ? যাহা প্রয়োজন। জগতের সমস্ত প্রাণীই প্রয়োজনবিশিষ্ট,—কেহ অন্নের, কেহ বস্ত্রের, কেহ বিষয়ের, কেহ জুড়ি গাড়ির, কেহ দাস দাসীর ইত্যাদি। যে পদার্থকে অভিলাষ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহাই প্রয়োজন। কর্ম্মমাত্রই প্রয়োজন, বিনা প্রয়োজনে কেহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। চেতন, অচেতন সকল পদার্থই কর্ম্মশীল। প্রয়োজন কাহাকে বলে ? যাহার অভাব, যে কার্য্য করিয়া সিদ্ধ হইলে সুখ বোধ হয় এবং দুঃখ নিবারণ হয়, তাহারই নাম প্রয়োজন।

আব্রহ্ম কীট পর্য্যন্ত সকলেরই অন্তরের ভাব—কিসে দুঃখ নিবারণ হয়, কি করিলে নিরবচ্ছিন্ন সুখ লাভ হয় ; অবোধ শিশু-যাহার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, তাহারও অন্তরের ভাব—কিসে দুঃখ নিবারণ হয়, কি করিলে সুখলাভ হয়। এই প্রকারে জীব মাত্রেই সুখের জন্য ব্যস্ত, সুখের জন্যই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সুখ সুখ করিয়া সকলেই লালায়িত। দুঃখ সকলেরই ত্যাজ্য, সেইজন্য প্রাণী মাত্রেই সুখকে প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত

হয় ; কিন্তু প্রকৃত সুখ কি কেহ লাভ করিতে পারিয়াছে, কর্ম্ম হইতে কি কেহ বিরত হইতে পারিয়াছে ? যখন কর্ম্ম হইতে কেহ বিরত হয় নাই, তখন বুঝা যাইতেছে যে, সুখের সঙ্গে কাহারও সাক্ষাৎকার হয় নাই। জ্ঞানতঃ হউক বা অজ্ঞানতঃ হউক, সেই নিত্য সুখের অনুসন্ধানে ব্রহ্মা হইতে কীট পর্য্যন্ত সকলেই সদা অস্থির, নিয়ত গতিশীল, নিয়ত কর্ম্মে ব্যাপৃত রহিয়াছে।

সুকুমার শিশুর সুধামাখা সহাস্যবদন নিরীক্ষণ করিয়া জননী মর্ত্তে থাকিয়া ত্রিদিব-সুখ ভোগ করিতেছেন, তাহার সুধামাখা কথা শুনিয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইতেছেন ; এক দিন সেই শিশু, মার ক্রোড় ত্যাগ করিয়া শিক্ষা দিবে, বলিবে, "মাগো ! সংসারে কেহই কাহারও নহে, তুমিও আমার মা নহ, আমিও তোমার সন্তান নহি" এই শিক্ষা দিয়া চলিয়া যাইবে। আহা ! দুদিন পূর্ব্বে যে মাতা তাহার হৃদয়রত্নকে হৃদয়ে রাখিয়া মর্ত্ত্যধামে বাস করিয়াও স্বর্গের সুখ অনুভব করিতেন, যাহার মুখ দেখিয়া আপনাকে ভুলিয়া যাইতেন, জগৎ বিস্মৃত হইতেন, শোকতাপের আক্রমণ অনায়াসে সহ্য করিতেন, আজ তাঁহার কি অবস্থা ! পুত্র চলিয়া গেল, কেবল রাখিয়া গেল জননীর হৃদয়বিদারক স্মৃতি, আর দিয়া গেল জননীর জীবনব্যাপী দুঃখের উৎস। ইহাতে বেশ জানা গেল, সুখের সঙ্গে কিছুমাত্র পরিচয় হয় নাই। সুখের প্রকৃত পথ কোথায় বা কোন্ দিকে এবং কি প্রকারে যাইতে হয়, তাহার কিছুমাত্র জানিতে পারে নাই।

দর্শন

বাল্যকালে ধূলাখেলায় মনের জ্বালা জুড়াইল না। কৈশোর বয়সে আনন্দের আশায় প্রাণ ব্যাকুল হইল, তাহা পাইয়াও সুখবোধ হইল না। যৌবনের তরল প্রবাহ আবার নয়ন-পথের পথিক হইল—কত বিলাস, কত লালসা, কত আশা, কত সাহস, কত ভাবই আবির্ভাব হইল, কিছুতেই আনন্দ হইল না. প্রাণ তৃপ্ত হইল না, সাধ মিটিল না, সুরূপ কুসুমে নয়ন লাগিয়া রহিল, বোধ হইল যেন আর ছাড়িবে না, সংসার একেবারেই বিস্মৃত হইল। কিন্তু কি ভাবিয়া আবার পরিত্যাগ করিবে, ইহাতে কি সুখ হইল না ? শান্তির সহিত কি সাক্ষাৎ হইল না ? তৃষ্ণার অসাধারণ চতুরতাই ইহার একমাত্র কারণ। যে পরিচ্ছদে শান্তি নাই, তাহাকেই সুখ বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিছুতেই সুখের সহিত সাক্ষাৎ হইল না।

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি প্রাণী সকলকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। শারীরিক দুঃখ কমে ত মানসিক দুঃখ আরম্ভ হয়, মানসিক দুঃখ কমে ত শারীরিক দুঃখ আরম্ভ হয়। একমুহূর্ত্তও দুঃখের হাত হইতে অবসর পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিবার উপায় নাই। এখন বেশ বুঝা গেল, মুহূর্ত্ত-কালও কোন মানব সুখী নহে। যাহাকে আমরা সুখ বলিয়া মনে করি, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বেশ জানা যায়, তাহারও পরিণাম দুঃখ, বিষমিশ্রিত খাদ্যবিশেষ, বিবেকীর সমীপে তাহা দুঃখপদার্থরূপে পরিগণিত। বিষয়-ইন্দ্রিয়-সংযোগ-জনিত একপ্রকার মনোবিকারই আমাদের নিকটে

সুখনামে পরিচিত পদার্থ। সংসারে সকল বস্তুই ক্ষণভঙ্গুর, কোন পদার্থই চিরস্থায়ী নহে, সুতরাং যাহাকে সুখজনক পদার্থ বলিয়া মনে করা যায়, তাহা যে চিরস্থায়ী নহে, তাহা যে শীঘ্র লয় প্রাপ্ত হইবে, তাহা নিশ্চিত।

সুখজনক পদার্থের নাশে যে নিদারুণ দুঃখভোগ করিতে হয়, তাহা জীব মাত্রেই সহ্য করিতেছে। ব্রহ্মলোকের সুখ ঐশ্বর্য্য পর্য্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, তাহারও নাশ আছে, সেইজন্য দুঃখও আছে। বৈষয়িক সুখ স্থায়ী হয় না, যাহাকে পাইয়া সুখী হওয়া যায়, তাহা অনতিবিলম্বে বিলীন বা দুষ্প্রাপ্য হয়, সুখের পিপাসা উপশমিত হয় না, কিন্তু ক্ষণিক সুখ ভোগের পরিণাম দুঃখানলে দগ্ধ হইতে হয়। অজ্ঞ ব্যক্তিরা বনিতা-ভোগাদিকে দুঃখ বলিয়া স্বীকার করে না, কেননা যদি ইহাকে দুঃখ বলিয়া স্বীকার করে, তবে মানব কোন্ সুখ লইয়া জগতে থাকিবে? মায়াবশে যাহা মধুর বলিয়া মনে হয়, তাহার স্থায়িত্ব কতক্ষণ? ভবসাগরে ভাসিতে ভাসিতে কত লোকের সহিত মিলিত হইয়াছি, কত লোকের সঙ্গ ভাল লাগিয়াছে, কত দ্রব্য মনোরম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, আত্মহারা হইয়া আমি কত লোককে আত্মীয় বোধ করিয়াছি, কিন্তু কেহই স্থির হয় নাই; নদীতে ভাসমান তরঙ্গ-বায়ু-চালিত তৃণসমূহের পরস্পর মিলনের ন্যায়, সংসারের সকল মিলনই ক্ষণস্থায়ী; এ বিয়োগ-সাগরে চির-সংযোগের আশা-দুরাশা। যে রাজ্যে নিবৃত্তিকে পশ্চাৎ রাখিয়া উৎপত্তি দর্শন দেয়, যে দেশে মৃত্যুকে সঙ্গে

করিয়া জন্ম আগমন করে, যেখানে সংযোগ ক্ষণকালও বিয়োগ-বিরহিত হইয়া অবস্থান করে না, যে রাজ্যে স্থায়ী ভাবের নিত্য অভাব, সে রাজ্যে সুখ কোথায়? মরুভূমিতে কি কখনও পিপাসা শান্তি হইতে পারে? পরিবর্ত্তনশীল সংসারে মরিবার জন্য জন্ম হইয়া থাকে, বিয়োগযাতনা ভোগ করিবার জন্য সংযোগ হইয়া থাকে, সুতরাং প্রকৃত সুখের সঙ্গে কাহারও পরিচয় হয় নাই, হইবেও না।

এখন দেখিতে হইবে সুখ কোন্ পদার্থ এবং প্রকৃত সুখ কিসে? দেখিতে পাওয়া যায় পান্থশালায় পথিকে পথিকে আলাপ পরিচয় হয়, আবার পরস্পর নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে চলিয়া যায়; পুনরায় যদি কোন স্থানে দেখা হয়, তাহা হইলে বলিতে পারে, এই পথিকের সহিত পূর্ব্বে দেখা হইয়াছিল, কিন্তু নাম ধাম কি তাহা বলিতে পারে না। বৈষয়িক সুখও বিষয়াসক্তের মধ্যে তাদৃশ পরিচিত, বিষয়াসক্তের সুখভোগও সেই-প্রকার। পূর্ব্বে অনুভব করিয়াছিলাম, বৈষয়িক সুখের পরিচয় দিতে পারে; কিন্তু ইহার স্বরূপ, ইহার উৎপত্তি, স্থিতি প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় সকল বৈষয়িকই অনভিজ্ঞ।

সুখ দুই প্রকার—পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন। পরিচ্ছিন্ন সুখ বিষয়েন্দ্রিয়-জনিত মানস-বিকার, আর অপরিচ্ছিন্ন সুখ অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্ম বা আত্মার স্বরূপে অবস্থিতি! সকলেই জানে অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্তিতে সুখ হয়; কিন্তু অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্তিতে কেন সুখ হয়, তাহা তাহারা জানে না। বিশেষ চিন্তা

করিলে প্রতীতি হইবে যে, সুখ অন্বেষণকারীর চিত্ত সুখের অন্বেষণ করিতে করিতে যাহাকে সুখ বলিয়া নিশ্চয় করে, যে বিষয়কে আত্মার অনুকূল বা আত্মীয় বলিয়া অবধারণ করে, তাহাকে লইয়া নিজ গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়, সুখান্বেষণার্থ বহির্মুখ চিত্ত অন্তর্মুখ হয়, নির্জ্জনে নিরুপদ্রবে তাহা ভোগ করিবে বলিয়া স্বস্থানে প্রবেশ করে। চিত্তবৃত্তি অন্তর্ম্মুখীণ হইলেই স্বাভিমুখ, দর্পণে মুখপ্রতিবিম্বপাতের ন্যায় সুখময় আত্মার প্রতিবিম্ব তাহাতে পতিত হয়, তাহাতেই বিষয়প্রাপ্তির জন্য সুখানুভব হইয়া থাকে। অল্পবুদ্ধি মানব মনে করে, বিষয়ে সুখ ছিল, বিষয় ভোগ করিয়া সুখ প্রাপ্ত হইলাম ; কিন্তু বস্তুতঃ সুখ দিলেন সুখময় আত্মা। সুখ উপলব্ধি হইল চিত্তবৃত্তি অন্তর্ম্মুখীণ হইয়াছিল বলিয়া, সুখ বোধ হইল চিত্তবৃত্তি ক্ষণকালের জন্য নিরুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া, সুখবোধ হইল কিয়ংক্ষণের জন্য পরিবর্ত্তন্ ভোগ করিতে হয় নাই বলিয়া। আত্মার স্বরূপ, অবস্থাই সুখ। বৈষয়িক সুখ প্রকৃত সুখের পরিচ্ছিন্ন অবস্থা, বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধ-জনিত আনন্দের পরমাবস্থাই পরমানন্দ, ইহা পরমানন্দেরই মাত্রা. তাহারই কণাবিশেষ। বৈষয়িক সুখ ব্রহ্মানন্দের কণিকা মাত্র। ব্রহ্মানন্দের কণিকা মাত্র অবলম্বন করিয়া জীব-জগৎ অবস্থান করে। মনুষ্যলোক হইতে ব্রহ্ম-লোক পর্য্যন্ত যে আনন্দ উপভোগ করে, তাহা পরিচ্ছিন্ন সুখ। এই নিরতিশয় সুখই মুখ্য প্রয়োজন, ইহাকে পাইবার জন্য জীবজগৎ নিয়ত কর্ম্মশীল এবং সতত চঞ্চল।

দর্শন

যাহা অখণ্ডিত, যাহা অপরিচ্ছিন্ন, তাহা পূর্ণ; আর যাহা তদ্বিপরীত, তাহা অপূর্ণ। অপূর্ণই পূর্ণ হইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। যতদিন জীব পূর্ণ না হইবে, ততদিন অবশ ভাবে, অবিরাম গতিতে, জন্মাদিভাব-বিকারে বিকৃত হইতে হইবে, নিয়ত গতিতে কর্ম্মস্রোতে ভাসিতে হইবে। পূর্ণ হইবার জন্যই জীবের চেষ্টা। ত্রিতাপজ্বালা নির্ব্বাপিত করিবার জন্যই ব্যস্ত; সংসার-বিদেশ হইতে নিত্য-স্বদেশে যাইবার জন্যই জীবের গতি। উদ্দেশ্য যে দিন সিদ্ধ হইবে, অভাব যে দিন পূর্ণ হইবে, গন্তব্য স্থান অবধারিত হইবে, গতি স্থগিত হইবে, চঞ্চলতা দূর হইবে, স্রোত রুদ্ধ হইবে, কর্ম্মে বিরতি হইবে। কি প্রকারে তাহা হইবে? ত্রিতাপজ্বালা কিসে নিবারণ হইবে? কিসে অনাপ্ত আপ্ত হইবে, অপূর্ণ পূর্ণ হইবে? অপূর্ণ পূর্ণ হইবার, অনাপ্ত আপ্ত হইবার, ত্রিতাপজ্বালা নিভিবার উপায় দর্শনই এই দর্শনের উদ্দেশ্য।

প্রকৃতি এক মুহূর্ত্তও বিকৃতা না হইয়া থাকিতে পারে না। যে বস্তু সদা পরিবর্ত্তনশীল, তাহাতে সুখ কোথায়? যাহা সুখ তাহাও পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং নিত্য স্থায়ী সুখ কোথায়? নিত্য সুখ প্রকৃতিতে নাই। তবে কি ইহার কোনও উপায় নাই যে, প্রকৃতি বিকৃতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া, অবিকৃত নিত্য সুখ আনন্দ লাভ হইতে পারে? আর্য্যমাতা শ্রুতি তাঁহার সন্তানের জন্য না রাখিয়াছেন এমন উপায় নাই; আমরা উপায় প্রয়োগ করি না বলিয়া দুঃখ, তাপ, রোগ, শোক, জ্বালা, যন্ত্রণা

ভোগ করিতে হয়। সংসারক্ষেত্রে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া জীব-মাত্রেরই এরূপ বলবতী বাসনা সমুপস্থিত হয় যে, কিসে আমি সম্যক্ সুখে সুখী হইব এবং দুঃখের পথ কিসে কখনও স্বপ্নেও অনুভূত না হয়, স্বজনসমাজে দীর্ঘায়ু, বলবান্, রূপবান্, বিদ্বান্, যশস্বী হইয়া জীবন কাটাইতে পারি।

যে আর্য্যজাতির বিজ্ঞান বুদ্ধিতে জগৎ আলোকিত, যে আর্য্যজাতির ধর্ম্মচিন্তায় জগৎ ধর্ম্মপথে ধাবিত, সেই আর্য্য-জাতির অধিকাংশ কালবশে দৈবদুর্ব্বিপাকে এতদূর অজ্ঞান-আবরণে আচ্ছাদিত হইয়াছেন যে, তাঁহারা আর আপনাদের পিতৃপিতামহাদির ধনের উত্তরাধিকারী হইতে পারেন না। এমন কি, পিতৃপিতামহাদির ভাষা বুঝিতেও অক্ষম হইয়াছেন। পিতৃ-পিতামহেরা তাঁহাদের সন্ততির জন্য আর্য্যভূমির প্রত্যেক স্তরে আপনাদের বৈজ্ঞানিক উন্নতির কৌশলরূপ কত শত কর্ম্ম ও উপাসনাদি রাখিয়া গিয়াছেন; বলবীর্য্য, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, শক্তি ও তেজ আদি রাখিয়া গিয়াছেন। কুসন্তান পথ হারাইয়াছে, কুপথের ধূলায় চক্ষু অন্ধ করিয়াছে, কামাদি-কণ্টকে চরণ ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে, আর অগ্রসর হইতে পারে না, পৈতৃক সম্পত্তি গ্রহণ করিতে পারে না। সন্তান হইয়া পিতা মাতার কথা বুঝিতে পারে না; বেদ কি, পুরাণ কি, দর্শন কি, কিছুই বুঝিতে পারে না। পিতৃপিতামহের সঞ্চিত রত্নে আমরা ভূষিত হইতে পারিলাম না; আমরা যে স্থানে শাস্ত্রবৃক্ষস্থিত কর্ম্ম-ফলের মূর্ত্তি দেখি, সেই স্থানে সহজে আমরা বামন হইয়া পড়ি

হইলাম আমরা বামন, দোষ দিলাম পিতামহের; সকল ভ্রাতায় মিলিয়া বলাবলি করিলাম, ঐ ফলটা মিথ্যা সাজান। ইহা অপেক্ষা দুর্দ্দৈব আর কি হইতে পারে!

আর্য্যজাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া অনেক সময়ে নৈরাশ্য-তিমিরে হৃদয় আচ্ছন্ন হয়; কিন্তু আশা-মরীচি ক্ষণকাল মধ্যে উহা ধ্বংস করিয়া দিয়া হৃদয় আনন্দে উদ্ভাসিত করে। যখনই দিশা হারা হইয়া "কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হই," যখনই সহস্র সহস্র বিপদ্ আসিয়া চিত্তকে ব্যাকুলিত করে, তখনই যেন হৃদয়াকাশে "দৈব-বাণী" নির্ঘোষিত হয়—"ভয় নাই, এই প্রাচীন জাতি বিলুপ্ত হইবে না।" কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে এই প্রাচীন জাতি বিলুপ্ত না হয়, কি উপায়ে পিতৃপিতামহের সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে, কি কৌশলে সেই আর্য্যবীর্য্য, বল, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, শক্তি, ও তেজ আদি লাভ করিতে পারে, তাহা দেখানই এই দর্শনের উদ্দেশ্য।

আর্য্যশক্তির অন্তরালে পিতামহের কি এক অপূর্ব্ব শক্তি, যাহা—মাতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করে—সেইরূপ আর্য্যকে রক্ষা করিতেছে! আদ্যা শক্তির পুত্র শক্তিহীন কেন, আর্য্য কি ছিল কি হইয়াছে, কি হইতে পারে? আর্য্য কি এক রত্ন হারাইয়া, দিন দিন কাঙ্গালের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, সেই হারানিধি পাইবার উপায়,—আর্য্য যে ফণিমণি হারাইয়া জগৎ আঁধার দেখিতেছে, সেই মণি লাভের উপায়, যে উপায়ে নিশ্চিতরূপে অনন্ত শক্তির অনন্ত বিভূতি লাভ হয়,—যাহাতে সকল

কার্য্য সিদ্ধ হয়,—সেই সকল বিষয় ইহাতে বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। আর্য্যগর্ব্ব শ্লাঘ্য, অতএব কেন গর্ব্ব করিব না? আর্য্য যেন জন্মে জন্মে এই মহাধনে ধনী হইয়া গর্ব্ব করে। এ জীবন আর্য্যজীবন, সুতরাং মহাগর্ব্বের জীবন। আর্য্য এ মহাজীবন ভুলিয়াছে, সেই হেতু পূর্ব্ব গর্ব্বও খর্ব্ব হইয়াছে।

ত্রিবেণী

বেণী শব্দে বন্ধন। ত্রিগুণের বন্ধনের নাম ত্রিবেণী। বেণী দুইপ্রকার—যুক্ত বেণী ও মুক্ত বেণী। যোগস্থানের নাম যুক্ত বেণী, মুক্ত স্থানের নাম মুক্তবেণী। সত্ত্ব, রজঃ, ও তমোগুণের সঙ্গমস্থান বা গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর সঙ্গমস্থানের নাম ত্রিবেণী। সংসারপক্ষে যুক্ত ত্রিবেণী—যে স্থানে সত্ত্বগুণী গঙ্গা,—রজোগুণী সরস্বতী ও তমোগুণী যমুনার সহিত যুক্ত হইয়াছে ; আর মুক্ত বেণী—যে জায়গায় সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমোগুণকে ত্যাগ করিয়া গুণাতীতে মিলিবার চেষ্টা করিয়াছে অর্থাৎ সত্ত্বগুণী গঙ্গা রজঃ ও তমোগুণী সরস্বতী ও যমুনাকে ছাড়িয়া দিয়া সাগরাভিমুখে ছুটিয়াছে। জীবপক্ষে—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ জীবকে যে জায়গায় বন্ধন করিয়াছে, তাহাই যুক্ত ত্রিবেণী অর্থাৎ সংসার ; আর জীবকে যে স্থানে ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহাই মুক্ত ত্রিবেণী অর্থাৎ ক্রম-মুক্তস্থান। ইহাই রূপকে বর্ণিত আছে—আকাশ হইতে গঙ্গা পতিতা হইয়া, হরিদ্বার প্রভৃতি স্থান ভেদ করিয়া যুক্ত-ত্রিবেণী-সঙ্গমে আসিয়া যোগ হইয়াছে, ইহাই যুক্ত ত্রিবেণী। জীবপক্ষে—জীব ব্রহ্মাকাশ হইতে পতিত হইয়া মহত্তত্ত্বাদি ভেদ করিয়া সংসারে আসিয়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সহিত যোগ হইয়াছে ; সংসারই জীবের যুক্ত ত্রিবেণী।

যে স্থানে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীকে ছাড়িয়া দিয়াছেন,

তাহাই মুক্ত ত্রিবেণী। এই মুক্ত ত্রিবেণীতে, সরস্বতী ও যমুনাকে ছাড়িয়া গঙ্গা উন্মুক্ত গতিতে, নিজ প্রিয় সখা সহ আলিঙ্গন করিতে, চির-পিপাসা চির-জ্বালা জুড়াইতে, চির-দুঃখের কথা কহিতে সাগরাভিমুখে ছুটিয়াছে। যতই নিকটে যাইতেছে, ততই আনন্দবেগ উথলিয়া উঠিতেছে, আনন্দ ক্রমে বর্দ্ধিত হইতেছে, শেষে আনন্দে আটখানা হইয়া, শত মুখে সহস্র মুখে প্রিয় সখাকে আলিঙ্গন করিল, সহস্র মুখে সহস্রপ্রকার রস পান করিয়া জীবন জুড়াইল, চির পিপাসিত প্রাণ শীতল করিল, সুখের অনন্ত সাগরে মিলিল।

গঙ্গা আকাশ হইতে পতিতা হইয়া কিছুকাল গতির পর ত্রিবেণীতে যোগ হইয়াছে। জীবপক্ষে—জীব ব্রহ্মাকাশ হইতে পতিত হইয়া মহত্তত্ত্ব-ভেদরূপ গতির পর সংসারে আসিয়া যোগ হইয়াছে। গঙ্গাপক্ষে—ত্রিবেণীতে যোগ হইয়া কিছুকাল ভোগানন্তর মুক্ত ত্রিবেণীতে আসিয়া মুক্ত হইয়া সাগরাভিমুখে ছুটিয়াছে; যতদিন সাগরে পতিত না হইবে, ততদিন তাহার গতির বিরাম নাই। জীবপক্ষে—জীব ব্রহ্মাকাশ হইতে পতিত হইয়া, সংসারে আসিয়া কিছুদিন ভোগানন্তর সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মার্ণব-অভিমুখে ছুটিবে, যতদিন চিন্মহার্ণবে পতিত না হইবে, ততদিন তাহার ছুটাছুটির বিরাম নাই, গতিরও বিশ্রাম নাই। গঙ্গাপক্ষে যুক্ত ত্রিবেণী প্রয়াগ, জীবপক্ষে সংসার। গঙ্গাপক্ষে মুক্ত ত্রিবেণী বাঁশ-বেড়িয়া, জীবপক্ষে মুক্ত ত্রিবেণী ক্রমমুক্ত স্থান—মহর্লোক বা

ব্রহ্মলোক। এই মুক্ত ত্রিবেণী ক্রমমুক্ত স্থানে জীবন্মুক্তেরা দাঁড়াইয়া আছেন; এখন পর্য্যন্ত চিন্মহার্ণবে পতিত হন নাই, পতিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। গঙ্গা যেমন মুক্ত ত্রিবেণী ছাড়িয়া যতই সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী হইতেছে, ততই তাহার বেগ বর্দ্ধিত হইতেছে, শেষে অতি বর্দ্ধিত হইয়া সহস্র মুখ ধারণ করিয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে; জীবন্মুক্তেরাও মহর্ল্লোক নামক মুক্ত ত্রিবেণী ছাড়িয়া যতই চিন্মহার্ণবের নিকটবর্ত্তী হইতেছেন, ততই আনন্দবেগ বাড়িতেছে। জীবন্মুক্তেরা মহর্ল্লোক ছাড়িয়া জনলোক, জনলোক ছাড়িয়া তপোলোক, তপোলোক ছাড়িয়া ব্রহ্মার্ণবের অতি নিকটে ব্রহ্মলোকে আসিয়া সহস্রানন্দ-মুখী হইয়া শীঘ্রই অনন্ত নিত্যানন্দ চিৎসমুদ্রে পতিত হইবেন।

যে ধর্ম্মের দ্বারা উর্দ্ধগতি হয়, সে ধর্ম্ম লঘু নামে পরি-ভাষিত। অগ্নির উর্দ্ধজ্বলন, বাষ্পের উদ্গতি, বায়ুর তির্য্যক্ গতি, ইন্দ্রিয়ের প্রকাশগতি, সমস্তই সত্ত্বগুণের কার্য্য। যাহা দ্বারা জ্ঞানের আবরণ অর্থাৎ অজ্ঞান-ঢাকা নষ্ট হয়, ইন্দ্রিয়ের ও চিত্তে বস্তুর প্রতিবিম্ব গৃহীত হয়, তাহা প্রকাশ নামে অভিহিত হয়। বুদ্ধির প্রকাশ সত্ত্ব, তেজের প্রকাশ আলোক, দিনের প্রকাশ সূর্য্য, সমস্তই সত্ত্বগুণের মহিমা। সত্ত্বগুণাবলম্বী মহাত্মারা ইচ্ছানুসারে ঐশ্বর্য্যশালী, স্বাধীন ও ক্ষুদ্রকায় হইতে সমর্থ হন। এই সত্ত্বগুণ শান্তবৃত্তিতে ব্রহ্মের সৎ, চিৎ ও আনন্দ, তিন গুণেরই প্রকাশ আছে।

একজন মনুষ্যকে কখন সৎ, কখন অসৎ কার্য্য করিতে

দেখা যায় ; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের বিষমতাই ইহার কারণ। সত্ত্বগুণের প্রাবল্যকালে যাহাকে সৎ কার্য্য করিতে দেখা যায়, রজোগুণের প্রাবল্যকালে তাহাকেই লৌকিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে দেখা যাইবে, আবার তমোগুণের প্রাবল্য-কালে সেই ব্যক্তিই অসৎ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে দেখিতে পাইবে। মনে কর, তোমার অত্যন্ত রাগ হইয়াছে, কাহাকে মার, কাহাকে কাট, তাহার স্থিরতা নাই ; কিন্তু হঠাৎ তোমার রাগটা থামিয়া গেল। রাগ থামিবার কারণ এই যে, তখন সত্ত্ব-গুণ, তোমার অলক্ষিতে আসিয়া রজোগুণকে দমন করিল ; এখানে সত্ত্বগুণ আসিয়া যদি তোমার রজোগুণ ক্রোধকে দমন না করিত, তবে যে কি অনর্থ ঘটিত তাহার ঠিক নাই। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিবে, ইহাই নিয়ম। সত্ত্বাদি তিন গুণ সকলেরই আছে ; সত্ত্ব আছে, রজঃ নাই ; রজঃ আছে, তমঃ নাই ; বা তমঃ আছে, রজঃ নাই ; তাহা হইতে পারে না—তিনই তিনের সহচর। কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিবার নিয়ম নহে।

কাল

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের দুঃখজনক অর্থাৎ যাহা দ্বারা অব্যক্ত প্রকৃতির সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হইয়া মহদাদি পরিণাম আরম্ভ হয়, তাহারই নাম কাল। যাহা নিখিল পরিবর্ত্তনের আশ্রয় ও হননকারক, তাহাই কাল। পরিদৃশ্যমান সংসার নিয়ত পরিণতিশীল, কালই সর্ব্ববিধ পরিণামের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ যাহা সর্ব্বভূতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, তাহাই কাল। সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তনের মূল কাল। যাহা সৃষ্ট বস্তুর জনক এবং জগতের আশ্রয়, তাহাই কাল। অল্পাধিক্য জ্ঞান হেতু কাল ক্ষণ, দণ্ড ও প্রহরাদি নামে অভিহিত হয়। যাহা জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ব্যবহারের অদ্বিতীয় কারণ, তাহাই কাল। যাহা শরদাদিরূপে আম্রাদি বৃক্ষের ফল-পুষ্প-প্রসব শক্তিকে প্রতিবদ্ধ করে, এবং বসন্তাদিরূপে তাহাদের সেই শক্তিকে পুনঃ অনুগৃহীত করে, তাহাই কাল। একখানি বস্ত্র অতি যত্নের সহিত কাপড়ে মুড়িয়া সিন্দুকে তুলিয়া রাখ, দশ বৎসর পরে সিন্দুকটি খুলিয়া দেখ, কাপড়খানি জীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সিন্দুকের ভিতর অতি যত্নে রক্ষিত কাপড় জীর্ণ করিল কে? যিনি জীর্ণ করিয়াছেন, তিনিই কাল।

স্ত্রীযোনিতে পুংবীজ আহিত হইল, দশমাস পরে সন্তান

ভূমিষ্ঠ হইল ; তুমি বলিতে পার, দশমাস পরে না হইয়া অদ্যই কেন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় না ? তাহা হইবে না, কারণ কাল সেই বীজকে ক্রমে চক্ষু, কর্ণ, ত্বক্, মাংস, মজ্জা ইত্যাদিতে পরিণত করিয়া দশ মাসে পূর্ণাবয়ব গঠনানন্তর ভূমিষ্ঠ করিবে। এই যে বিন্দুপরিমাণ বীজ-পদার্থকে অপূর্ব্ব মনুষ্যাকারে গঠিত করিল, তাহা কাল। 'যাহা কর্ত্তব্য অবধারণের নিয়ন্তা, তাহা কাল। এই কালে ইহা আমার কর্ত্তব্য, এই কালে ইহা আমার অকর্ত্তব্য, যাহা দ্বারা এইপ্রকার অবধারণ হয়, তাহা কাল। ত্রৈগুণ্যশূন্য জড় দ্রব্যবিশেষ কাল অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়-শূন্য যে জড় দ্রব্যবিশেষ, তাহা কাল। প্রলয়নিশা-অবসানে যিনি প্রকৃতি পুরুষকে জাগ্রৎ করেন ও সংযোগ করেন, তিনি কাল। কাল ইন্দ্রিয়গম্য নহে। কালের সহিত ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎসম্বন্ধ ঘটে না ; কাল অনুভবগম্য। বাহ্য জ্ঞানের মূলে আধার এবং মানস জ্ঞানের মূলে কালের অবস্থান। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ আধারের উপাধি ; ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কালের উপাধি। বাহ্য বস্তুর আকারপরিবর্ত্তন দেশকে আশ্রয় করিয়া ঘটিয়া থাকে, যেমন বৃক্ষ কতক স্থানকে ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে ; মানস অবস্থার পরিবর্ত্তন কালকে আশ্রয় করিয়া ঘটিয়া থাকে, যেমন তোমার ক্রোধ হইয়াছে, ক্রোধ কতক সময়কে ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছে। আধার ও কাল ব্যতিরেকে কোন জ্ঞানই সম্ভব হয় না, বিষয় সকল আধার ও কালের সহিত দৃঢ় সম্বদ্ধ। আধার-গুণে বিষয়ের বাহ্য প্রকাশ এবং কাল-গুণে তাহাদের

অন্তরে আবির্ভাব হয়। বেশ বুঝিতে পারা যায়, মানস জ্ঞানের মূলে কালের অবস্থান। কল্পনা, স্মৃতি ও আশা ইহা মানস বৃত্তি : এই তিনটি বৃত্তি একই পদার্থ এবং একই শক্তির পরিণাম, কেবল কালিক বৈলক্ষণ্য মাত্র প্রভেদ। কল্পনা বর্ত্তমান কাল, স্মৃতি ভূত কাল, আশা ভবিষ্যৎ কাল।

বর্ত্তমান কাল বা কল্পনা—বিদ্যমান বস্তুর বা অনুপস্থিত পরিচিত ব্যক্তির বর্ত্তমান কালে মনে উপস্থিত হওয়ার জ্ঞানই কল্পনা। কল্পনা বর্ত্তমান-কালিক, কল্পনা দ্বারা বর্ত্তমান কালের অনুভব সিদ্ধ হয়। ভূত কাল বা স্মৃতি পূর্ব্বানুভূত—অর্থাৎ অতীত কালে যে বিষয় আমাদিগের ইন্দ্রিয়গোচর হইয়াছিল, তাহা পুনর্ব্বার মনে উপস্থিত হওয়ার জ্ঞানই স্মৃতি ; সুতরাং স্মৃতিবিষয় ভূত-কালিক। স্মরণের দ্বারা অতীত কালের জ্ঞান সিদ্ধ হয়। ভবিষ্যৎ কাল বা আশা—বর্ত্তমান কল্পিত বিষয় বা বর্ত্তমান দৃষ্টিবিষয় ভবিষ্যৎ কালে সেইরূপ উপস্থিত হইবে ইত্যাকার সম্ভাবনাসূচক জ্ঞানই আশা নামে অভিহিত হইয়া থাকে ; সুতরাং আশা দ্বারা ভবিষ্যৎ কালের অনুমান সিদ্ধ হয়।

এক্ষণে ইহা দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালের অস্তিত্ব পাওয়া গেল। যদি বিচার করিয়া দেখা যায়, তবে বলিতে হইবে বর্ত্তমান কাল নাই। কেন নাই ? তাহার কারণ এই যে, কাল সদাই চঞ্চল, চলনশীল, এক মুহূর্ত্তও স্থির নাই, কাল-চক্র অনবরত চলিতেছে, ক্রমাগত যাইতেছে। ইহাতে এইপ্রকার সংশয় হয়, যে পদার্থ আবর্ত্তিত হইতেছে, এক মুহূর্ত্তও যাহার

গতির বিরাম নাই, যাহা গতির উপর রহিয়াছে, তাহার বর্ত্তমান হয় কি প্রকারে ? যাহাকে আমরা বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত বলিয়া অবধারণ করি, তাহা বর্ত্তমান বলিতে বলিতে অতীতের কুক্ষিতে লীন হইতেছে। যে মুহূর্ত্তে দাঁড়াইয়া যে মুহূর্ত্তকে ভবিষ্যৎ বলিতেছি, তাহাও চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে, বর্ত্তমানে আসিয়া অতীতে লীন হইতেছে ; কাল এত দ্রুত আবর্ত্তিত হইতেছে যে, তাহা অনুভব করা যায় না, সুতরাং বর্ত্তমান কাল অবধারণ করা যায় না। এক অখণ্ড নিত্য দণ্ডায়মান কাল সদাই ভূত, সদাই বর্ত্তমান, ও সদাই ভবিষ্যৎ। কালের দুই পক্ষ, কাল বিনা অঙ্গে অবয়ব ধারণ করে, কাল প্রতি পদেই জন্মলাভ করে, কাল প্রতি পদেই পদ পায়। লোকে বলে তাহার পদ নাই, কিন্তু সর্ব্বক্ষণ এই এল, এই গেল. এই সেই, সেই এই, এই নেই—প্রতিক্ষণেই নানারূপ বদল।

কাল বিন্দুরূপী। কাল দুই ভাগে বিভক্ত—এক খণ্ডিত. আর এক অখণ্ডিত। খণ্ডিত কাল বিন্দু, মুহূর্ত্ত ইত্যাদি, তাহা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, যাহা নির্দ্দেশ্য তাহা খণ্ড কাল। যে কাল স্থাবর জঙ্গম আদির উৎপত্তি স্থিতি ও নাশের কারণ, তাহা অখণ্ড দণ্ডায়মান কাল। আমরা দেখি, নর্ত্তকী প্রহর ব্যাপিয়া নৃত্য করিতেছে, কিন্তু তাহা প্রহরব্যাপী নহে, প্রত্যুত ক্ষণব্যাপী ; ক্ষণ পরম্পরায় এক বুদ্ধিগম্য হইয়া প্রহর ভ্রান্তি জন্মায়। কালের খণ্ডিত অবস্থা প্রকৃতির জড়ভাব বিকার। কালই প্রকৃতিকে জড়ভাবে বিকারিত করিতেছে, প্রকৃতি কালশক্তি-

নিমিত্ততা প্রযুক্ত জড়াদিভাব-বিকারে বিকৃতবৎ উপলব্ধ হইয়া থাকে। এক অপরিচ্ছিন্ন কালশক্তি খণ্ডিত হইলেই জড়ভাব-বিকাররূপে উপলব্ধ ও অভিহিত হইয়া থাকে। প্রকৃতির জড়-ভাববিকার কাল খণ্ডিত বিশেষ বিশেষ সত্তা ভিন্ন আর কিছু নহে। কাল ভোক্তা ও ভোগ্য উভয়ই। কাল যখন প্রকৃতিকে পরমাণুরূপে বিকাশ করিয়া তাহা ভোগ করে, তখন মুহূর্ত্ত শব্দে কথিত আর যখন সাকল্য অবস্থা ভোগ করে, তখন পরম মহান্ বলিয়া অভিহিত হয়। পরমাণু হইতে মহান্ পর্য্যন্তের ভোক্তা একমাত্র কাল, সুতরাং কাল সর্ব্বভোক্তা। আবার কাল কালকে কালরূপে নিয়তকাল ভোগ করিতেছে, সুতরাং ভোগ্য। কাল কার্য্য ও কারণ উভয়ই। জড়ভাব-বিকারের যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী কাল, তাহা কারণ; পরবর্ত্তী কালভাব কার্য্য। কারণ পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত, কার্য্য পরমুহূর্ত্ত। কাল আধার এবং আধেয়; কাল নিজেই নিজের আধার, অন্য আধার তাহার নাই।

কাল আত্মবশ। আত্মা যাহা আদেশ করেন, কাল তাহাই মস্তকে বহন করে। আমরা যদি একটা গোলাকে দ্রুতবেগে চালনা করি, তবে কোন প্রতিবন্ধক অবিদ্যমানে, কাল ক্রমাগত তাহাই করিবে। কালেতে নূতন কিছুই হয় না; চেতন কর্ত্তৃক যাহা আরব্ধ হয়, কালেতে কেবল তাহাই বহমান হয়; নূতন আরম্ভ, আত্মা ভিন্ন আর কাহারও দ্বারা সম্ভব নহে। পুরাতন অভ্যাসই কালের অধিকারে স্থান পায়। আত্মা যখন আপন

কার্য্যভার কালের হস্তে সমর্পণ করেন, তখন তাহাতে আত্মার কেবল অধ্যক্ষতা মাত্র থাকিলেই হইল, আত্মাকে স্বহস্তে সেই কার্য্য লইয়া পুনর্ব্বার বিব্রত হইতে হয় না, কালই তাহা সমাধা করিয়া ফেলে। মনে কর, চেতন আত্মা কর্ত্তৃক একটি আমের আঁটি পোঁতা হইল, চেতন আত্মার আর কোন কার্য্য নাই; আত্মা এখন কার্য্যভার কালের স্কন্ধে চাপাইলেন, এখন কালই আঁটিকে ক্রমে ক্রমে দুই তিন বৎসরে বৃক্ষে পরিণত করিয়া পরিশেষে আত্মাকে ফল ভোগ করাইবে, সুতরাং কাল আত্মবশ।

কালবশ প্রকৃতি। আবার প্রকৃতি কালবশ। প্রকৃতি যে কালের অধীন হইয়া পরিণতা হয়, তাহা স্বীকার্য্য; কেননা অদ্য আমের আঁটি পুঁতিলাম, প্রকৃতি তাহাকে আজই বৃক্ষে পরিণত করিতে পারিবে না, কালবশে ক্রম-পরম্পরায় বৃক্ষে পরিণত হইবে; যদি প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব থাকিত, তাহা হইলে আজই বৃক্ষে পরিণত হইতে পারিত, কালবশ হেতু তাহা পারিল না, সুতরাং প্রকৃতি কালবশ। প্রকৃতি যে কালের মুখাপেক্ষা করে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, যেহেতু জ্ঞানশক্তি-বিরহিত অচেতন প্রকৃতির কালজ্ঞান থাকা অসম্ভব; কোন্ কালে ইহা কর্ত্তব্য, কোন্ কালে ইহা অকর্ত্তব্য, তাহা অবধারণ করা জ্ঞানশক্তিবিহীনের সাধ্য নয়। যদি তাহা না মানা যায়, তাহা হইলে বিশ্ব জগতের সদাই সৃষ্টি হইত, কদাচ প্রলয় দশা প্রাপ্ত হইত না; অথবা ইহার চির প্রলয়াবস্থাতেই

অবস্থান অবশ্যম্ভাবী হইত, কদাচ সৃষ্টি হইত না, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়।

মহাকাল নিরাকার, নির্ব্বিকার, অবিনাশী, বিভু, নিত্য, অচ্যুত, অব্যয়, অনাদি, অনন্ত, অজ, অপ্রমেয়, সাক্ষী, দ্রষ্টা, নির্লিপ্ত, সর্ব্বগ্রাসী, আদি-অন্ত-মধ্য-রহিত, নিত্য-জাগ্রত, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ, স্বয়ম্ভু, স্বপ্রকাশ। ইনি কখন জন্মেন না, মরেন না, অথবা উৎপন্ন হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন না। ইনি জন্মরহিত, হ্রাস বৃদ্ধি আদি অন্ত শূন্য, শাশ্বত অর্থাৎ ক্ষয়শূন্য এবং পুরাতন অর্থাৎ পরিণামশূন্য, ষড়ৈশ্বর্য্য-শালী মহামহিম মহেশ্বর।

কাল অচিন্ত্য। কাল যে কত কালের, কাল তাহা নিজেই বলিতে পারে না। দিবা নাই, রাত্রি নাই, প্রভাত নাই, সন্ধ্যা নাই, মধ্যাহ্ন নাই, উষা নাই, এই সকল সময়জ্ঞাপক কোন চিহ্ন বিদ্যমান নাই, এরূপ কালবিহীন কালকে কল্পনায় আনিতে গেলে, মন আপনা হইতেই স্তম্ভিত হইয়া আসে। ফল কথা, সৃষ্টিকর্ত্তার স্রষ্টা নিরূপণের ন্যায়, অনাদি কালের আদি অনুসন্ধান জন্য বুদ্ধি চালনা করা বৃথা!

এই দেখ আর্য্যপ্রদীপের বিমল প্রভায় মহাকাল দণ্ডায়-মান। শ্রুতির উপদেশ—কাল হইতে বিশ্ব জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, কালেই স্থিতি হইতেছে, আবার কালেই লয় হইবে। কালেই সিদ্ধি হয়, কালেই বৃক্ষ ফলপ্রসব করে, কালেই তপোবৃক্ষ তপঃফল প্রসব করে, কালেই শিশুর বল বৃদ্ধি হয়, কালেই বৃদ্ধ-

দিগের বল বুদ্ধি হীন হয়, কালেই প্রসূতি প্রসব করে, কালেই সূর্য্য তাপ প্রদান করে। অকালে কিছুই হয় না। সময় উপস্থিত না হইলে কেহ বিদ্যা বা বুদ্ধিপ্রভাবে অর্থলাভে সমর্থ হয় না, আবার সময় অনুসারে মূর্খও অর্থলাভে সমর্থ হয়; অতএব সমস্ত কার্য্য কল-সাপেক্ষ সন্দেহ নাই। লোকের দুঃখের সময়ে কি বিজ্ঞান, কি শাস্ত্র, কি মন্ত্র, কি ঔষধ, ইহাদের কোনটাই ফল প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। আবার অভ্যুদয়কালে সকল উপায়ই যথাবিধি প্রয়োগ করিলে ক্রমে উহা তেজস্কর হইয়া সিদ্ধিপ্রদ হয়। কালসহকারে বায়ু প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত, জলধর সকল সলিলভরে অবনত, সরোবর শ্বেতপদ্ম ও নীলপদ্ম-সমাকীর্ণ, এবং বৃক্ষ সকল ফলফুলে সুশোভিত হয়; কালক্রমে চন্দ্রবিম্ব ষোড়শ কলায় পূর্ণ, বিভাবরী কখনও নিবিড় অন্ধকারাবৃত, কখনও বা বিমল জ্যোৎস্নায় বিভূষিত হয়। কালের সহকারিতা প্রাপ্ত না হইয়া বৃক্ষ সকল পুষ্প ফল প্রসবে সমর্থ হয় না, এবং নদী সকলও বেগে প্রবাহিত হইতে পারে না; হস্তী মৃগ প্রভৃতি পশুগণ, সর্প ও বিহঙ্গমগণ অসময়ে কদাচ সংযোগাদি নিমিত্ত মত্ত হয় না। ঐরূপ স্ত্রীলোকদিগের গর্ভসঞ্চার, বসন্তাদি ঋতু সমাগম, জীবের জন্ম মৃত্যু, বালকের মধুর বাঙ্‌নিষ্পত্তি, যৌবন সমাগম, যত্নে রোপিত বীজের অঙ্কুরোদগম, কাল প্রাপ্ত না হইলে কিছুই হয় না। অকালে উৎপন্ন কোনও বস্তু নাই। সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন জগৎ অতীতের অজ্ঞেয়তার রাজ্য অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান পান্থশালায় আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারে নাই, তখন

কাল

কি ছিল? কাল ছিল, সেই অনাদি কালই এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছে। শত পুরুষকারও কালস্রোতে ভাসিয়া যায়। কালের করুণায় সাগরতল পর্ব্বতের তুঙ্গ শৃঙ্গে পরিণত হয়, ক্ষুদ্র বীজ বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়, তরু স্থানে মধুর আবির্ভাব হয়, মরুমধ্যে স্রোতস্বতীর মনোরম মূর্ত্তি প্রকটিত হইয়া থাকে। কৃষকগণ প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া যথাকালের পূর্ব্বে উপযুক্ত শস্য প্রাপ্ত হয় না। তপঃসিদ্ধিতেও কালের কর্ত্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ। ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার; কালের পারমার্থিক রূপ দর্শন ও কালের প্রসাদে। কালের বশবর্ত্তিতায় জগৎ সৃষ্ট হয়, কালের দ্বারা বর্দ্ধিত, আবার কালমাহাত্ম্যেই বিনষ্ট হয়। কালই সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পোষণ করিতেছেন, পরি-শেষে ঘাড়ে ধরিয়া সংহার দশায় উপনীত করিবেন। কাল প্রজাপতির পূর্ব্ববর্ত্তী, কাল স্বয়ম্ভু, কালের কারণ নাই; কালই সর্ব্বকারণ; কাল আদি-অন্তবিহীন, ষড়ৈশ্বর্য্যযুক্ত; অন্তশূন্য, জরামরণবিহীন, জগতের কর্ত্তা, স্বাধীন, সর্ব্বগ, সকলের আত্মস্বরূপ। এই মহাকাল স্থূলও বটে, সূক্ষ্মও বটে, সাকারও বটে, নিরাকারও বটে।

মহাকালের কোন দৃশ্যরূপ নাই, ইহার ভাগ-বিভাগ নাই, দিবা নাই, রাত্রি নাই, আদি নাই, অন্ত নাই, বিশ্বব্যাপী সত্তা, কেবল অখণ্ড অনুভবস্বরূপ স্বপ্রকাশ বিরাট্ সত্তা। এই অসীম বিশ্বের ভদ্রাদি তদন্ত কাল কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সংসারে এমন কি আছে, যাহা কালের উদরসাৎ না হয়? পরন্তু

যেমন সর্পকে, কাল তেমনি সুরূপ, সুকর্ম্মা, মহাগৌরবসম্পন্ন মানবকেও ভক্ষণ করে। দাতা, কৃপণ, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, মৃদু, কর্কশ, সদয়, নির্দ্দয়, অধম বা উত্তম, এমন কেহই নাই, কাল যাহাকে গ্রাস না করে। কাল পর্ব্বতকেও যখন গ্রাস করিয়া থাকে, তখন সামান্য মানুষ ভক্ষণ করিয়া কি তাহার তৃপ্তি হইতে পারে ? নটগণ যেমন বিবিধ মূর্ত্তিতে ক্রীড়া করে, কালও সেইরূপ হরণ, নাশন, প্রাশন প্রভৃতি নানারূপে বিহার করিতেছে। বন্যহস্তী যেমন পাদপদিগকে, কাল তেমনি সংসারকে সমূলে উন্মূলিত করে। কাল সময়ে প্রজাকুল সংহার করিয়া অস্থিমালায় আপাদ মস্তক ভূষিত করে। মহাকল্প-বৃক্ষ হইতে সুর ও অসুররূপ ফল পাতনপূর্ব্বক ভক্ষণ করে এবং মাতার ক্রোড় হইতে তাহার প্রাণাধিক প্রীতিময় পুত্রকেও অনায়াসে গ্রহণ করিয়া থাকে।

শত শত মহাকল্প অতীত হইলেও ইহার শ্রান্তি বা খেদ বোধ হয় না। ক্ষুদ্র বৃহৎ কোন বস্তুই ইহার নিকট পরিহার প্রাপ্ত হয় না। ইহার মহিমা অবগত হওয়া সামান্য বুদ্ধির সাধ্য নহে। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী। এইরূপে কৃতান্ত ও মৃত্যু-স্বরূপ কাল প্রলয়কালীন নৃত্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুনরায় ব্রহ্মাদির সৃষ্টি করিয়া শোক-দুঃখ-জরাশালিনী সৃষ্টিরূপিণী নাট্যশালার আবিষ্কার করে এবং বালক যেমন পুত্তলিকাদি নির্ম্মাণ করিয়া আবার ভগ্ন করে, সেইরূপ চতুর্দ্দশ ভুবন, বিবিধ বনরাজি ও দেশ এবং নানাজাতীয় জীব জন্তু রচনা করিয়া

পুনর্ব্বার সংহার করে। এই কৃতান্তরূপী কাল তরুণ দেহেও জরার আবির্ভাব করিয়া প্রাণীদিগকে বিনাশ করে। আপ্ত ব্যক্তিও ইহার কৃপালাভে সমর্থ নয়। ইহার উদরের সীমা নাই। ইহার কৃপায় আবার আর্ত্ত ত্রাণ পায়। এই কাল পক্ষপাত-পরিশূন্য হইয়া সকলকেই সমভাবে গ্রহণ করে। সর্ব্বশাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত—কালই বিশ্বের হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা, ভোক্তা; কালই জগদাধার, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মূলাধার মহেশ্বর। কালেরই মহাক্রিয়া এই মহাবিশ্ব। কাল-শক্তি-বশেই বর্ত্তমান জগৎ ধাবিত, কাল-শক্তিবশেই অতীত জগৎ অতিক্রান্ত, আবার কাল-শক্তিবশেই ভবিষ্যৎ জগৎ আভাস-রূপে অবস্থিত। জগৎ কালে উৎপন্ন, আবার কালশক্তি-কবলে শেষ ইহার আত্মসমর্পণ। যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী, এই বিশ্বের কত মস্তক উন্নত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, সেই সকল উন্নত মস্তক একদিন মহাকালের অঙ্কে শেষ সমাধি লইবে। কালকে ছাড়িয়া কেহই কিছু করিতে পারে না, কালই সর্ব্বেসর্ব্বা, কালই বিশ্ব ভাঙ্গিতেছে গড়িতেছে, কালের হাত ছাড়াইবার উপায় নাই, মুক্তই হও আর বদ্ধই হও; মুক্ত হইলেও কালগর্ভে থাকিতে হইবে, বদ্ধ হইলেও কালগর্ভে থাকিতে হইবে। চিরকাল বিশ্বকে কালগর্ভে থাকিতে হইবে।

কাল-নদী নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। ক্ষুদ্র প্রবাহিনী যেমন মহানদীতে মিলিত হইয়া থাকে, মহানদী আবার সমুদ্রের

সহিত সংযুক্ত হয় ; মহানদী যেপ্রকার ক্ষুদ্র নদীর মিলন বশতঃ বিস্তির্ণা হয়, কদাচ শুষ্ক হয় না, নিরন্তর প্রবাহিত হয়, সেই প্রকার ক্ষণ মুহূর্ত্তাদি ক্ষুদ্র কালনদী, আর দিবস পক্ষাদি বৃহৎ কালনদী, সংবৎসরকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; ক্ষুদ্র বৃহৎ মিলিত হইয়া পরম্পর বিস্তীর্ণ হয়, কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। জগৎ স্বভাবস্রোতে পতিত হইয়া সততই ভাসমান হইতেছে ; কালরূপ মহা আবর্ত্ত, মাসরূপ তরঙ্গ, ঋতুরূপ বেগ, পক্ষরূপ উপল, নিমেষাদি ক্ষেত্র, অহোরাত্র সলিল, ধর্ম্মরূপ ঋষি, অর্থাভিলাষ পয়ঃ, সত্যবাক্য মুখ্যতীর, অহিংসা তরু, যুগ হ্রদ, সমুদয় আশ্রয় করিয়া নিয়ত অপ্রতিহতবলশালী ব্রহ্মোদ্ভূত কালরূপ মহানদী বিশ্বসংসার প্লাবিত করত ঈশ্বর-সৃষ্ট ভূতগণকে শমনভবনে নীত করিতেছে। উদারচেতা পণ্ডিতেরা জ্ঞানময় পোত দ্বারা অনায়াসে এই কালনদী উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন ; জ্ঞানপোত-বিহীন লঘুচেতা মানবগণ কখনই উহার পার হইতে সমর্থ হয় না। ছয় ঋতু যাহার নাভি, দ্বাদশ মাস যাহার অর, অমাবস্যাদি যাহার পর্ব্ব, কখনই যাহার অন্ত হইবে না ; যাহা নিরন্তর ঘূর্ণিত হইতেছে, এই বিশ্ব সংসার যাহার আস্যদেশে প্রবিষ্ট হয়, সেই কালচক্র নিভৃত গুহায় নিহিত রহিয়াছে।

কাল পদার্থভেদে ভিন্ন ভিন্ন। পদার্থ যেমন ভিন্ন ভিন্ন, তাহাদের আয়ু স্থিতিকালও ভিন্ন ভিন্ন, সকলের কাল সমান নহে। জগৎকারণ ব্রহ্ম, স্বীয় মায়া দ্বারা যত সংখ্যায়, যত

রূপে, যাবৎ পরিমাণে বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন, কালও তত সংখ্যায়, তত রূপে, তাবৎ পরিমাণে নির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কালও আছে। এমন সব প্রাণী আছে, যাহাদের মনুষ্যের এক দিনের ভিতর, জন্ম বৃদ্ধি, সন্তান প্রসব ও অপক্ষয় পর্য্যন্ত শেষ হইয়া যায়। আবার মনুষ্য অপেক্ষা দেবতারা দীর্ঘস্থায়ী। নরলোকের ষাটি হাজার বৎসর ব্রহ্মার এক মুহূর্ত্ত হয়।

সত্যের পরিমাণ ১৭২৮০০০ বৎসর, ত্রেতা ১২৯৬০০০ বৎসর, দ্বাপর ৮৬৪০০০ বৎসর, কলি ৪৩২০০০ বৎসর, এই চারি যুগের সমষ্টির ৭১ একাত্তর গুণ মনু ও ইন্দ্রের আয়ুকাল। আবার লোমশ মুনির একগাছি লোম পতনে, এক ইন্দ্রের পতন, এই প্রকারে লোমশ মুনির সমস্ত লোম পতনে তাঁহার মৃত্যু, সুতরাং লোমশ মুনির আয়ুসংখ্যা নির্ণয় করা যায় না। ব্রহ্মার একদিনে চতুর্দ্দশ মনুর মুক্তি, ও চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের পতন হয়। ব্রহ্মার এক মাসে ৪২০ ইন্দ্রের পতন, ব্রহ্মার এক বৎসরে ৫৪০০০ ইন্দ্রের পতন এবং ব্রহ্মার সমুদয় জীবিত কালে অন্যূন ৫৪০০০০ ইন্দ্রের বিনাশ হয়। ব্রহ্মার দিবসকে কল্প কহে। চতুর্যুগসহস্রে ব্রহ্মার এক দিন ঐ প্রকার রাত্রি, ব্রহ্মার অহোরাত্র ৮০০০০০ ৬৪০০০০০০০ আট পদ্ম চৌষট্টি কোটী। এই প্রকার ব্রহ্মার আয়ু শত বৎসর। মহর্লোকস্থ প্রাণীদিগের আয়ু সহস্র কল্প, জন লোকের আয়ুকাল দুই সহস্র কল্প, তপোলোকস্থ জীবের আয়ুকাল চারিসহস্র কল্প, সত্যলোকস্থ প্রাণীর

তত্ত্ববোধ

আয়ুকাল ব্রহ্মার সমতুল্য অর্থাৎ ইঁহারা মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন।

মহাকাল-বক্ষে কালা কালী দুয়েরই অবস্থিতি। কাল-বক্ষে চিৎ শক্তির, পুরুষ প্রকৃতির, কালী কালার, শিব শিবার, শ্যাম শ্যামার আসন নির্দ্দিষ্ট আছে। কালীর বক্ষে কালা, কালার বক্ষে কালী। বহ্নির দাহিকা শক্তি যেমন বহ্নি-বক্ষেই আপন আসন নির্দ্দেশ করে, তদ্রূপ কালের বক্ষে কালীর আসন নির্দ্দিষ্ট আছে। মহাকাল-রঙ্গভূমির কালমঞ্চে মহাকালীর মহানর্ত্তনই মহাবিশ্ব।

ব্যোম বা আকাশ

ব্যোম বা আকাশ অর্থাৎ শূন্য, অবসর, খালি বা ফাঁক, তাহারই নাম ব্যোম। দৈর্ঘ্য বিস্তার ও বেধ যে পদার্থের আকার, তাহাকে অসীম বলিয়া মনে করিলে যাহা পাওয়া যায়, তাহারই নাম ব্যোম বা আকাশ ; দেশ সকল তাহারই নামান্তর। যাহা অনন্ত বিশ্বকে থাকিবার জন্য স্থান বা আশ্রয়-স্বরূপ অবকাশ দিতেছে, তাহাকেই বলে মহাব্যোম। রূপের সীমাপ্রকাশক যে লক্ষণ, তাহাই ব্যোম। বদ্ধাবস্থায় আত্মার সহিত ব্যোমের যে সম্বন্ধ, মুক্তাবস্থায়ও সেই সম্বন্ধ। মহাব্যোম বিভু, নিত্য, অবিনাশী, নির্বিকার, নির্লিপ্ত, অব্যক্ত, অনাশ্রয়, অনালম্ব ; ইহার এই সকল গুণ আছে। গগন নিজে জানে না, তাহার ব্যাপ্তি বা সীমা কত দূর। আকাশই বায়ুর সহিত তেজের কারণ। তেজ আকাশ হইতে বায়ু গ্রহণ করিয়া প্রদীপ্ত হয়। আকাশই তেজের কারণ। চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র, অগ্নি প্রভৃতি তেজের রূপ ; এই সকল আকাশের অন্তর্গত। যে যাহার অন্তর্গত হয়, সেই পদার্থ, অন্তর্গত পদার্থ হইতে প্রধান হইয়া থাকে, আর অন্তর্গত পদার্থকে অল্প বলিয়া জানা যায়।

কোন ব্যক্তি অপরকে সম্বোধন করিতে গেলে, আকাশই সহযোগী হয়, কদাচ আকাশ ব্যতিরেকে সম্বোধন পদ উৎপন্ন

হইতে পারে না. আকাশ দ্বারা সেই আহূত ব্যক্তি আহ্বানের শব্দ শুনিতে পায়, আকাশ ভিন্ন শব্দের গতি হইতে পারে না, সুতরাং আকাশ ব্যতিরেকে আহ্বান বা শ্রবণ কিছুই সম্ভাবিত হইতে পারে না। দুই পদার্থের মধ্যে ফাঁক বা আকাশ না থাকিলে শব্দের গতি হয় না, অর্থাৎ আকাশ অভাবে সেস্থানে কোন পদার্থ থাকিলে শব্দ শ্রুত হয় না। আকাশ আছে বলিয়াই বজ্রের কড় কড়, বিহঙ্গের কাকলী, বালকের আধ আধ ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। শ্রবণ-ইন্দ্রিয় আকাশ হইতে উৎপন্ন। কার্য্যমাত্রেরই কর্ত্তা আছে। মহাব্যোম এখন অবকাশ দানরূপ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে; অবকাশ দানরূপ কার্য্য করাই যখন ইহার স্বভাব, তখন কাযেই ইহা কর্ত্তা। আবার অনন্ত বিশ্বের থাকিবার আশ্রয়স্থান মহাব্যোম, সুতরাং ইহাই অধি-করণ। মহাব্যোম মহাদয়ালু, ইহা তোমাকে থাকিবার স্থান দেয় বলিয়া তুমি থাকিতে পারিতেছ। আকাশে প্রাণীগণ জন্মে, অঙ্কুরাদি আকাশকে লক্ষ্য করিয়া উৎপন্ন হয়, গর্ভস্থ শিশু আকাশকে অবলম্বন করিয়া জন্মগ্রহণ করে ও বর্দ্ধিত হয়। এই আকাশ অবকাশ দেয় বলিয়াই তুমি নগর, কানন, বন, উপবন, অট্টালিকা, বিহারোদ্যান প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া জগতের এত সৌষ্ঠব সাধনে সমর্থ হইয়াছ।

ব্যোম সর্ব্বব্যাপী, বায়ুবিহারী ক্ষুদ্রতম কীটাণুর অলক্ষ্য কুক্ষিতে যে ব্যোমকণিকার অপ্রত্যক্ষ সঞ্চার, ঊর্দ্ধতম ব্রহ্মলোকেও সেই ব্যোম পরমাণুর বিপুল বিলাস। ব্যোম অনন্ত ও

সসীম। উহার দৈর্ঘ্য নাই, প্রস্থ নাই, ঊর্দ্ধপ্রসারিত উন্নতি নাই, অধঃ প্রসারিত অবনতি নাই, দিক্ নাই, বিদিক্ নাই, আছে কেবল অনন্তমুখী বিস্তৃতি। বুদ্ধি উহার পানে তাকাইয়া বিহ্বল হয়, কল্পনা উহার সীমা বা অবধি না পাইয়া অচল হয়। এই হেতুই জগতের জ্ঞান ও বিজ্ঞান ভক্তিসম্মিলিত কণ্ঠে এই মহাব্যোমকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পদ্মাসনরূপে নির্দ্দেশ করিয়া সভয় সম্ভ্রমে নমস্কার করিয়াছে। ব্যোম সৃষ্টি-উপকরণের অক্ষয় ভাণ্ডার, উহা আপনি আপনার মণিরত্নবিলসিত বরণীয় বস্তুভূষণে নিত্য বিভূষিত; উহার কোন অঙ্গে কৌস্তুভ, কোন অঙ্গে কহিনুর, কোথাও বা পদ্মরাগ, এবং কোথাও বা দূর্ব্বাদল-শ্যাম মরকত মণি বিভাসিত। কোন স্থানে শ্বেত সূর্য্য রজত-ছটায় দিগ্বলয় উদ্ভাসিত করিয়া অবিরাম গতিতে আবর্ত্তিত হইতেছে। কোন স্থানে কাঞ্চনসদৃশ প্রদীপ্ত প্রভাকর চারি-দিকে স্বর্ণরশ্মির অনন্ত রেখা বিস্তার করিয়া সাগরে তরঙ্গ তুলিয়া ঘূর্ণিত পথে গতি করিতেছে। কোথাও নীল, কোথাও লোহিত এবং কোথাও হরিতাভ রবি আপন আপন জগৎ আলোকিত করিয়া নির্দ্দিষ্ট গতিতে মহাবেগে প্রবাহিত হইতেছে। কেবল ইহাই নহে, প্রত্যেক সূর্য্যের সঙ্গে আবার অসংখ্য জীবের আধার, আশ্রয় ও লীলাভূমি অগণ্য পৃথিবী বা গ্রহনিচয় ঘূর্ণমান। কাহারও কণ্ঠে এক, কাহারও কণ্ঠে দুই, কাহারও কণ্ঠে তিন বা ততোধিক চন্দ্রমণি বিলম্বিত এবং কাহারও গলদেশে চাঁদে চাঁদে গাঁথা বিচিত্র পারিজাতহার দোদুল্যমান। ব্যোমের স্তরে

স্তরে ও পটলে পটলে কতই যে শোভার সম্পদ্ ফুটিয়া রহিয়াছে, কে তাহা গণনা করিবে।

কেহ বলেন ব্যোম আছেন, কেহ বলেন নাই ; কেহ বলেন ইনি ভাব, কেহ বলেন ইনি অভাব ;—মহা সমস্যা, মহা ধাঁধা। ভাব কারে বলি ? যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহাই ভাব পদার্থ। অভাব কারে বলি ? ভাব পদার্থের অব্যক্ত কারণে লীনকেই অভাব বলিয়া জানা যায়। ইহার কারণ—ভাবেরই অভাব হয়, অভাবের অভাব হইতে পারে না। যাহা আছে, তাহারই নাই হয় ; যাহা নাই, তাহার নাই হয় না : নাইএর নাই হইতে পারে না। অসতের উৎপত্তি ও সতের নাশ অসম্ভব। সহস্র শূন্য যোগ করিলেও এক হয় না, এককে সহস্র ভাগ করিলেও শূন্য হয় না; সুতরাং ভাব পদার্থেরই অদৃশ্য কারণে লীন অভাব। ব্যোম তবে পদার্থ কিসে ? ইনি অবকাশ দিতেছেন, তাহা তুমি অস্বীকার করিতে পারিবে না। তুমি একটা মাঠের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে অক্লেশে চলিয়া যাইতে পার, কারণ তোমাকে যাইবার জন্য ব্যোম অবকাশ দিতেছে ; কিন্তু একটি পাহাড় ভেদ করিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যাইতে পার না, কেননা তোমাকে অবকাশ দেয় নাই ; সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে "ভাব" তোমাকে মাঠের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইতে দিতেছে, সেই ভাবের অভাব হেতু তুমি পর্ব্বতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইতে পারিতেছ না ; সুতরাং সেই পদার্থটা ভাব। বিশেষতঃ ইনি যে ভাব পদার্থ, তাহা তাঁহার

গুণের দ্বারাই প্রকাশ পাইতেছে ; গুণ গুণীতেই বর্ত্তে, বিশেষ্যকে আশ্রয় করিয়াই গুণ বা বিশেষণ অবস্থিতি করে, অভাব পদার্থ বিশেষ্য হইতে পারে না এবং বিশেষণ অভাব পদার্থকে আশ্রয় করে না ; সুতরাং ইনি ভাব পদার্থ, কারণ ইহাতে বিভুত্ব অবিনাশিত্ব, নির্ব্বিকারত্ব নির্লিপ্তত্ব ইত্যাদি গুণ আছে। সেই হেতু ইনি ভাব পদার্থ আছেন, অভাব বা নাই নহেন। জগতে এমন কিছুই নাই, যাহা নাই, অর্থাৎ সকল বস্তুই আছে। যাহা নাই বা অভাব বলিয়া মনে করিতেছি, তাহাই আছে, কেননা একটা পদার্থ না থাকিলে, তুমি মনে কর কি প্রকারে ? তুমি যখন মনে করিতেছ, তখন উহা ভাব পদার্থ। যাহা নাই বা অভাব পদার্থের অনুমান অসিদ্ধ। আছে বা ভাব বস্তুতে নাই বা অভাব শব্দ প্রয়োগ করিবার যোগ্য হয়, নাই এর উপর নাই বা অভাবের উপর অভাব শব্দ প্রয়োগ হয় না। যখন তুমি নাই বলিয়া মনে ভাবিতেছ, তখন নাই বলিয়া একটা ভাব তোমার মনে প্রকাশ পাইতেছে; অতএব তুমি নাই বলিয়া যাহাকে মনে ভাবিতেছ, তাহাই আছে; যাহা নাই বলিয়া আছে, তাহাই মহাব্যোম।

মহাব্যোম, মহাকাল, প্রকৃতি, পুরুষ—সকলেই বিভু, অথচ কেহ কাহারও প্রতিবন্ধক নহে। বিশ্বে যত কিছু পদার্থ আছে, সকলই ব্যবহার্য্য। এই আকাশ বা ব্যোমও ব্যবহার্য্য। যে গুণী, যে কৃতী, সে সকল পদার্থকেই ব্যবহারযোগ্য করিয়া লইতে পারে। কর্ণ ও আকাশ এই দুয়ের পরস্পর যে সম্বন্ধ আছে

সেই সম্বন্ধের প্রতি সংযম প্রয়োগ করিলে দিব্য শব্দ উৎপন্ন হয় ; যোগীরা এই সংযম দ্বারা দিব্য শব্দ শুনিতে পান, দূরস্থ ও সূক্ষ্ম শব্দও শুনিতে পান। শরীর ও আকাশ, এই দুয়ের যে সম্বন্ধ আছে, তৎপ্রতি সংযম প্রয়োগ করিয়া, যোগিগণ লঘু অর্থাৎ তূলার ন্যায় অল্পভার হইয়া আকাশে যাতায়াত করিতে পারেন। আর্য্যের অধ্যাত্মবিজ্ঞান এই তত্ত্ব আয়ত্ত করিয়া ইহাকে ব্যবহারোপযোগী করিয়াছেন, অনেক অলৌকিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে অনার্য্য জড়-বিজ্ঞান ইহাকে কোন ব্যবহারে আনিতে পারে নাই, তবে তাহার এত দম্ভ কিসের? ব্যোম সর্ব্বপ্রকার শক্তির আদিভূত, অনন্ত পরমাণুসমূহের জন্য অদৃশ্য অক্ষয় ভাণ্ডার বলিয়া জানিবে।

শব্দ ও নাদ

শব্দ অর্থে নাদ বা ধ্বনি,—শ্রোত্রগ্রাহ্য গুণপদার্থ। ইহা আকাশবৃত্তি, নিত্য ও অনাদি। অনবরত বোধস্বভাব, চৈতন্যস্বরূপ আত্মা সর্ব্বার্থময় নির্ব্বিভাগ শব্দতত্ত্ব নামে গীত বা শব্দিত হইয়া থাকে, সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মা নাদ দ্বারা বহিঃ প্রকাশিত অবস্থাই শব্দ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যাহা উচ্চারিত হইলে কোন বস্তুর উপলব্ধি হয়, কোনরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহার নাম শব্দ। এই পদ এই অর্থের বোধক হউক, এই শব্দ হইতে এই অর্থ বোধগম্য, এই প্রকার অনাদি ঈশ্বর-সঙ্কেতই, ঈশ্বরেচ্ছাই শব্দশক্তি। শব্দের সহিত অর্থের নিত্য সম্বন্ধ। অর্থ শব্দের অর্থ কি?

যাহা অর্থিত বা যাচিত হয় তাহাই অর্থ, অর্থাৎ শব্দের নিকট যাহা যাচিত হয়; শব্দের নিকট অর্থ ছাড়া আর কি যাচ্ঞা করা যাইতে পারে? শব্দের নিকট শব্দের অর্থই যাচ্ঞা করা হয়, কাজেই শব্দের নিকট যাহা যাচিত হয় তাহাই অর্থ। যাহা প্রকাশ করে তাহা শব্দ, যাহা প্রকাশিত হয় তাহা অর্থ; অতএব শব্দের সহিত তদ্বোধ্য অর্থের নিত্য সম্বন্ধ। অতএব বলিতে পারা যায় শব্দের সহিত অর্থের বাচ্যবাচক, প্রকাশ্য-প্রকাশক সম্বন্ধ আছে, কাজেই নাম ও নামীতে সম্বন্ধ আছে, সুতরাং নাম ও নামীতে অভেদ।

আত্মাই শব্দ, আত্মাই অর্থ। ব্রহ্মই প্রকাশক, ব্রহ্মই প্রকাশ্য। ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে শব্দ ও অর্থ, কার্য্য কারণ বা প্রকাশ্য প্রকাশকরূপ ভাবে উপলব্ধ হইয়া থাকে। সকল বস্তুর আত্মাই প্রকাশক। আত্মা ছাড়া সকল বস্তুই প্রকাশ্য। শব্দই প্রকাশক, অর্থই প্রকাশ্য। প্রকাশক যে পদার্থ তাহা আত্মা, সুতরাং আত্মা ও শব্দ যখন প্রকাশক পদার্থ, তখন আত্মা ও শব্দ এক পদার্থ। আত্মা যাহা প্রকাশ করেন তাহা শব্দ, আর শব্দ যাহা প্রকাশ করে তাহা অর্থ। শব্দ সকলের অর্থবোধ-কারণতা, অর্থবোধ-যোগ্যতা, অর্থজ্ঞাপক শক্তি, অনাদি স্বভাব-সিদ্ধ। শব্দের সহিত অর্থের প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকতা, গ্রাহ্য-গ্রাহকতা, বাচ্য-বাচকতা, প্রকাশ্য-প্রকাশকতা সম্বন্ধ—মানববুদ্ধি স্থাপিত নহে, লৌকিক বা সাঙ্কেতিক নহে, শব্দের সহিত অর্থের বা নামের সহিত নামীর সম্বন্ধ—বর্ত্তমান সময়ের নহে, তাহা অনাদি কালের নিত্য সম্বন্ধ। যেমন গো এই শব্দ উচ্চারণ করিলে শৃঙ্গলাঙ্গুলাদিযুক্ত পশুবিশেষ বলিয়া বোধ হয়, বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ প্রকাশ হয়, সেই প্রকার প্রণব উচ্চারণ করিলেও সঙ্কেতজ্ঞ সাধকের হৃদয়ে প্রকৃত ঈশ্বরভাব উদিত হয়। উপাসনার নিমিত্ত ঈশ্বরের সহিত প্রণবের সঙ্কেত বন্ধন করা হইয়াছে সত্য বটে, কিন্তু তাহা আজকাল নহে। অনাদি কালের প্রণবের সহিত ঈশ্বরের অনাদি কালের সম্বন্ধ।

শব্দ দুইপ্রকার,—ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক। নানাপ্রকার বাদ্য-যন্ত্র প্রভৃতির যে শব্দ তাহা ধ্বন্যাত্মক, কণ্ঠসংযোগাদিজন্য শব্দ

ধ্বন্যাত্মক। দুই বস্তুর আঘাত হইলে শব্দ উৎপন্ন হয়, আবার আত্মপ্রযত্নে মানব-কণ্ঠ হইতে শব্দ নির্গত হয়; ইহাদের উভয়বিধ শব্দের কার্য্যকারিতা একরূপ নহে। ধ্বন্যাত্মক শব্দকে অব্যক্ত শব্দ বলে। শব্দ মাত্রেরই শক্তি এই যে, শব্দ শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হইবামাত্র আপনার স্বরূপাদি প্রকাশ করে এবং কোন না কোন মানস ক্রিয়া বা জ্ঞান উৎপাদন করে। যে সকল শব্দ শোক, হর্ষ, আবেগ প্রভৃতি মানস বিকারের জনক, অথচ যাহাতে কোনপ্রকার অর্থের সংস্রব থাকে না অর্থাৎ যাহা মানব-মনে কোনপ্রকার বস্তুর ছবি সংলগ্ন করে না অথচ শোক-হর্ষাদি জন্মায়, তাহা ধ্বন্যাত্মক শব্দ; যথা—মৃদঙ্গ, বীণা, রাগিনী ইত্যাদি। আমাদের নিকট পশুশব্দ ও ম্লেচ্ছশব্দ ধ্বনিবাচক। মনুষ্য-কণ্ঠ-নির্গত শব্দ, যদি বুদ্ধিপূর্ব্বক বা সংস্কারপূর্ব্বক উচ্চারিত না হয়, তবে সে শব্দ ধ্বনিবাচক বলিয়া গণ্য হয়; যেমন বালক, রোগী, পাগল ইত্যাদির য়্যাঁ, ওঁ, গ্যাঁ, গোঁ শব্দ।

বর্ণাত্মক শব্দ—যাহা দ্বারা বস্তুর বর্ণনা হয়, তাহার নাম বর্ণ। কণ্ঠসংযোগাদি জন্য শব্দকে বর্ণাত্মক শব্দ কহে। ঐ বর্ণাত্মক শব্দকে ব্যক্ত শব্দ, বাক্য, কথা বা উপদেশ প্রভৃতি বহু নামে ব্যবহার করা হয়। যে শব্দ মানব-কণ্ঠ হইতে বুদ্ধিপূর্ব্বক বিনি-র্গত হয়, অর্থের সহিত যাহার সম্পূর্ণ সংস্রব থাকে অর্থাৎ যে শব্দের দ্বারা মানব-মনে কোন না কোন বস্তুর আকার অনুভূত হয়, সেই সকল শব্দ বর্ণ-শব্দ বা ব্যক্ত শব্দ নামে পরিচিত। এই

অসীম মহিমান্বিত বর্ণ-শব্দের দ্বারা, কবিগণ গ্রাম, নগর, সরিৎ, সাগর, পর্ব্বত প্রভৃতি বহিঃপদার্থ ও কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি মানস ভাবের ছবি বর্ণনা দ্বারা অন্যের মনে স্থাপিত করিয়া থাকেন।

ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক উভয়ই আহত শব্দ। আহত শব্দের অতীত অনাহত ধ্বনি বলিয়া একপ্রকার শব্দ আছে, তাহার নাম অশরীরিবাণী। অশরীরিবাণী হৃদাকাশে ঈশ্বর-সকাশ হইতে উদ্ভূত হয়। তপস্যা দ্বারা চিত্ত মন মার্জ্জিত হইলে, সত্ত্বের অতি উৎকর্ষে বুদ্ধি নির্ম্মল হইলে, সাধকের বহু ভাগ্য-ফলে, দক্ষিণ কর্ণে ঐ নাদ প্রকাশিত হয়। ইহা অভ্রান্ত ও আপ্ত অর্থাৎ নিজ সম্পত্তি।

শব্দ স্বপ্রকাশ; প্রদীপ নিজেই নিজের প্রকাশক এবং অন্যেরও প্রকাশক, সেইরূপ শব্দ নিজেই নিজের প্রকাশক, অর্থেরও প্রকাশক; এই হেতু স্বপ্রকাশ। প্রকাশকত্বই ইহার কার্য্য। শব্দ বিশ্বপ্রকাশক। শব্দশক্তি-বলেই বিশ্ব প্রকাশিত হইতেছে। যদি শব্দজ্ঞান না থাকিত, শব্দজ্যোতিঃ সকল সংসারকে যদি প্রকাশ না করিত, তবে এই ত্রিভুবন অন্ধ-তমসাচ্ছন্নের ন্যায় প্রতীয়মান হইত, জড়বৎ অনুভূত হইত। যেমন সূর্য্যের উদয়ে সর্ব্ববস্তুর প্রকাশ হয়, সেইরূপ শব্দ-জ্যোতির প্রকাশে সর্ব্ববস্তুর প্রকাশ হয়।

শব্দশক্তিবলেই ইনি রাজা, ইনি প্রজা, পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতির বোধশক্তি জন্মে। এই শব্দই ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব—

যজুর্ব্বেদ, ইতিহাস, পুরাণাদি শাস্ত্র সকল, নীতিশাস্ত্র, দেব-বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, নৃত্যগীতাদি-শাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র প্রভৃতি সকলকে প্রকাশ করে। স্বর্গ, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, মনুষ্য, দেবতা, পশু, পক্ষী, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সত্য, মিথ্যা, সাধু, অসাধু, প্রিয়, অপ্রিয়, এই সমুদায়ই শব্দ দ্বারা বোধগম্য হইয়া থাকে। শব্দ না থাকিলে ধর্ম্মাধর্ম্ম, ক্রিয়াকর্ম্ম কিছুই জানা যাইতে পারে না। যদি শব্দ না থাকে, তাহা হইলে অধ্যাপনা হইতে পারে না এবং শ্রবণাদি-অভাবে, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সত্য, মিথ্যা, ক্রয়, বিক্রয়, কাজকর্ম্ম কিছুই হয় না এবং বিষয়ের বোধ জন্মিতে পারে না ; শব্দই ঐ সকল প্রকাশ করে। যাহারা বধির, তাহাদের শব্দজ্ঞান-অভাবে বোধশক্তি কম। এই নিমিত্তই শব্দ সকলের প্রধান ও প্রকাশক। শব্দ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মেরও প্রকাশক।

শব্দই বিশ্ব। বাক্ বা শব্দ হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি বা উৎপত্তি, শব্দেই উহার স্থিতি, শব্দেই উহা বিলীন হইয়া যায়। শব্দই বিশ্বের বন্ধনী শক্তি। শব্দচক্রে সকল বিশ্ব ঘুরিতেছে। পদ বা শব্দবোধ্য অর্থের নাম পদার্থ। পদ + অর্থ = পদার্থ। বাক্যের অর্থ দ্বারা যাহা প্রতিপন্ন হয়, তাহা পদার্থ। বাক্যের অবিষয়ী পদার্থ অজ্ঞেয়। যে কোন পদার্থ হউক, তাহা শব্দ-বোধ্য, এই নিমিত্ত পদার্থের পদার্থ নাম হইয়াছে। যাহা বাক্যের বিষয়ীভূত, তাহাই জ্ঞেয় ; যাহা কিছু আমাদের জ্ঞান-গম্য, জ্ঞানের আকারে আকারিত হইলে যাহা বাক্যের আকারে

প্রকাশিত হয়; আমরা যাহা মনে মনে চিন্তা করিতে পারি ও শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিতে পারি, তৎসমুদয়ই পদার্থ। অভাব একপ্রকার পদার্থ, স্বপ্ন একপ্রকার পদার্থ; কল্পনা একপ্রকার পদার্থ। জগতে এমন কোন শব্দ নাই, যাহার কোন অর্থ নাই; এমন একটি পদার্থ নাই, যাহার বাচক শব্দ নাই। বাচক শব্দ নাই তাহার প্রমাণ কি? পদার্থকে আঘাত করিলে তাহা হইতে যে শব্দ নির্গত হয়, তাহাই আহত শব্দ এবং তাহাই তাহার বাচক। সেই বাচক শব্দই সঙ্কেত অনুসারে সর্ব্বপ্রকার অর্থের বোধক হয়। শব্দ ও অর্থ দুই প্রকারেই প্রকৃতির পরিণাম নির্ম্মিত হইয়াছে। বিশ্ব প্রকৃতির পরিণাম, সুতরাং শব্দ পরিণাম। বাক্ বা শব্দতত্ত্বই বিভক্ত হইয়া গো, অশ্ব, মনুষ্য, ক্ষিতি, তেজ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন জাগতিকরূপে অবস্থান করে। শব্দ বিশ্বময়; বিশ্বের এমন কোন পদার্থ নাই, যাহাতে শব্দ নাই।

প্রকৃতি শব্দময়, শব্দ প্রকৃতিময়, সুতরাং শব্দ বিশ্বময়। শব্দ যে বিশ্বময় সর্ব্বব্যাপী, তাহা কি প্রকারে বুঝা যায়? বিশ্ব পঞ্চবিধ পরমাণু-সমষ্টি। পঞ্চবিধ পরমাণুতে শব্দগুণ আছে। পরমাণুতে যে শব্দগুণ আছে, তাহা কি প্রকারে বুঝা যায়? পরমাণু কারণ, বিশ্ব কার্য্য; পদার্থের বিয়োগ ব্যষ্টিই পরমাণু, পরমাণুর যোগ সমষ্টিই পদার্থ। পদার্থের যখন শব্দ আছে, তৎকারণ পরমাণুতেও শব্দ আছে। যাহা কারণে না থাকে, তাহা কার্য্যে থাকিতে পারে না; বিশ্বকার্য্যে যখন শব্দ আছে

অর্থাৎ মৃত্তিকায় ঠনঠন শব্দ, জলে কুলকুল শব্দ, অগ্নিতে সোঁ সোঁ শব্দ, বায়ুতে গোঁ গোঁ শব্দ আছে, তখন তৎকারণ পরমাণুতেও শব্দ আছে। আবার পরমাণু কার্য্য, শক্তি কারণ, শক্তিতেও শব্দ আছে।

পদার্থের শেষ বিভাজ্য যাহা অর্থাৎ তাহার আর ভাগ হইতে পারে না, ভাগের অতীত, তাহাই পরমাণু। বিন্দু কাহাকে বলি ? যাহার অস্তিত্ব আছে, অংশ নাই, তাহা বিন্দু অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, শক্তির শেষ বিভাজ্য যাহা, তাহা বিন্দু। রেখা কারে বলি ? যাহার দৈর্ঘ্য আছে, বিস্তার নাই, তাহাই রেখা অর্থাৎ বিন্দুসমষ্টিই রেখা ; রেখার শেষ বিভাজ্য যাহা, তাহাই বিন্দু। ব্রহ্ম কারে বলি ? যাহা পদার্থের শেষ সীমা, যাহার লয় ক্ষয় নাই, বিভাগ নাই, তাহা ব্রহ্ম। এই তিন পদার্থই এক, সুতরাং তিন পদার্থই শব্দময়, কাজে কাজেই বিশ্ব শব্দময় ; সুতরাং শব্দ, ব্রহ্ম, বিন্দু, পরমাণু—সমস্তই এক। অব্যক্ত শব্দব্রহ্ম বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। সেই নিরাকার শব্দব্রহ্মের সাকার রূপ—বেদ, গীতা, উপনিষদ্, এবং মানব ইত্যাদি।

বিন্দু, পরমাণু, ক্ষণ, সাধারণতঃ প্রত্যক্ষসাধ্য নয়, কেবল অনুমানসাপেক্ষ। বিন্দু যখন সমষ্টিভূত হইয়া রেখা হয়, পরমাণু যখন সমষ্টিভূত হইয়া পদার্থ হয়, ক্ষণ যখন সমষ্টিভূত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া কাল ও দণ্ডাদিতে পরিণত হয়, তখন আমরা উহাদিগকে বুদ্ধিগোচর করিতে পারক হই। যদি বল শব্দ

আগন্তুক, দুই বস্তুর যোগাযোগে শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে ; না, তাহা হইতে পারে না ; কেননা অসত্তের উৎপত্তি ও সত্তের বিনাশ, কোন কালেই হয় না, সুতরাং ঐ নাদ আগন্তুক নয়। শব্দ অব্যক্তভাবে চিত্তেও ছিল, অচিত্তেও ছিল, এই দুই সংযোগে অব্যক্তলীন শব্দ ব্যক্ত হইল।

শক্তিময় পরমেশ্বর জগদাকার ধারণ করিবার সময় বিন্দু, নাদ ও বীজ এই ত্রিধা ভিন্ন হইয়াছিলেন। বিন্দু শিবাত্মক, বীজ শক্ত্যাত্মক, নাদ উভয়াত্মক অর্থাৎ শিবশক্ত্যাত্মক। শব্দময় ব্রহ্মের মহামানস্থ শব্দই জগতের গতি বা অব্যক্ত অবস্থা। সূর্য্য-চন্দ্রাদির প্রতিবিম্ব যে যে আধারে পতিত হয়, তত্তৎ আধারের স্পন্দনশীলতা বশতঃ চঞ্চল বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে ; শব্দ-তত্ত্বও সেইরূপ নাদের হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত ও দ্রুত, মধ্য, বিলম্বিত বৃত্তি নিবন্ধন সবৃত্তিকবৎ প্রতীত হয়েন।

শব্দ অনন্ত। বিশ্বে পদার্থের অন্ত নাই, শব্দেরও অন্ত নাই। বিশ্বে যত রকম পদার্থ আছে, তত রকম শব্দ আছে। জগৎকারণ ব্রহ্ম স্বীয় মায়া দ্বারা যত সংখ্যায়, যাবৎ পরিমাণে, যত রূপে বিভক্ত হইয়া বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন, পদ বা শব্দের সংখ্যাও ঠিক তত। বিশ্ব-জগৎ শব্দব্রহ্মেরই পরিণাম। অনাদি-নিধন শব্দব্রহ্মই জগদাকারে বিবর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

কি জড়, কি উদ্ভিদ, কি জীব, সকলেই শব্দার্থের বশে কর্ম্ম করিয়া থাকে। তাবৎ ক্রিয়ার মূলই শব্দ। অগ্রে বা প্রথমে মানসে শব্দভাবনা আরম্ভ হয়, তাহার পরে হস্তাদি

কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। প্রাণবায়ুর ঊর্দ্ধগমন ব্যাপার—শব্দভাবনা, শব্দসংস্কার ব্যতীত হয় না। তাপ, তড়িৎ, আলোক, চুম্বক আকর্ষণ, মধ্যাকর্ষণ সংহতি, রাসায়নিক আকর্ষণ ইত্যাদি শব্দেরই ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম। ইহার শক্তি অসীম, ক্ষমতা আশ্চর্য্য। এই নামরূপ জগৎ শব্দের দ্বারা পরিচিত, লালিত, চালিত ও শাসিত। সকলপ্রকার সম্পদ্ বিপদের ইনিই মুল। মহাঁ মহা সমরে মহা মহা রথী, বড় বড় যোদ্ধা জীবন আহুতি দিতেছে, লক্ষ লক্ষ প্রাণী আহত হইতেছে, পত্নী পতিহারা হইতেছে, পিতা পুত্র হারাইতেছে। এরূপ হয় কেন? এই বিপদের মূল কে? একমাত্র শব্দ। কেননা সেনাপতি শব্দ করিল "যুদ্ধ কর," অমনি লক্ষ লক্ষ প্রাণী ছুটিল, কত লোক জীবন বিসর্জ্জন দিল; ইহা কেবল শব্দভাবনারই কার্য্য। একজন একজনকে কটূক্তি করিল, অমনি সে উত্তেজিত হইয়া তাহাকে হত্যা করিল; এই ভয়ানক দুর্ঘটনা শব্দবশেই হইল। মহারাজ দশরথ আজ্ঞা করিলেন বা শব্দ করিলেন "রামচন্দ্র তুমি বনে যাও," রামচন্দ্র অমনি বনে গমন করিলেন, চতুর্দ্দশ বৎসর বড়ই ক্লেশ পাইলেন। শব্দের প্রথম ক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি, তৃতীয় ক্ষণে লয়। মহারাজ-দশরথ-মুখনির্গত শব্দ অনেকক্ষণ লয় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই শব্দভাবনা বা শব্দসংস্কারই মহারাজকুমারকে চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যন্ত দুর্গতি ভোগ করাইল। শব্দশক্তিবশে কত বড় বড় সংসার শ্মশানে পরিণত হইতেছে।

অর্থের মূলও এই শব্দ। যতপ্রকার সম্পদ্, সৌষ্ঠব, উন্নতি, সকলের মূল শব্দ। এই শব্দশক্তিবশেই অরণ্য নগরে পরিণত হইতেছে, মরুভূমে ত্রিতল হর্ম্ম্য প্রস্তুত হইতেছে। এই শব্দশক্তি কত শোকীর শোক, দুঃখীর দুঃখ ভঞ্জন করে, আবার অশোকীর শোক, সুখীর দুঃখ ঘটায়; এইপ্রকার সেইপ্রকার কত আশ্চর্য্য বিচিত্র ঘটনা এই শক্তিবশে সাধিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বীণা, বংশী, মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ, সারেঙ্গ প্রভৃতি আশ্চর্য্য শব্দবিজ্ঞানের নিদর্শন। ভৈরবী, বেহাগ, ললিত, শ্রীরাগ প্রভৃতি শব্দশ্রীর অপূর্ব্ব প্রতিভা। আর্য্য-জগতে শব্দশক্তির উপর যত প্রভুত্ব, তত আর কাহারও নাই। যে রাগ রাগিণী দ্বারা পশু পক্ষী মোহিত, হিংস্রক হিংসা-বিস্মৃত, রোগীর রোগ দূরীভূত, শোকীর শোক বিগত, দুঃখীর দুঃখ বিহত, এ হেন শব্দ বিজ্ঞান আর কাহার আছে?

যে শক্তিবলে পতিতপাবনী গঙ্গার উদ্ভব, পাষাণ আর্দ্র, শীলা দ্রব, কর্কশ কঠিন চিত্ত কোমল ও নরম হয়, যে শক্তি-বলে নিরাকার সাকার হয়, নিষ্ক্রিয় সক্রিয় হয়, অচল সচল হয়, তাহা কাহার আছে? আর্য্য-শব্দ-বিজ্ঞান অপূর্ব্ব, অতি মহৎ তাহা কে বুঝিবে? আর্য্যেরা যে শব্দ-শক্তিবলে মহাশক্তি আয়ত্ত করিয়া সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সামর্থ্য ধারণ করিয়া, সর্ব্বশক্তির উপর আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন; আজ তাহা কৈ? সামধ্বনিতে, গীতাগানে তপোরণ্যে হিংস্র পশু হিংসা ভুলিয়াছে। যে শক্তির শক্তি জানিয়া আর্য্যেরা মহাশক্তির উপর আধিপত্য করিয়াছিলেন,

যে শক্তির বলে সকলের উপর অধিষ্ঠান করিবার জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, যাহার বলে সর্ব্ব বিশ্ব চালিত হইত, আজ আর্য্যেরা তাহা হারাইয়াছে। পূর্ব্বে লোকের বাড়ীতে রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, বিরাটাদি পাঠ হইত, আজ তাহা একপ্রকার লোপ হইতে বসিয়াছে। বেদ, গীতা প্রভৃতির শব্দ অর্থবোধ ব্যতিরেকেও কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া কত কত মঙ্গল সাধিত করে, তাহা আজ বিশ্বাসের অতীত হইয়াছে।

পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, তাহার জন্য অনুতাপ, দান, তপস্যা, শাস্তি, তীর্থপর্য্যটন ইত্যাদির দ্বারা উহা বিনষ্ট হইয়া থাকে। অনাদিনিধন বেদ হইতে, কত পুরাণ উপ-পুরাণ বাহির হইয়া, নিত্য নূতনের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, কত নব নব ভাব প্রকটিত করিতেছে, শব্দের অচিন্ত্য প্রভাব আর্য্য ছাড়া কে বুঝিবে? আর্য্যের বেদ, পুরাণ, সঙ্গীত প্রভৃতি নিত্য, অবিনাশী, উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়-বর্জ্জিত। আর্য্যশব্দ ছাড়া যত কিছু শব্দ, সমস্তই বর্ণাত্মক, তাহাতে পবিত্রতাকারী গুণ নাই। আর্য্যজিহ্বা ছাড়া, জড় জিহ্বায় এই শব্দ উচ্চারিত হয় না, জড়াচ্ছন্ন হৃদয়ে আর্য্যজ্ঞান প্রতিভাত হয় না। শব্দকে যদি শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ে বিভক্ত করা যায়, তাহা হইলে লোকের মনোগত ভাব ও পশু-পক্ষ্যাদির শব্দ বুঝা যায়, আর্য্য শব্দবিজ্ঞান অপূর্ব্ব।

শব্দই তৃতীয় চক্ষু। যেমন চক্ষুর দ্বারা বস্তুর আকার প্রকার অবগত হওয়া যায়, বস্তু প্রত্যক্ষ হয়, তেমনি শব্দের

দ্বারাও বস্তুর আকার প্রকার ভাব ভঙ্গী জ্ঞাত হওয়া যায়, বস্তু প্রত্যক্ষের ন্যায় প্রতিভাত হয়। বরং চক্ষু অপেক্ষা বাক্যের শক্তি অধিক। চক্ষু নিকটস্থ বস্তু প্রকাশ করে, বাক্য দূরস্থ বস্তুকেও প্রকাশ করে। মনে কর কাশীতে একটা ঘটনা ঘটিতেছে, কাশীর লোক চক্ষুর দ্বারা কলিকাতায় সেই ঘটনা দেখাইতে পারে না, কিন্তু বাক্যের দ্বারা প্রত্যক্ষের ন্যায় দেখাইতে ও প্রকাশ করিতে পারে। চক্ষুর দ্বারা সুখ দুঃখাদি অন্তঃপদার্থের জ্ঞান হয় না, কিন্তু বাক্য দ্বারা তাহা হয়। চক্ষুর দ্বারা অন্যের অন্তরে বস্তুর ভাবভঙ্গী আহিত করা যায় না, কিন্তু বাক্যের দ্বারা আহিত করা যায়। চক্ষু নিজ অধিষ্ঠাতার অনুগত, বাক্য কিন্তু নিজ অধিষ্ঠাতার ন্যায় অন্যেরও অনুগত। চক্ষু দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয় না, শব্দ দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়; এইজন্য শব্দরাশি শাস্ত্র—ব্রাহ্মণের তৃতীয় চক্ষু বলিয়া অভিহিত হয়। শ্রুতি ও স্মৃতি ব্রাহ্মণের দেবনির্ম্মিত দুই চক্ষু বলিয়া জানিবে। ইহার মধ্যে শ্রুতি কিংবা স্মৃতি রূপ এক চক্ষু না থাকিলে কাণা, এবং শ্রুতিস্মৃতিরূপ উভয়চক্ষু না থাকিলে অন্ধ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ফলতঃ কেবলমাত্র দৃশ্য-মান নেত্রদ্বয় থাকিলেই ব্রাহ্মণ চক্ষুষ্মান্ হইতে পারেন না, বেদ ও শাস্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণ চক্ষুষ্মান্ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। বাহ্য পথ পরিভ্রমণ করিলেই সেই সময় আমাদের বহিশ্চক্ষু উপকারে আইসে; কিন্তু অন্তর্মার্গে বা ব্রহ্মমার্গে বিচরণ করিতে হইলে এই বহিশ্চক্ষুর্দ্বয় কোন উপকারে আইসে না, সেই স্থলে

শব্দ বা নাদ

শ্রুতি ও স্মৃতি চক্ষুদ্বয়ই পথপ্রদর্শক হয়; সুতরাং শ্রুতি ও স্মৃতিরূপ চক্ষুদ্বয় না থাকিলে ব্রাহ্মণকে প্রতি পদেই বিড়ম্বিত হইতে হয়। জগতে যাহা কিছু পরোক্ষ ও অপরোক্ষ বস্তু আছে, সে সমস্তই শব্দের ঐশ্বর্য্য। বাক্যের দ্বারা সমস্ত পদার্থের উপলব্ধি হয়। পূর্ব্বকালে মুনি ঋষিরা গুরুসকাশে যাইয়া আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতেন, তাহা এই বাক্যপ্রসাদেই করিতেন অর্থাৎ বাক্যরূপ উপদেশজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইত; সুতরাং শব্দই ব্রহ্মদর্শনের দিব্যচক্ষু বা তৃতীয় চক্ষু। শব্দ ব্যতীত ব্রহ্মদর্শন হইতে পারে না।

শব্দই কর্ম্ম। কি বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম, কি অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম, উভয়ই জ্ঞান বা শব্দ দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। শব্দের ভাবনা বিনা পেশী আকুঞ্চিত বা প্রসারিত হয় না। শব্দভাবনা ব্যতীত স্নায়ু উত্তেজিত হয় না, শব্দ ব্যতিরেকে কেহ কাহাকেও আহ্বান করিতে পারে না। হস্তাদি অঙ্গের সঞ্চালন দ্বারা আহ্বান করা যায়, শব্দের দ্বারা আহ্বান করার ভাব বিশেষরূপে প্রকাশ করা যায়; মানস শব্দের প্রবাহ হস্তে না আসিলে নিশ্চয়ই হস্তের পেশী ক্রিয়া করে না। আমরা শব্দ বলিতে যাহা বুঝি, তাহাও মানস শব্দের মুখাদি-স্থানভেদে বিশেষ বিশেষ ভাবে অভিব্যক্ত রূপ। তাপের উত্তেজন, রাসায়নিক ক্রিয়া নিমিত্ত উত্তেজন, তাড়িত উত্তেজন ক্রিয়া ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন রূপে শব্দ উত্তেজনেরই ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা। শব্দভাবনাই সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের মূল এবং তাহাই কারণ। পূর্ব্ব সংবেদনার

সংস্কার মস্তিষ্কে লগ্ন হইয়া থাকে; প্রযত্ন অতীত ও বর্ত্তমান সংবেদনার ফল। বিনা কারণে, বিনা উত্তেজনায় কোনও কর্ম্ম হয় না; ইচ্ছা শক্তির ক্রিয়োন্মুখ অবস্থা, তাহা বিনা কারণে বিনা উত্তেজনায় হইতে পারে না। শব্দ ও স্পন্দন একই পদার্থ; বিনা স্পন্দনে শব্দ উৎপন্ন হয় না, বিনা শব্দে স্পন্দন উৎপন্ন হয় না। অণু পরমাণুর যত কিছু কার্য্য আকর্ষণ বিকর্ষণ—সমস্তই স্পন্দনাত্মক; যেহেতু স্পন্দনাত্মক, সেই হেতু শব্দমূলক। যেখানে স্পন্দন আছে সেইখানেই শব্দ আছে, যেখানে শব্দ আছে সেইখানেই স্পন্দন আছে। অণু পরমাণুতে সদা সর্ব্বদা আকর্ষণ ও বিকর্ষণ চলিতেছে, তাহাতে সদাই শব্দ কার্য্য করিতেছে। একটা বস্তুতে আর একটা বস্তু পতিত হইলে যে ঘাতপ্রতিঘাতরূপ ক্রিয়া বা স্পন্দন উৎপন্ন হয়, তাহার মূল শব্দ।

সকলেরই ভাষা আছে; পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, অগ্নি, বায়ু, তড়িৎ, গ্রহ, নক্ষত্র, তরু, লতা, সকলেরই ভাষা আছে, সকলেই নাদাত্মক, সকলেই শব্দ ব্যবহার করে। শব্দ হইতে যখন বিশ্বজগৎ আবির্ভূত হইয়াছে, তখন সকলেরই ভাষা আছে, এ কথা বিশ্বাস না হইবার কোনও কারণ নাই। জড়-বিজ্ঞান ভূত ও ভৌতিক শক্তির ভাষা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে, ইহারা এইজন্য ভূত ও ভৌতিক শক্তির ভাষা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারক হইয়াছে, সেইজন্য ভূত ও ভৌতিক শক্তির সহিত ইহাদের আলাপ হয়। ভূত ও ভৌতিক শক্তিকে ইহারা

যাহা বলে, উহারা তাহা শ্রবণ করে, এবং তাহার উত্তর প্রদান করে।

আর্য্য ঋষিগণ, শব্দতত্ত্ববিদ্ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, ত্রিলোকের শব্দ বুঝিতেন, এইজন্য তাঁহারা ত্রিভুবনের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। যে ছন্দে, যে স্বরে, যে কালে, যে মন্ত্রে, যে দেবতাকে আহ্বান করিলে তাঁহার শ্রুতিগোচর হয়, বেদের কৃপায় তাহা তাঁহারা জানিতে পারিয়াছিলেন ; এই জন্য তাঁহারা দেবতাগণকে আহ্বান করিতে পারিতেন, দেবতাগণও তাঁহাদিগকে দেখা দিতেন, উভয়ে উভয়ের ভাষা বুঝিতেন এবং কথোপকথনও হইত। শব্দ বা ভাষা ব্যতীত জ্ঞান থাকিতে পারে না। জ্যোতিষশাস্ত্রে, তন্ত্রশাস্ত্রে পশুপক্ষ্যাদির শব্দ দ্বারা শুভাশুভ লক্ষণ অবগত হইবার উপায় বর্ণিত আছে। আর্য্য ঋষিগণ কোন্ কোন্ বর্ণের সহিত কোন্ কোন্ রাশির, কোন্ কোন্ গ্রহের, কোন্ কোন্ ভূত ভৌতিক শক্তির ছন্দোগত সাদৃশ্য আছে, স্পন্দনের সাম্য আছে, তাহা নির্ণয় করিয়াছিলেন।

প্রথমতঃ প্রকৃতি-পুরুষ যোগে "অ" শব্দ উৎপন্ন হয়, ঐ শব্দের সহিত গতি ও তেজ সংলগ্ন রহিয়াছে। ঐ উৎপন্ন "অ" শব্দ অতি দ্রুত অস্বাভাবিক গতি দ্বারা চালিত হইতে হইতে, আভ্যন্তরিক অননুভূত ঘর্ষণ দ্বারা গতির হ্রাস হওয়ায় উহা সঙ্কুচিত হইয়া "উ" শব্দে পরিণত হয় ; তদনন্তর ঐ গতি মহাভূত কর্ত্তৃক বাধিত হওয়ায় "ম" শব্দ উৎপন্ন হইয়া "ওম্" শব্দে পরিণত হয়। বাক্য ও প্রাণ মিথুনীভূত। এই মিথুনীভূত

বাক্য ও প্রাণ শব্দব্রহ্ম প্রণবে সংস্পৃষ্ট আছে। এই প্রণব হইতে বিশ্বজগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।

যাহা দ্বারা বাক্য অভিব্যক্ত হয় এবং হৃদাকাশে আত্মা হইতে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহাই স্ফোটকরূপ প্রণব। তাহা স্বপ্রকাশ পরমাত্মা ব্রহ্মের সাক্ষাৎ বাচক শব্দ এবং সমুদয় বৈদিক-মন্ত্র ও উপনিষদের নিত্য বীজস্বরূপ। বিধানাদি দ্বারা কর্ণবৃত্তি আচ্ছাদিত হইলেও অথবা ইন্দ্রিয়বর্গের কার্য্য নিবৃত্ত হইলেও যে অবাধিত জ্ঞানতত্ত্ব এই স্ফোটকরূপ অব্যক্ত প্রণব শ্রবণ করেন, তিনিই পরমাত্মা; যোগিগণ যাঁহার উপাসনা করত, আত্মার আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক মালিন্য হইতে মুক্ত হইয়া অপুনর্ভব মুক্তিলাভ করেন।

অনন্তর সেই অব্যক্ত স্ফোটকরূপ প্রণবে তিন বর্ণ প্রকাশ পাইল; সেই বর্ণত্রয় ক্রমশঃ সত্ত্ব রজঃ, তমঃ, ঋক্ যজুঃ সাম, স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল, জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি প্রভৃতি বৃত্তি ধারণ করিলেন এবং আকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণরাশি নির্গত হইল। যেমন ঊর্ণনাভি (মাকড়সা) হৃদাকাশ হইতে মুখ দ্বারা ঊর্ণাতন্তু প্রকটন ও উপসংহার করে, তদ্রূপ সচ্চিদানন্দময়ের হৃদাকাশে আছেন যে প্রণব, তাহা স্বশক্তি দ্বারা ছন্দোময় সর্ব্বজ্ঞানাদি-সম্পন্ন বেদমূর্ত্তি হইয়া আকাশকে অবলম্বন করিয়া হিরণ্যগর্ভ-রূপ আধারচক্রে আবির্ভূত হইয়া বহুবাগ্‌বিশিষ্ট অনন্ত স্পর্শ, উষ্ম, অন্তস্থ বর্ণে ভূষিত, লৌকিকাদি ভাষায় বিস্তৃত, চতুরক্ষরাদি উত্তরোত্তর অধিক ছন্দোবিশিষ্ট বৃহৎ বাক্যক্ষ

হইয়া, কখনও ব্রহ্মার হৃদাকাশে প্রকটিত, কখনও অপ্রকটিত হন।

—

সমাধি-অবস্থাপন্ন পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার হৃদাকাশ হইতে প্রথমতঃ নাদ উৎপন্ন হইল, তাহাই প্রণব, যাহা আমরা কর্ণবৃত্তি আচ্ছাদন করিয়া অন্তরে অনুভব করিয়া থাকি। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা তাহা হইতে অন্তস্থ, উষ্ম, স্বর, স্পর্শ, হ্রস্ব ও দীর্ঘাদি-লক্ষণ অক্ষরসমূহের সৃষ্টি করিলেন ; পরে পুনরায় তাহা হইতে চারি বদন দ্বারা চাতুর্হোত্র কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত, প্রণবের সহিত চারিবেদ উৎপন্ন করিলেন। সেই বেদরাশিমধ্যে গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্ক্তি, ত্রিষ্টুপ্, জগতী ও অতিবিরাট্ ইত্যাদি ছন্দঃ সকল বিদ্যমান আছে।

বুদ্ধির বিষয়ীভূত অর্থ বা মনোভাব বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আত্মা মন বা বুদ্ধি দ্বারা যাহা বিষয়ীকৃত করেন, বাক্ বা শব্দ দ্বারা তাহাই উক্ত হইয়া থাকে। কেহ মনের অবিষয়ীকৃত বস্তু বর্ণনা করিতে সমর্থ নহে। আত্মা বুদ্ধি দ্বারা গৃহীত অর্থসমুহকে প্রকাশিত করিবার জন্য মনকে নিযুক্ত করেন। মন কায়াগ্নিকে তৎকর্ম্মভার অর্পণ করেন, কায়াগ্নি মরুৎকে নোদিত করে, মরুৎ হইতে বৈখরী-শব্দভাবাপন্ন মনোভাব প্রকটিত হয়।

কাষ্ঠমধ্যে অগ্নি থাকে, বিনা ঘর্ষণে তাহার অভিব্যক্তি হয় না, এবং তাহার অস্তিত্বও বুদ্ধিগোচর হয় না ; কিন্তু ঘর্ষিত হইলেই অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তখন ইহা স্বরূপ ও পররূপের

প্রকাশক হইয়া থাকে। বুদ্ধিস্থ শব্দসংস্কার যাবৎ অব্যাক্ত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে, তাবৎ ইহার অস্তিত্ব কাহারও হৃদয়ঙ্গম হয় না, তাবৎ ইহা অসংবেদ্য ভাবেই অবস্থান করে। বুদ্ধিস্থ শব্দ স্থান-করণাদি দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া যখন বিবর্ত্তিত হয়, তখনই ইহা অরণিস্থ অগ্নিস্বরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে। বুদ্ধিস্থ শব্দভাবনা বা শব্দসংস্কারই জ্ঞানের কারণ। বুদ্ধিতত্ত্বের সংকীর্ণতা বশতঃ বিনা উপদেশে সকল শব্দের অর্থ জানিতে পারি না, অরণিস্থ জ্যোতির ন্যায় আমাদের জ্ঞান আবৃত হইয়া থাকে। অরণিগর্ভ-বিদ্যমান জ্যোতিকে যেমন ঘর্ষণাদি দ্বারা অভিব্যক্ত করিতে হয়, সেইরূপ আমাদেরও উপদেশ-শ্রবণাদি দ্বারা বুদ্ধিস্থ শব্দসংস্কারকে প্রবোধিত করিতে হয়। উপদেশ ও ঔপদেশিক জ্ঞানের অন্য নাম যথাক্রমে শব্দ ও শব্দজ্ঞান। উপদেশ. শব্দ, শাস্ত্র, বেদ—এ সকল তুল্যার্থ।

বর্ণোৎপত্তি—শব্দ বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহা মনোভাবের সূক্ষ্ম বাগাত্মাতে অবস্থিত, আন্তর জ্ঞানের প্রব্যক্তাবস্থা। এই সূক্ষ্ম বাগাত্মাতে অবস্থিত আন্তর জ্ঞানের প্রকাশক শব্দ, কি প্রকারে পরিব্যক্ত হয়? বর্ণ দ্বারা ব্যক্ত হয়। বর্ণ কি প্রকারে উৎপন্ন হয়? আত্মা বুদ্ধি দ্বারা অর্থ বা প্রয়োজন নিশ্চয়পূর্ব্বক মনকে তাহা বলিবার জন্য, প্রকটিত করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করেন; মন কায়ান্তর্ব্বর্ত্তী অগ্নিকে এবং অগ্নি বায়ুকে প্রেরণ করিয়া থাকে। বায়ু এইরূপে প্রেরিত হইয়া, উদীর্ণ অর্থাৎ উচ্চারিত হইয়া ঊর্দ্ধগতি ও মূর্দ্ধ-

[illegible] অভিহত হইয়া, মুখবিবরে প্রবেশপূর্ব্বক স্বর, কাল, স্থান ও অনুপ্রদানাদি ভেদানুসারে "অ, আ, ক, খ" ইত্যাদি বর্ণ উৎপাদন করিয়া থাকে। একমাত্র অ, আ, ই, মূল বর্ণ, এই বর্ণত্রয় সকল বর্ণেই রহিয়াছে ; অ-বর্ণ ছাড়িলে কোনও বর্ণেরই বর্ণ থাকে না। একমাত্র অ-বর্ণই স্থান-কালাদি-ভেদে "আ, ই, ক, খ ইত্যাদি রূপ ধারণ করে ; যেমন বেহালা এবং সারেঙ্গ একপ্রকার যন্ত্র আছে, তাহাকে ছড়ি দিয়া টানিলে যে স্বাভাবিক শব্দ নির্গত হয়, তাহাই অ ; সেই স্বাভাবিক অ শব্দ, স্থান-কালাদি-ভেদে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বিবিধ শব্দ উৎপন্ন করে, কিন্তু সেই বিবিধ শব্দের মধ্যে স্বাভাবিক "অ" বর্ণ রহিয়াছে, বর্ণের মধ্যে অকার সর্ব্ববাশ্রয়ত্ব হেতু সকল বর্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা 'আমার'ই বিভূতি, অকার রূপে 'আমি' সর্ব্ব বর্ণ ও সর্ব্ব বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছি। স্বর, কাল, স্থান, প্রযত্ন ও অনুপ্রদান, এই পাঁচটি বর্ণবিশেষের হেতু। উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত-ভেদে স্বর ত্রিবিধ। আয়াম অর্থাৎ গাত্রের দৈর্ঘ্য, দারুণ্য অর্থাৎ স্বরের কঠিনতা, অণুতা অর্থাৎ গল-বিবরের সংবৃততা, এই তিনটি উদাত্ত। অন্বয়-সর্গ অর্থাৎ গাত্রের বিস্তৃততা, মার্দ্দব অর্থাৎ স্বরের স্নিগ্ধতা, স্থূলতা অর্থাৎ গলবিবরের উরুতা, এই তিনটি অনুদাত্ত। বর্ণ সকলের যে হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত, এই ত্রিবিধ ভেদ, তাহা কালকৃত। কণ্ঠাদি উচ্চারণস্থানের ভেদ নিবন্ধন বর্ণ সকলের মধ্যে যে ভেদ হইয়া থাকে, তাহাকেই স্থানভেদ বলা যায়। বাহ্য ও আভ্যন্তর-ভেদে

প্রযত্ন দ্বিবিধ। এই দ্বিবিধ প্রযত্নের মধ্যে স্পৃষ্ট, ঈষৎস্পৃষ্ট, বিবৃত ও সংবৃত, ইহারা আভ্যন্তর প্রযত্ন ; এবং বিবার, সংবার, শ্বাস, নাদ, ঘোষ, অঘোষ, অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ, উদাত্ত, অনুদাত্ত, ও স্বরিত, ইহারা বাহ্য প্রযত্ন। অনুপ্রদান, সংসর্গ, স্থান, করণ-বিন্যাস, এবং পরিমাণ অর্থাৎ মাত্রাকাল, এই পাঁচটি কারণ দ্বারা বর্ণবিশেষের উৎপত্তি হয়।

শব্দ বা বাক্যকে বেদে পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী, এই চারি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। তুরীয় বাক্ বা শব্দ অব্যক্ত ; ঐ অব্যক্ত বাক্ যখন ব্যক্ত হয়, তখন পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী নাম ধারণ করে। পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমা আমাদিগের অগোচর, ইহা যোগিগম্য ; বৈখরীনাদই আমাদিগের বোধ্য। এক নাদাত্মিকা বাক্ মূলাধার হইতে উদিতা হইয়া "পরা" এই নামে অভিহিতা হয়। নাদের সূক্ষ্মতা বশতঃ দুর্নিরূপণীয় বলিয়া হৃদয়গামিনী সেই পরা বাক্, "পশ্যন্তী" এই নামে উক্ত হয়। যোগিগণের দ্রষ্টব্য, সেইজন্য পশ্যন্তী নাম হইয়াছে। হৃদয়াখ্য মধ্যদেশে উদীয়মানা তিনিই বুদ্ধিগত বিবক্ষা অর্থাৎ বলিবার ইচ্ছা প্রাপ্ত হইলে, "মধ্যমা" এই সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া থাকেন এবং ব্যক্তে অবস্থানপূর্ব্বক কণ্ঠ, তালু ও ওষ্ঠ প্রভৃতি স্থানের ব্যাপার দ্বারা যখন বহির্গমন করেন, তখন "বৈখরী" এই আখ্যা প্রাপ্ত হন।

প্রথম পরাখ্য নাদ, ইহা প্রাণময় আধারচক্রে অবস্থিত। দ্বিতীয় পশ্যন্তী, ইহা মনোময় অর্থাৎ প্রাণে মিথুনীভূত বাক্য।

যখন মনে মনে স্মরণ করা হয়, তখন ইহা মনোময়, ইহার আধার মণিপুর বা নাভি। মূলাধার হইতে নাদ উত্থিত হইয়া, স্বাধিষ্ঠান ভেদ করিয়া মণিপুরে উদয় হয়। তৃতীয় মধ্যমা, ইহা বুদ্ধিময়, বুদ্ধিতেই ইহা প্রকাশ পায় অর্থাৎ মনেতে যে নাদ অভিব্যক্ত হইয়াছিল, তাহা বিচারপূর্ব্বক ব্যক্ত করিবে, এই হেতু বুদ্ধিময়। যে পরাখ্য নাদ স্বাধিষ্ঠান ভেদ করিয়া মণিপুরে উদয়ানন্তর পশ্যন্তী নাম ধারণ করিয়াছিল, তাহাই হৃদয়ে অনাহত চক্রে আসিয়া মধ্যমা নাম ধারণ করিল; আঙ্গুল দিয়া কাণ বন্ধ কবিলে এই নাদ শুনিতে পাওয়া যায়। চতুর্থ বৈখরী, যাহা ব্যক্ত হয় তাহাই বৈখরী। ঐ হৃদয়স্থ মধ্যমা বাক্ যখন বিশুদ্ধ চক্র বা কণ্ঠ ভেদানন্তর বাগিন্দ্রিয় আশ্রয় করিয়া বহির্গত হয়, তখন উহা বৈখরী নাম ধারণ করে। মূলাধার অনন্ত শক্তিরূপ ভূমাব্রহ্মে অধিষ্ঠিত আছে যে শব্দ, যাহা সর্ব্বভূতে সূক্ষ্ম নাদরূপে অবস্থিতি করে, তাহা অতি সূক্ষ্মদর্শীরা মৃণাল ও ঊর্ণাতন্তুর ন্যায় লক্ষ্য করেন।

যেমন দারুগতাকাশে অব্যক্ত অগ্নি আছে, সেই কাষ্ঠ মথিত হইলে প্রথমতঃ অগ্নির কিঞ্চিৎ অভিব্যক্তি হয়, কিন্তু তখনও দৃষ্টিগোচর হয় না, আরও অধিক মথিত হইলে বায়ু-সহকারে প্রথমতঃ সূক্ষ্ম স্ফুলিঙ্গরূপে উদ্ভূত হইয়া ঘৃত প্রাপ্তিপূর্ব্বক অতিশয় বর্দ্ধিত হয়, তখন দৃষ্টিগোচর হয়, বাণীও সেইরূপ। শব্দব্রহ্ম বায়ুসহকারে মূলাধারে প্রবিষ্ট হইয়া কিঞ্চিৎ অভিব্যক্ত হইল, মূলাধার হইতে উত্থিত হইয়া স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর ভেদ

করিয়া অনাহতে আসিল, এখন পর্য্যন্ত অবোধ থাকিল। মূলাধার হইতে ক্রমে অল্প অল্প ব্যক্ত হইতে হইতে মনোময় সূক্ষ্মরূপ প্রাপ্ত হইয়া কণ্ঠভেদ করিয়া মুখবিবরে হ্রস্বাদি মাত্রা, উদাত্তাদি স্বর ও অকারাদি বর্ণভাবে স্থূলরূপে নানাপ্রকার শব্দরূপ ধারণ করিয়া বাগিন্দ্রিয় দ্বারা যখন অভিব্যক্ত হইল, তখনই আমাদিগের জ্ঞানগোচর হইল। যেমন অগ্নিসখা বায়ু, বায়ুর সাহায্যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ বাক্‌সখা বায়ু, বায়ুকে আশ্রয় করিয়া বাক্য নির্গত হয়। নাদের প্রথম ক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি, তৃতীয় ক্ষণে লয়। উৎপত্তি হইলেই লয় আছে, নাদের লয় কোথায়? নাদ মূলাধার হইতে উত্থিত হইয়া তুরীয় স্থান ব্রহ্মধাম সহস্রারে অর্থাৎ মস্তকে যাইয়া লীন হয়।

বেদোক্ত নাদের সপ্তম বেণুনাদই বংশীধ্বনি। এই বংশীতে সর্ব্বদাই প্রণবধ্বনি হইতেছে। সাধকের বেণুনাদ উত্থিত হইলে তিনি নিম্নলিখিত অবস্থা প্রাপ্ত হন, গূঢ় বিজ্ঞান অর্থাৎ অজ্ঞাত বিষয় সকল জানিতে পারেন, ভীরু ভয়শূন্য হন, হিংস্রক হিংসারহিত হন, কোনপ্রকার দুঃখ থাকে না, প্রত্যুত সদানন্দে মগ্ন থাকেন, কন্দর্পবিকার থাকে না, এই নাদে মন প্রাণ মাতোয়ারা হয়, বাহ্যজ্ঞান থাকে না। সেইজন্য নীবিবন্ধ খসিয়া পড়ে, চুল আলুলায়িত হয়, ক্ষুধা তৃষ্ণা রহিত হয়, জীবিত-নিরপেক্ষ শরীরে মমতা রহিত হয়, মোহ অপগত হয়, বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হয়, বৈরাগ্য হেতু স্ত্রীপুত্রাদি সংসার ভাল লাগে না, সমাধি-অবস্থা-তুল্য হইয়া পড়ে। এই বেণুনাদ

শব্দ বা নাদ

সাধককে পরব্রহ্মের সহিত মিশিবার জন্য নিরন্তর উৎসুক রাখে, সাধক কোনও বাধা বিপত্তি মানে না। বসন্তকাল আমাদের কাছে যেরূপ মধুর, নাতিশীত, নাতিগ্রীষ্ম ; বংশীরবে সাধকের অন্তরও বসন্তের ন্যায় প্রফুল্লতা ধারণ করে। বসন্তকালে দ্বিপ্রহরে দারুণ জ্বালা বোধ হয়, কিন্তু এ রবে জ্বালা নাই, বরং শীতলতা আছে। বেদে ইহা নিরাকার, হৃদয়ে অনাহতে নিরাকার চিৎবংশীধর নিরাকার নাদে নিরাকার জীবকে আকর্ষণ করিতেছে। বেদ উক্ত নিরাকার চিৎকে সাকার কৃষ্ণরূপে, হৃদয়কে বৃন্দাবন, সপ্তম নাদকে সপ্তরন্ধ্রাত্মক বংশীধ্বনি ও জীবকে রাধিকারূপে উক্ত করিয়াছেন। কবিরা ঐ বংশীধ্বনির গুণ, অনির্ব্বচনীয় প্রভাব, অপূর্ব্বভাবে অতি মধুর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে পুলকে আত্মহারা হইতে হয়।

বাক্য

বাক্য দুইপ্রকার—সত্য বাক্য ও মিথ্যা বাক্য। সত্য বাক্যের আর এক নাম আপ্ত বাক্য। বাক্য মাত্রেই সত্য বা যথার্থ জ্ঞানের জনক নহে, তাহাও ভ্রমোচ্চারিত হইতে দেখা যায়, অতএব কিরূপ বাক্য প্রমাণ বা সত্য জ্ঞানের জনক, তাহা বিশেষরূপে বিবেচ্য। কোন্ বাক্য সত্য, কোন্ বাক্য মিথ্যা, তাহা বোধগম্য হওয়া সহজ নহে। সহজ না হইলেও তাহার লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাকে বলে আপ্ত শব্দ বা আপ্ত বাক্য। আপ্ত বাক্য বা শব্দজ্ঞান ইহা সত্য, ইহা একেবারে নির্দ্দোষ। প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি সকল প্রমাণই ভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু আপ্ত বাক্য ভ্রান্ত হইতে পারে না, বাস্তবিক ইহা অভ্রান্ত। অভ্রান্ত জ্ঞানের অসীম, অনাদি, অনন্ত ও একমাত্র আকর আপ্ত বাক্য; উহার হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, উন্নতি নাই, অবনতি নাই, লয় নাই, ক্ষয় নাই। মহাপ্রলয়েও যাহা প্রবাহরূপে নিত্য, অনাদি কাল হইতে অনন্ত কালস্রোতে যাহা একইরূপ ছিল, আছে ও থাকিবে, যাহা ভূলোক, দ্যুলোক, দেবলোকের ধ্বংসকালেও দেদীপ্যমান, যাহা সর্ব্বকালের অতীত, সর্ব্বকালে উপস্থিত, কালের ধ্বংসে, স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়েরই সংহারে যাহার সত্তা সমভাবে বিদ্যমান, অভ্রান্ত জ্ঞানের সেই একমাত্র আধার "আপ্ত

বাক্য" ; জ্ঞানের ইহাই প্রকৃত প্রমাণ, পরিমাপক এবং পন্থা ; জ্ঞান মাত্রেই ইহা হইতে উদ্ভূত ; যাহা ইহাকে অতিক্রম করিতে যায়, ইহার বিরোধি হয়, ইহার বিপরীত পথে বিন্দুমাত্রও চলে, তাহা জ্ঞান নহে অজ্ঞান, নিশ্চয় নয় ভুল, তাহা অভ্রান্ত নয় ভ্রান্ত, প্রমাণ নহে প্রমাদ। আপ্তবাক্য বলি কারে ? আপ্ততা বাক্যের কি পুরুষের ? আপ্ততা বাক্যেরও বটে, পুরুষেরও বটে। আপ্ত অর্থাৎ বিশ্বস্ত, সত্য ; যে পুরুষের ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা অর্থাৎ পরপ্রতারণেচ্ছা, ইন্দ্রিয়গণের অশক্তি বা বাগ্‌যন্ত্রের অসম্পূর্ণতা নাই, সেই পুরুষই আপ্ত পদের উপযুক্ত। উক্ত পুরুষ যাহা বলেন, যাহা উপদেশ করেন, তাহা প্রমাণ ও সত্য, তাহা অভ্রান্ত। ইন্দ্রিয়গণের অশক্তি অর্থাৎ কর্ণের বধিরতা, জিহ্বার জড়তা, ত্বকের কুষ্ঠতা, চক্ষুর অন্ধতা, নাসিকার ঘ্রাণহীনতা, বাক্যের মূকত্ব, হস্তের কুণিত্ব, পাদের পঙ্গুত্ব, পায়ুর বুদাবর্ত্ত, উপস্থের ক্লীবতা, মনের উন্মত্ততা,—এই সকল ইন্দ্রিয়ের অশক্তি যাহার থাকিবে, সে কখনও আপ্ত পুরুষ হইতে পারিবে না। বাক্যের আপ্ততা যথা—আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি, যোগ্যতা ও তাৎপর্য্য ; যে আপ্ত পুরুষের বাক্যে এইগুলি আছে, তাহাই আপ্ত বাক্য ; যে বাক্যে এই চারিটি নাই, তাহা আপ্ত পুরুষের বাক্য হইলেও অনাপ্ত বাক্য হইবে।

আকাঙ্ক্ষা—"বৃক্ষ" একটা শব্দ করা গেল, তৎসঙ্গে একটা আকাঙ্ক্ষা রহিল—মরা কি জীবিত, ফলা কি অফলা।

আসত্তি—যে সকল শব্দ যোজনা করিয়া একটা বাক্য রচন

করিবে, সম্বন্ধ অনুসারে সেই সকলকে বিনা বিলম্বে ও পরে পরে উচ্চারণ করার নাম আসত্তি। এই আসত্তিই অর্থবোধের প্রধান কারণ। শব্দ সকল আসত্তিক্রমে উচ্চারিত না হইলে অর্থ-প্রকাশ হয় না। আজ বলিলাম রাম, কাল বলিব গিয়াছে, তাহা হইবে না ; যে সময়ে রাম বলিলাম, সেই সঙ্গেই গিয়াছে বলিতে হইবে।

যোগ্যতা—যে বাক্যের অর্থ প্রত্যক্ষ ও যুক্তির অবিরোধী, সেই বাক্যই যোগ্য বাক্য। যেমন "এই স্ত্রী বন্ধ্যা" ইহাই যোগ্য বাক্য, "ইহার জননী বন্ধ্যা" ইহা অযোগ্য বাক্য, কেননা পুত্র থাকা সত্ত্বে বন্ধ্যা হইতে পারে না।

তাৎপর্য্য, বক্তার অভিপ্রায় বা মনোগত ভাববিশেষকে তাৎপর্য্য বলে, তাৎপর্য্য শব্দজ্ঞানের প্রধান অঙ্গ, তাৎপর্য্য-যুক্ত বাক্য প্রকৃষ্ট পরিমাপক ; যে বাক্যের তাৎপর্য্য নাই, সে বাক্য আকাঙ্ক্ষা আসত্তি ও যোগ্যতা অনুসারে উচ্চারিত হইলেও অপ্রমাণ। "ইহার জননী বন্ধ্যা" এই বাক্য যদি তাৎপর্য্যযুক্ত হয়, তবে এই বাক্যই উৎকৃষ্ট বাক্য ; "ইহার জননী বন্ধ্যা" এই বাক্যে যদি এইপ্রকার অর্থ প্রকাশ হয় যে, ইহার জননীর পুত্র হওয়া অপেক্ষা না হওয়া ভাল ছিল, কেন না পুত্র হইতে কোনও সুখ হইল না, বরঞ্চ দুঃখই জন্মিল, সেইখানে এই বাক্য শোভ-নীয়। সমুদয় কথার সারসঙ্কলন এই যে, যে বাক্য আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি, যোগ্যতা ও তাৎপর্য্য, এই চারিপ্রকার সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ, সেই বাক্যই আপ্ত বাক্য ; অন্যপ্রকার আপ্ত বাক্য নহে।

বাক্য

চক্ষুরাদির ন্যায় আপ্ত বাক্যও যথার্থ জ্ঞানের জনক। এমন আপ্ত পুরুষ কেহ আছেন কি না, যাহাতে উক্ত দোষ সকল নাই। সাংখ্য ও বেদান্ত বলেন—এক আপ্ত পুরুষ ঈশ্বর, আর এক আপ্ত পুরুষ যোগী।

ঈশ্বর নিত্যাপ্ত, যোগী নৈমিত্তিকাপ্ত অর্থাৎ নিমিত্তাধীন ; কোনও হেতু হইতে যাঁহার আপ্ততা উৎপন্ন অর্থাৎ ধ্যান, ধারণা, সমাধি বা শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন হইতে যাঁহার আপ্ততা উৎপন্ন হয়, তাঁহাকে নৈমিত্তাপ্ত বলে।

বাল্যকাল হইতে শব্দ শ্রবণ, কার্য্য দর্শন, ব্যবহারপদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ ও মনন করিতে করিতে মনুষ্য যথাকালে যাইয়া শব্দ-রাশির বিচিত্র শক্তি অবগত হইতে পারে, শব্দে অর্থ প্রত্যয় ব্যুৎপত্তি সামর্থ্য আছে তাহা জানিতে পারে। শিশুকাল হইতে বাক্য শ্রবণ ও ব্যবহার দর্শন করিতে করিতে কালে বহু জ্ঞান সঞ্চিত হয়। যদি কোনও লোক কাহাকেও কিছু না বলে ও কোনও লোক কাহারও নিকট কিছু না শুনে, তাহা হইলে সে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, ইন্দ্রিয় সকল থাকিতেও ইন্দ্রিয়হীন। অধিক কি, বাক্যব্যবহার না থাকিলে আমাদের কোনও জ্ঞানই সঞ্চিত, সমুৎপন্ন ও পরিষ্কৃত হইত না ; বাক্‌শক্তি ও তজ্জাত ভাষা না থাকাতেই পশুজাতি অজ্ঞানান্ধ। সদ্যঃপ্রসূত বালককে যদি জনশূন্য অরণ্যে রাখা যায়, তাহা হইলে তাহার কিরূপ জ্ঞান হয়, তাহা একবার ভাবিলেই বুঝা যায়। যদি এক কালে সকল

মনুষ্যই বাগিন্দ্রিয়-বিহীন হয়, তাহা হইলে এ সংসারের দশা কি হয়, তাহা অল্প চিন্তা করিলেই বুঝা যায়।

ব্রহ্মজ্ঞান-লাভ আপ্তোপদেশেরই কার্য্য। বাক্য—কি লৌকিক, কি অলৌকিক, কি তাত্ত্বিক—সমুদয় পদার্থেরই প্রকাশক। সমুদয় পদার্থেরই ব্যবহার-উপযুক্ত নাম আছে। মনুষ্য আদি-সৃষ্টি-সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত সেই সকল নাম শুনিয়া শুনিয়া শিখিতেছে। এই কারণে লোকের মনে স্বভাবতঃই এই চিন্তার উদয় হয় যে, প্রথমে মনুষ্য কাহার নিকট বাক্‌শক্তি পাইল, কাহার নিকট সঙ্কেতে বাঁধা শব্দ শুনিয়াছিল ; অবশেষে স্থির হইয়া থাকে বাক্‌শক্তি ও সঙ্কেত বাঁধা শব্দ, যাহার অন্য নাম ভাষা, তাহা আদিশরীরী ব্রহ্মার আত্মায় আপনা আপনি আবির্ভূত হইয়াছিল। সেই অনাদি-নিধন অনন্ত শব্দরাশিই আর্য্যের বেদ, সেই সকল বেদ শব্দ ; দেশভেদে ও মনুষ্যের বাগ্‌যন্ত্রের গঠনাদিভেদে বিকৃত হইয়া নানা আকারে পরিণত হইয়াছে। যতই ভাষা থাকুক সকলের মূলেই বেদ।

সৃষ্টি যদি অনাদি হয়, মনুষ্যের যদি আদি না থাকে, তাহা হইলে বেদও অনাদি। আমাদের বুদ্ধি ষড়্‌দর্শনের নিকট সামান্য জোনাকিপোকা-বিশেষ ; সেই ষড়্‌দর্শন যাহার নিকট মস্তক অবনত করিয়াছে, সে বস্তু যে শ্রেষ্ঠ, তাহা কে না স্বীকার করিবে ? যাহার অর্থ বুঝি আর না বুঝি, যাহার শব্দ উচ্চারণ করিলে শরীর মন পবিত্র হয়, ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল হয়, সেই

বাক্য

আপ্ত শব্দরাশি বেদ যে অতি মহান্ তাহার আর সন্দেহ কি ? বেদ আর্য্য-আশ্রিত, আর্য্য বেদ-আশ্রিত, বেদশব্দ আর্য্যশব্দ, বেদজ্ঞান আর্য্যজ্ঞান ; যাহা আর্য্যশব্দ নয় তাহা পশুশব্দ, যাহা আর্য্যজ্ঞান নয় তাহা পশুজ্ঞান। প্রাণেন্দ্রিয়-মনোময়-রূপ অথচ দুর্জ্ঞেয়, দেশ কাল দ্বারা যাহা অক্ষররাশি-বিশিষ্ট, পুস্তকরূপী নহে, এতাদৃশ বেদ গম্ভীর সমুদ্রের ন্যায় মহান্ ও গ্রহণীয়। জ্ঞাতব্য পদগুলি যাহার অঙ্গ, সিদ্ধি যাহার পর্ব্ব, স্বর ও ব্যঞ্জন যাহার ভূষণ, সেই দিব্য অক্ষর ব্রহ্মকে নমস্কার।

প্রকৃতি

এই মহাশক্তিকে বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। মায়া, শক্তি ও প্রকৃতি। মায়ার কার্য্য ভ্রম উৎপাদন, অদ্বৈতে দ্বৈতভ্রম, শুক্তিকাতে রজতভ্রম রজ্জুতে সর্পভ্রম, দৃষ্টিদোষে দিক্‌ভ্রম ইত্যাদি এবং শোক ভ্রমেরই অন্তর্গত। মায়া নিরবয়ব ও আশ্রয়ী। শক্তির কার্য্য সঙ্কোচ ও বিস্তার; শক্তি নিরবয়ব ও আশ্রয়ী।

প্রকৃতির কার্য্য আশ্রয় প্রদান। ইহা সাবয়ব ও আশ্রয়। কাহার আশ্রয়? শক্তির ও মায়ার আশ্রয়। প্রকৃতি আশ্রয়, মায়া ও শক্তি আশ্রয়িণী। শক্তি ও মায়াকে আশ্রয় প্রদানই প্রকৃতির কার্য্য। শক্তি যন্ত্র ছাড়া কার্য্যে অক্ষম, সুতরাং প্রকৃতিই তাহার আশ্রয়-যন্ত্র। নিরবয়বা অনুমানসাধ্যা শক্তি, সাবয়বা প্রত্যক্ষগম্যা প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে বলিয়াই আমরা শক্তির অনুমান করিতে পারক হইয়াছি।

নিরবয়বা মায়া সাবয়বা প্রকৃতিকে আশ্রয় না করিলে, কি বা কিঁ দিয়া কাহার ভ্রম জন্মাইবে? সুতরাং প্রকৃতি মায়ার আশ্রয় ও যন্ত্র। মায়ার সহিত শক্তির কোনও সম্বন্ধ নাই, আছে প্রকৃতির সহিত। সেইজন্য তিন ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া

প্রকৃতি

অনুমিত হয়। তিনের তিন ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য, তিনই পৃথক্ পৃথক্ অর্থাৎ এক। মায়ার আশ্রয় প্রকৃতি, শক্তিরও আশ্রয় প্রকৃতি, সুতরাং বিশ্বেরও আশ্রয় প্রকৃতি, প্রকৃতিই বিশ্ব।

সৃষ্টিকার্য্যে যিনি প্রধানা ও প্রথমা, তিনিই প্রকৃতি। পুরুষের অধিষ্ঠানে প্রকৃতিই জগৎ সৃষ্টি করেন, জগৎ সৃষ্টি করিতে প্রকৃতিই সমর্থ, পুরুষ সাক্ষিস্বরূপ অধিষ্ঠান থাকিলেই হইল। বিশেষতঃ চিৎ বা পুরুষ নির্লিপ্ত বিধায় কোনও কার্য্যে

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই অষ্ট প্রকৃতি। প্রকৃতি পরিণামশীলা। এক ভাবে না থাকার নাম পরিণাম। প্রকৃতির চারি অবস্থা—ব্যক্ত, অব্যক্ত, বিশেষ ও অবিশেষ। (১) প্রকৃতির যখন কোনপ্রকার বিকার বা প্রভেদ ছিল না, ঠিক সাম্যাবস্থায় ছিল, যাহাকে এই দৃশ্যমান বিশ্বের সর্ব্বাদিম অবস্থা বা বীজস্বরূপ বা শক্তিসমষ্টিস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করা হয়, সেই অবিকৃত ও দুর্জ্ঞেয় শক্তিরূপ মূল অবস্থাটিই তাহার অব্যক্তাবস্থা। তৎকালে কোনপ্রকার জ্ঞানোপ-যোগী চিহ্ন ছিল না বলিয়াই তাহার নাম অব্যক্তাবস্থা। (২) যাহা অব্যক্ত, মূল প্রকৃতির প্রথম বিকার, যাহাকে বলা হয় মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব, তাহাই তাহার ব্যক্ত অবস্থা। (৩) অবি-শেষ অবস্থা—যাহা বিশেষ অবস্থার মূল। (৪) বিশেষ অবস্থা —পৃথিব্যাদি স্থূলভূত ও ইন্দ্রিয়গণ।

চতুরবস্থাপন্না প্রকৃতি সেই চিন্ময় পুরুষের ভোগসাধনরূপে

পরিণত হইতেছে অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস গন্ধ, সুখ, দুঃখ, হর্ষ, বিষাদ, মোহ, আহ্লাদ, পরিতাপাদি বহু অঙ্গকারে পরিণত হইতেছে। রূপ ষোড়শপ্রকার—শুক্ল, কৃষ্ণ, রক্ত, নীল, পীত, সবুজ, অরুণ, হ্রস্ব, দীর্ঘ, বর্ত্তুল, চতুষ্কোণ, কঠিন, চিক্কণ, মধুর, স্নিগ্ধ ও দারুণ। মনেতে তেজের গুণ—শোক, রাগ, হাস্য, নিদ্রা, ক্ষুধা, ভ্রান্তি ও আলস্য। শব্দ সাতপ্রকার—সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি ।

প্রকৃতি শক্তির আশ্রয়, আশ্রয়ভেদে শক্তিভেদ অনুমিত হয়। একই শক্তি ক্ষিতিরূপ প্রকৃতিশক্তিকে আশ্রয় করাতে গন্ধরূপে অনুভব ও ব্যবহার করি, গন্ধরূপে শক্তি আমাদের ভোগ্যা, এই প্রকারে জলে রস, তেজে প্রভা, বায়ুতে স্পর্শ, ব্যোমে শব্দ, মনে সঙ্কল্প, বুদ্ধিতে অবধারণ, অহংকারে অভিমান শক্তি আশ্রয়ী হইয়া রহিয়াছে। আব্রহ্ম কীট সমস্ত জগৎ ভূতেরই বিকাশ, সুতরাং সমস্তই প্রকৃতিময়।

এই জগতে প্রত্যেক পুরুষেরই প্রকৃতি আছে, প্রত্যেক প্রকৃতির পুরুষ আছে। পুরুষ প্রকৃতির অংশ কি প্রকৃতি পুরুষের অংশ, তাহা নির্ণয় হয় না। এক দিন বৃন্দাবনে রাধা-কৃষ্ণকে ব্রহ্মা বলিলেন,—আপনি শ্রীকৃষ্ণ ইনি রাধা বা আপনি রাধা ইনি শ্রীকৃষ্ণ, ইহা কেহ নিরূপণ করিতে পারে না, বেদেও ইহার মীমাংসা নাই। হে রাধে! আপনি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণযুক্ত হইয়া জগতের মাতৃস্বরূপা হইয়াছেন এবং এই শ্রীকৃষ্ণও আপনার প্রাণবিশিষ্ট হইয়া ঈশ্বর হইয়াছেন।

প্রকৃতি

আশ্চর্য্যের বিষয়, কোন্ শিল্পী এই রূপ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বোধগম্য হয় না। এই শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ নিত্য, সেইরূপ আপনিও নিত্যা। আপনি ইহার অংশ অথবা ইনিই আপনার অংশ, ইহা কেহই নিরূপণ করিতে সমর্থ হয় না।

উত্তম, মধ্যম, অধম, সকলপ্রকার নারীগণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন ; তাহার মধ্যে যাহারা প্রকৃতির সত্ত্বাংশ হইতে উৎপন্না, তাহারা উত্তমা, সুশীলা, ও পতিব্রতে নিয়ত আসক্তা হয়। যাহারা প্রকৃতির রজোভাগ হইতে উৎপন্না হয়, তাহারাই মধ্যমা এবং ভোগ্যা বলিয়া কথিতা হয় ; ইহারা সর্ব্বদা সুখসম্ভোগ-শালিনী এবং স্বকার্য্যসাধনতৎপরা। যাহারা প্রকৃতির তমঃ অংশ হইতে উৎপন্না, তাহারা অধমা ; তাহারা অজ্ঞাতকুল-সম্ভবা, দুর্ম্মুখা, কলহপ্রিয়া, ধূর্ত্তা, কুলটা, ও সর্ব্বদা স্বাধীন ভাবে থাকিতে ইচ্ছা করে। পৃথিবীতে কুলটাগণ ও স্বর্গে অপ্সরা-গণ প্রকৃতির তমঃ অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই জগতে স্ত্রীগণ প্রকৃতির কলাংশের অংশ হইতে উৎপন্ন এবং পুরুষগণ পুরুষাংশ হইতে উৎপন্ন ; অতএব স্ত্রীগণের অপমানে প্রকৃতিই অপমানিতা হন, স্ত্রীগণের সম্মানে প্রকৃতিই সম্মানিতা ও সন্তুষ্টা হন।

শক্তি

এই বিশ্বসংসার কর্ম্মক্ষেত্র। ইহার যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই দেখিতে পাওয়া যায় কার্য্য। উদ্ধে অসীম আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে কার্য্য। কি প্রখর-করশালী সূর্য্যাদি গ্রহগণ, কি সুধাকর শশধর, কি নক্ষত্রনিচয়, কি মহাসমুদ্র, কি মহাবিশ্ব, সকলেই নিজ নিজ নিয়মিত পথে অনন্তলক্ষ্যে কেন্দ্রাভিমুখাকর্ষণে কার্য্যক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিতেছে। অধোদিকে দৃষ্টিপাত কর, নিখিল ভূমণ্ডল, জলনিধি, শৈল, কানন, গ্রাম, নগর, প্রান্তর, জীবনিকরের সহিত নিরন্তর অবিচ্ছেদে স্বীয় প্রকৃতিকে কেন্দ্র করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। চরাচরে কাহারও লক্ষচ্যুতি নাই, কর্ম্মে বিরাম নাই। কি জড় জগৎ, কি চেতন জীবনিচয় সকলেই স্ব স্ব অনন্তর পথে কার্য্যক্ষেত্রে নিরন্তর বিচরণ করিতেছে। অপরিমেয় বায়ুরাশিও কার্য্য করিতেছে; নদ, নদীও কার্য্য করিতেছে, গিরি, মরু, স্থাবরসংঘও কার্য্য করিতেছে; তরু, লতা, উদ্ভিদসমূহও কার্য্য করিতেছে; কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রাণিগণও কার্য্য করিতেছে; উৎকৃষ্ট জীব মানবমণ্ডলীও কার্য্য করিতেছে। সকলেই স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কার্য্য করিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য, ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য হেতু ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বা গুণবিভাগ হইয়াছে। সকলের

কার্য্য একরকম নহে, সেইজন্য সকলে একশ্রেণীভুক্ত নহে। কেরাণীর কার্য্য ও কুম্ভকারের কার্য্য এক নহে, কাজেই শ্রেণীও এক নহে।

জড় জগতের কার্য্য জড়রূপে প্রতিভাত হয়, চেতন জগতের কার্য্য চেতনাত্মা রূপে প্রকাশিত হয়। জড়ের কার্য্যে কেবল সত্য ও উন্নতির ভাব থাকিলেও তাহাতে জ্ঞান বা সুখের ছায়া দৃষ্টি-গোচর হয় না; কিন্তু চেতন জগতের কার্য্যে প্রতি পদেই সত্য ও উন্নতির সহিত জ্ঞান ও সুখের পূর্ণ আভাস প্রতীত হইয়া থাকে। জীবের নিখিল কার্য্যই উন্নতি লক্ষ্যে সুখোদ্দেশে সুখময়ী প্রকৃতিকে কেন্দ্র করিয়া সমাহিত হইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কেহ নিজের সম্পূর্ণ উন্নতি ও সুখ দেখিতে পায় না। সকলেই আপন আপন অভাবের স্মৃতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া অসুখী। বহির্জ্জগতে অনবরত কার্য্য চলিতেছে, আবার অন্তর্জ্জগতেও নীরবে কাম ক্রোধ প্রভৃতি কার্য্য করিতেছে। অবিরাম কর্ম্মচক্র ঘুরিতেছে, বিশ্ব কর্ম্মরহিত এক মুহূর্ত্তও নহে। সমস্ত কর্ম্মের মূলই শক্তি। এই বিশ্ব শক্তির কার্য্য, কেবল শক্তির খেলা। কর্ম্মময় জগৎ, সুতরাং শক্তিময় জগৎ। শক্তিও ক্রিয়াতে মিশিয়া রহিয়াছে। শক্তি ক্রিয়া ছাড়িয়া নাই; ক্রিয়া শক্তি ছাড়িয়া নাই। শক্তি ক্রিয়া ছাড়িলে তাহার অস্তিত্ব অনুমান করা যায় না, এবং শক্তি ছাড়া ক্রিয়াও হইতে পারে না। শক্তিবশে কি জড় কি চেতন নিরন্তর কার্য্য করিতেছে, স্থাবর জঙ্গম নিরন্তর ব্যাপৃতভাবে কার্য্যে রহিয়াছে।

তত্ত্ববোধ

আমি ভাবিতেছি বা চিন্তা করিতেছি, ভাবনা চিন্তা জ্ঞান-ক্রিয়া, ভাবিতেছি বা চিন্তা করিতেছি বলিলেই বুঝা যাইতেছে জ্ঞান কার্য্য করিতেছে। কার্য্যমাত্রই শক্তিসাধ্য। জ্ঞান করিতেছে বলিলেই বুঝা যাইতেছে যে শক্তি কার্য্য করিতেছে, সুতরাং আত্মা যদ্দারা চিন্তারূপ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছেন অথবা জ্ঞান যদ্দারা ভাবনারূপ কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতেছে, তাহাই শক্তি। ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তনের যাহা কারণ, তাহাই শক্তি।

সময়ে সময়ে দেখা যায় অগ্নির দাহিকা শক্তি, বিষের বিষ-শক্তি বিষ মহৌষধির দ্বারা প্রতিবদ্ধ হয়। অগ্নির সহিত আমাদের দেহের সংযোগ হইলেই আমাদের দেহকে দগ্ধ করে; যাহা আমাদের দেহকে দগ্ধ করে, তাহাই অগ্নির দাহিকা শক্তি। কিন্তু শক্তিমান্ পুরুষ অগ্নির দাহিকা শক্তিকে প্রতিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। যতখানি বিষ খাইয়া তুমি আমি মরি, এমন লোক অনেক আছেন, তাহা হইতে অধিক বিষ খাইলেও মরেন না। প্রহ্লাদকে অগ্নিতে ফেলিয়াছিল, বিষ খাওইয়াছিল, তাহাতে সে মরে নাই। বশিষ্ঠদেব অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, অগ্নি তাঁহাকে দগ্ধ করিতে পারে নাই। সীতার অগ্নিপরীক্ষাও সেইরূপ; অগ্নি তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে নাই। যদি স্পর্শ করিতে পারিত, তাহা হইলে নিশ্চয় দগ্ধ করিতে পারিত।

শক্তি ত্রিগুণা অর্থাৎ সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণা। গুণ অর্থাৎ রজ্জু বা দড়ি, যদ্দারা বন্ধন করা যায়। আমরা যেমন রজ্জু দ্বারা

শক্তি

কোনও পদার্থ বন্ধন করি, সেইরূপ শক্তি যদ্দারা সংসার বন্ধন করিয়াছে, তাহারই নাম গুণ। এক গাছা রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিলে আল্‌গা হয়, কিন্তু তিন গাছা রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিলে খুব শক্ত হয়। শক্তি ত্রিগুণে অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণে জগৎকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন ; সেই শক্তি ত্রিগুণা। এক গুণের বন্ধনই খোলা যায় না, ত্রিগুণের বন্ধন খোলে কাহার সাধ্য। বিশ্বে সমস্তই ত্রিগুণে বদ্ধ। ভূলোকে, স্বর্গে বা দেবগণের মধ্যে এমন জীব নাই, যে প্রকৃতি হইতে জাত এই গুণত্রয় হইতে মুক্ত। পরমাত্মা ব্যতীত, অনাত্মা কোনও বস্তু নাই যাহা ত্রিগুণময় মায়াপাশ-বন্ধন এড়াইতে পারে। তৃণ হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ত্রিগুণময়ী মায়ারূপ-রজ্জুতে গ্রথিত রহিয়াছে।

যাহার যাহা সত্তা, তাহাই তাহার শক্তি। যে থাকিলে যাহা থাকে, যে না থাকিলে যাহা থাকে না, তাহাই তাহার শক্তি, বা যে যাহার কারণ, তাহাই তাহার শক্তি ; সুতরাং কারণই শক্তি। এখন দেখিতে হইবে কে কাহার সত্তা, কে থাকিলে কে থাকে, কে না থাকিলে কে থাকে না, কে কাহার কারণ। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ; এই অষ্ট প্রকৃতির অষ্ট সত্তা ঠিক হইলেই সব ঠিক হইতে পারে। গন্ধই ভূমির সত্তা, সুতরাং গন্ধই উহার কারণ বা শক্তি। ভূমি হইতে গন্ধ উঠাইয়া লইলে উহার অস্তিত্ব থাকে না ; এইপ্রকার জলের রস, তেজের প্রভা, বায়ুর স্পর্শ, আকাশের শব্দ, মনের সঙ্কল্প, বুদ্ধির অবধারণ, অহংকারের অভিমান শক্তি বিবেচনা করিতে হইবে।

তত্ত্ববোধ

সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণা প্রকৃতি হইতে এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বহু প্রজা সৃষ্ট হইয়াছে। প্রকৃতি এক মুহূর্ত্তও বিনা পরিবর্ত্তনে থাকিতে পারে না ; সত্ত্ব যখন প্রকৃতির অঙ্গ, তখন উহাও বিনা পরিবর্ত্তনে থাকিতে পারে না। রাগ বা বিরাগের যোগই সৃষ্টি বা পরিণামের কারণ ; রাগ ও বিরাগ যথাক্রমে রজঃ ও তমঃ গুণের কার্য্য, অতএব বুঝা যাইতেছে, সত্ত্ব শক্তি, রজঃ তমঃ শক্তির দ্বারা নানা আকারে অভিব্যক্ত হয়, ইহারই নাম সৃষ্টি বা পরিণাম। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম-সমষ্টিই বিশ্ব। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, ইহারা শক্তি। শব্দশক্তি আকাশ, স্পর্শশক্তি বায়ু, প্রভাশক্তি অনল বা তেজ, রসশক্তি জল, গন্ধশক্তি পৃথিবী। এক আদি-অন্ত-বিহীন শক্তি এই বিশ্বের আদি কারণ, সমস্ত জগৎ তাহা হইতে উদ্ভূত এবং তাহাতেই অবস্থিত। ঐ শক্তি দ্বারা জগৎ রক্ষিত, পালিত, বর্দ্ধিত ও ধ্বংসিত হইতেছে।

বিশ্ব হইতে যদি শক্তিকে বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে কিছুই থাকে না। ঐ শক্তি কখনও দ্রষ্টা, কখনও দৃশ্য ; কখনও ভোক্তা, কখনও ভোগ্য, নানাপ্রকার বিবিধরূপে ক্রিয়া করিতেছে। ঐ শক্তি কখনও ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইতেছে, কখনও সৌম্য মূর্ত্তিতে দেখা দিতেছে—কখনও সংহারমূর্ত্তিতে, কখনও শ্মশানরূপে, কখনও কালীরূপে, কখনও শিবরূপে, কখনও বিষ্ণুরূপে ; আবার ঐ শক্তি বৈশাখমাসে ঝঞ্জারূপে জগৎকে আকুলিত করিতেছে, এবং ফাল্গুন মাসে বসন্তরূপে ফল ফুলের মনোহর শোভায় আশ্বস্ত করিতেছে।

শক্তি

একই শক্তি কখনও সমুদ্ররূপে, কখনও অগ্নিরূপে, কখনও নির্জন অরণ্যরূপে, কখনও নগররূপে, দৃশ্য হইতেছে। যাহা কিছু দৃশ্য হইতেছে, সমস্তই ত্রিগুণেরই নানা সাজ। প্রকৃতি-নর্ত্তন অনাদি কাল হইতে অনন্ত কাল এই ভাবেই চলিয়াছে ও চলিবে। প্রকৃতি-নর্ত্তকী এই রঙ্গভূমে এইরূপে নৃত্য করি-করিতেছে; দর্শকেরও অভাব নাই, নৃত্যেরও বিরাম নাই।

শক্তি আধার ব্যতীত কার্য্যক্ষম হয় না। শক্তি কোনও যন্ত্র বা আধার ব্যতীত কার্য্য প্রকাশ করিতে পারে না। এক আদ্যা শক্তি মূলপ্রকৃতি দর্শন-ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া, একই শক্তি, দশ-রকম কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। কেবলমাত্র স্থানভেদে শক্তিভেদ কল্পিত হইয়া থাকে; যেমন একই গন্ধশক্তি গোলাপ ফুল যাহাকে আকর্ষণ করিল তাহা এক-প্রকার, চামেলী যাহাকে আকর্ষণ করিল তাহা অন্যপ্রকার, আবার বেলফুল যাহাকে আকর্ষণ করিল তাহা আর এক-প্রকার, ইত্যাদি।

একই জলীয় রস, নারিকেল যাহাকে আকর্ষণ করিল তাহা একপ্রকার, তালশাঁস যাহাকে আকর্ষণ করিল তাহা অন্যপ্রকার, খেজুর-রস যাহাকে আকর্ষণ করিল তাহা ভিন্ন-প্রকার, ইক্ষু যাহাকে আকর্ষণ করিল তাহা আর এক-প্রকার। এই প্রকারে একই শক্তি প্রকৃতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শক্তি অনুমান-সাধ্য। কর্ম্ম দৃশ্য শক্তি অদৃশ্য। একটি বীজ আছে, তাহার অঙ্কুর-জনন-

সামর্থ্য আছে। কিন্তু ঐ বীজ যদি ভূর্জ্জিত হয় তাহা হইলে তাহা হইতে অঙ্কুর-উৎপাদন-শক্তি তিরোহিত হয়। যে সামর্থ্য থাকিলে বীজ অঙ্কুর-জননে সমর্থ হয়, সেই সামর্থ্যই বীজের শক্তি। যাহা থাকিলে বীজাদি কারণ হইতে অঙ্কুরাদি কার্য্য উৎপন্ন হয়, না থাকিলে হয় না, সেইরূপ একটা কিছু অদৃশ্য পদার্থ আছে, তাহারই নাম শক্তি। বীজের মধ্যে অঙ্কুর-জনন-শক্তি আছে তাহা তুমি দেখিতে পাও না, অঙ্কুর-জননরূপ কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া গেলে পর তুমি সেই শক্তির অনুমান করিতে পার। অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে; অগ্নি দৃশ্য, দাহিকা শক্তি অদৃশ্য। অগ্নি তৃণ দগ্ধ করিতেছে; যে শক্তি দগ্ধ করিতেছে, সে শক্তিকে কেহ দেখিতে পাইতেছে না, কিন্তু দাহরূপ কার্য্য দেখা যাইতেছে, সুতরাং বলিতে হইবে কার্য্য দৃশ্য, শক্তি অদৃশ্য; কার্য্য ব্যক্ত, শক্তি অব্যক্ত।

শক্তিই কর্ম্ম, কর্ম্মই শক্তি। শক্তির বিকাশই কর্ম্ম, কর্ম্মের কারণই শক্তি। কর্ম্মের দ্বারা শক্তির অনুমান হয়, কর্ম্মের মূল শক্তি। শারীরিক, বাচনিক ও মানসিক, যে কোন কার্য্য হউক, বিনা শক্তিতে কোনও কর্ম্মই নিষ্পন্ন হয় না। শক্তির স্বরূপ দর্শন করিতে হইলে, কর্ম্মের স্বরূপ জানিতে হইবে। গমনক্রিয়া দ্বারা গ্রাম বা পর্ব্বত পাওয়া যায়, কাষ্ঠ দগ্ধ হইয়া ভস্ম হয়, স্নানের দ্বারা দেহ শোধিত হয়, ইত্যাদি।

জগতে কার্য্য অসংখ্য। অসংখ্য হইলেও তাহার জাতিবাচক সংখ্যা আছে। মনুষ্যের ইন্দ্রিয় দশটি, দশটি ইন্দ্রি-

দ্রিয়র জন্য দশটি কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে। চক্ষুর দর্শন, কর্ণের শ্রবণ, নাসিকার ঘ্রাণ, জিহ্বার আস্বাদ, ত্বকের স্পর্শ, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পঞ্চ কার্য্য ; বাক্যের কথন, পাণির গ্রহণ, পাদের গমন, পায়ুর বিসর্গ, উপস্থের আনন্দাস্বাদ, এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পঞ্চ কার্য্য। প্রাণের নিমেষ, উন্মেষ, শ্বাসাদি ; অন্তঃকরণের নিদ্রা কল্পনাদি। জগতে ইহাদের অতিরিক্ত কোনও কার্য্য নাই। যত কিছু কার্য্য, ইহাদের একটা না একটার অন্তর্গত থাকিবেই। বিশ্বের অসংখ্য কার্য্য হইলেও ঐ সকল কার্য্য দ্বাদশ-শ্রেণীভুক্ত। ঐ দ্বাদশ শ্রেণী আবার দুই ভাগে বিভক্ত— সঙ্কোচ ও বিস্তার।

গমন, ভোজন, দর্শন ইত্যাদি যত কিছু কার্য্য আছে, সঙ্কোচ ও বিস্তার ব্যতীত হইতে পারে না। হস্ত দ্বারা কিছু ধরিতে গেলেই তাহাকে আকুঞ্চিত ও প্রসারিত করিতে হইবে। গমন করিতে হইলে, দুই পদ অনবরত আকুঞ্চিত ও প্রসারিত করিতে হইবে। হাতের অঙ্গুলি সঙ্কুচিত না করিলে ধারণকার্য্য নির্ব্বাহ হইবে না। এই প্রকার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের। বুদ্ধি যে চিন্তা করিতেছে, মন যে কল্পনা করিতেছে, সমস্তই সঙ্কোচ ও বিস্তার-শক্তির বলে সাধিত হইতেছে। বুদ্ধি অনবরত চিন্তা করিতেছে, মন অনবরত কল্পনা করিতেছে ; বুদ্ধি এক চিন্তাতে স্থির নাই, মনও এক কল্পনাতে স্থির নাই। এক চিন্তার পর এক চিন্তা, এক কল্পনার পর আর এক কল্পনা ; একটাকে ছাড়িতেছে, আর একটাকে ধরিতেছে ; সুতরাং মন ও বুদ্ধির

মধ্যে সঙ্কোচ ও বিস্তার কার্য্য অনবরত চলিতেছে; এক মুহূর্ত্তও বিরাম বিশ্রাম নাই। এই মহৎ কর্ম্মচক্র কোন্ শক্তিবলে ঘূর্ণিত হইতেছে? প্রাণ-শক্তিবলে ঘূর্ণিত হইতেছে। প্রাণেতে আবার সঙ্কোচ ও বিস্তার শক্তি নিহিত রহিয়াছে। প্রাণ জীবের শ্বাস-প্রশ্বাস; সেই শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য সঙ্কোচ ও বিস্তার। প্রাণের চেষ্টাতেই ইন্দ্রিয় সকল চেষ্টাশীল; কি জ্ঞানেন্দ্রিয়, কি কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণই সকল ইন্দ্রিয়কে কার্য্যশীল করিয়া রাখিয়াছে। সেই প্রাণ আবার প্রকৃতির রাজসিক ধারা। সমস্ত বিশ্ব-কার্য্য আকুঞ্চন ও প্রসারণ শক্তি-বলেই সাধিত হইতেছে। এক কথায় সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, সমস্ত কার্য্যই আকুঞ্চন ও প্রসারণ-শক্তিবলেই নির্ব্বাহ হইতেছে। ছোট বড়, ভাল মন্দ, শক্ত বা নরম, যতপ্রকার কার্য্য-কৌশল বিজ্ঞানবলে প্রস্তুত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, সমস্তই শক্তিবলে সমাধা হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে; আর সেই শক্তির মূল প্রকৃতি এবং জগন্মাতা আদ্যা শক্তি। পৃথিবীর আদি হইতে যে শক্তির দ্বারা সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, যাহা ব্যবহার না করিলে কোনও কার্য্য সমাধা হয় না, সেই শক্তিই আদ্যা শক্তি।

মায়া

মায়া কাহাকে বলে? যাহাতে জগৎ মোহিত হইয়া রহিয়াছে; তাহা কিপ্রকার পদার্থ, সকলেরই বিশেষরূপে অবগত হওয়া উচিত। পরব্রহ্মের প্রতিবিম্বযুক্ত সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক এবং সৎ বা অসৎ নির্ণয়ের অযোগ্য পদার্থ-বিশেষের নাম মায়া, বা অজ্ঞান। জ্ঞানের উদয়ে উহা অসৎ, জ্ঞানের অনুদয়ে উহা সৎ। এইজন্য ইহা এক ভাবে সৎ, আর এক ভাবে অসৎ, সেইজন্য ইহা সদসৎ নামের অযোগ্য।

ব্রহ্মের যে জগদ্‌বিকাশিনী শক্তি, তাহাই মায়া। মায়া বাস্তবিক স্বয়ং স্বতন্ত্র কোনও পদার্থ নহে, উহা ব্রহ্মেরই ভাব বা শক্তিবিশেষ; তোমার ভাব বা শক্তি যেমন তোমা হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, মায়া সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। যেমন তোমার ভাব তুমি স্বয়ং নহ, মায়াও সেইরূপ স্বয়ং ব্রহ্ম নহে। অগ্নির দাহিকা শক্তি অগ্নি হইতে পৃথক্ কোনও পদার্থ নহে, অথবা স্বয়ং অগ্নিও নহে, সেইরূপ মায়া-শক্তি ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ কোনও পদার্থ নহে, অথবা স্বয়ং ব্রহ্মও নহে। তুমি চেতন জীব, তোমার শক্তি বা ভাব হইতে যেমন শরীরস্থ অচেতন অনেক পদার্থের বিকাশ হয়, সেইরূপ মায়া হইতে অচেতন জগতের বিকাশ হয়।

তত্ত্ববোধ

যে অজ্ঞাত কারণ সচ্চিদানন্দ-জ্ঞানরূপ চিৎকে দুঃখীর ন্যায়, সর্ব্বজ্ঞকে অসর্ব্বজ্ঞের ন্যায়, অশোকীকে শোকাভিভূতের ন্যায় প্রতীয়মান করায়, তাহারই নাম মায়া। মনে কর, তোমার পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র বা কন্যার কেহ একজন মারা গেল, তুমি কাঁদিয়া আকুল, ইহা মায়ার খেলা। তুমি নিজে অশোকী সচ্চিদানন্দ নিত্য বিভু-পদার্থ, তুমি যাহার জন্য শোক করিতেছ, সেও নিজে অশোকী সচ্চিদানন্দ নিত্য বিভু-পদাথ, তাহার যাইবার স্থান নাই, কারণ বিভু-পদার্থের যাতায়াত অসিদ্ধ। সেই নিত্য সদানন্দ বিভু-পদার্থ কতকগুলি জড়ীয় পরমাণু সংযোগে একটি শরীর ধারণ করিয়া পিতা, মাতা, কন্যা, পুত্র ইত্যাদি ভ্রম জন্মাইয়াছিল। সংশ্লিষ্ট পরমাণু বিশ্লিষ্ট হইয়াছে, ইহাতে তোমার কাঁদিয়া আকুল হইবার কোনও কারণ নাই। কেবল মায়ার কর্ম। সংযোগ হইলেই বিয়োগ হয়, এবং বিয়োগ হইলেই সংযোগ হয়, ইহা প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী নিয়ম। নিত্য বিভু স্থির আত্মা তোমার সম্মুখেই বিরাজমান, অথচ সে নাই বলিয়া কাঁদিয়া ব্যাকুল; সেও চিরকাল থাকিবে, তুমিও চির-কাল থাকিবে; কেবল ভ্রম-দৃষ্টিতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। যে পরমাণু-সংযোগে ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল, তাহাও সেই চিৎবিকাশ, সেই চিৎবিকাশ পরমাণু-সংশ্লিষ্ট ভাব দৃষ্টে পুত্র জন্মিয়াছে বলিয়া হাসিয়াছিলে, তাহারই বিশ্লিষ্টভাব দর্শনে পুত্র মরিয়াছে বলিয়া কাঁদিতেছ, ইহাই মায়া।

স্ত্রী-কায়া দেখিয়া লোকে বড়ই মুগ্ধ হয়; ইহার জন্য কত

লোক কত কাণ্ড কারখানা করিতেছে, তাহার বর্ণনা করা যায় না। বাস্তবিক স্ত্রী-কায়া সুন্দর নহে, তাহাকে আমরা সুন্দর বলিয়া মনে করি, তাহাকে দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই, ইহাই মায়া। স্ত্রীলোকের বেশ-ভূষা অঙ্গ হইতে বিচ্যুত করিলে অমনি অতি কুৎসিত দেখাইবে; সেই কুৎসিতকে সুশ্রীর ন্যায় দেখা যাইতেছে যাহার দ্বারা, তাহাই মায়া। অনাদি কাল এক ভোগে মত্ততাই মায়া। চতুরবস্থাপন্না প্রকৃতি, স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল, দেব, মনুষ্য, কীট, পতঙ্গ অনাদিকাল হইতে অনন্ত-কাল পর্য্যন্ত একই ভাবে স্থায়ী; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, ভোগ ভোগাইতেছে; এই পরিবর্ত্তনশীল ভোগের জন্য কত কি করিতেছে, তাহা পাইবার জন্য আকুল হইতেছে, তাহারই বিয়োগে ব্যাকুল হইতেছে; অথচ নিত্য অনন্ত আনন্দের আধার সচ্চিদানন্দ পদার্থ নিকটেই রহিয়াছে, তাহা পাইবার গন্ধ-গন্ধও করে না, তাহাই মায়া। এই মায়ার ইয়ত্তা করিবার সাধ্য নাই, মায়া নিজেই তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে না।

বেদান্তে যাহা মায়া, সাংখ্যে তাহা অব্যক্ত প্রকৃতি। মায়া, শক্তি, প্রকৃতি তিনই এক। বেদান্ত যাহাকে মায়া বলে— অর্থাৎ এই বাহ্য জগৎ মনের কল্পনা মাত্র, এই আছে, এই নাই, তাহাই মায়া। সাংখ্য বলেন—উহা প্রকৃতি, মনের কল্পনা নয়, উহা যথার্থ; কখনও ব্যক্ত, কখনও অব্যক্ত এই মাত্র প্রভেদ। বেদান্ত মায়াকে আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তিমতী বলিয়া

উল্লেখ করেন; সাংখ্য বলেন,—উহা প্রকৃতির রজঃ ও তমঃ গুণ। বেদান্ত বলেন—সংসার অলীক, সাংখ্য বলেন—সংসার ক্ষণিক। দুই মহারথীর দুই মত; আমরা সামান্য পদাতিক, কোন্ পথে যাই, তাহার ঠিক নাই। বেদের আশ্রয় লইলেই সাংখ্য চক্ষু রক্তবর্ণ করেন, আবার সাংখ্যের মত অবলম্বন করিলে বেদ আরক্তলোচনে মুখ গম্ভীর করেন। আমাদের দশা এক্ষণে "বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা।"

মায়ার দুইটি উপাধি—বিদ্যা ও অবিদ্যা। শুদ্ধ সত্ত্বগুণের বিকাশ বিদ্যা নামে কথিত হয়, আর রজঃ ও তমঃ গুণের বিকাশ অবিদ্যা বা অজ্ঞান নামে অভিহিত হয়। ঐ বিদ্যাতে চিৎ-ছায়া অহংতত্ত্বাত্মক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং অবিদ্যাতে চিৎছায়া অহংতত্ত্বাত্মক জীব। ঐ বিদ্যা ও অবিদ্যার তারতম্যে নানান্ জীবের নানান্ বিকাশ বা উপাধি বা কার্য্য হয়। ঈশ্বর মায়াকে নিজ আয়ত্তে রাখিয়া, জগতের সৃষ্টি করেন বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বনিয়ন্তা ও সর্ব্বান্তর্যামী ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত হন। জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই শক্তির অধীশ্বর, আশ্রয় ও প্রবর্ত্তক হইলেও খণ্ডশক্তির আশ্রয়ীভূত জীবাত্মা বিশ্বব্যাপিনী শক্তির অধিনায়ক পরমাত্মার সম্পূর্ণ অধীন। জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ মাত্র। জীবের স্বকীয় শক্তির উপর আধিপত্য থাকিলেও বিশ্বশক্তির উপর আধিপত্যের অভাব বশতঃ তদ্দারা জগৎব্যাপারাদি বিভু-কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। অবিদ্যা বা অজ্ঞানের দুই উপাধি—এক

আবরণশক্তি, আর এক বিক্ষেপশক্তি। অজ্ঞান যে শক্তি দ্বারা স্বয়ং পরিচ্ছিন্ন হইয়াও অপরিচ্ছিন্ন আত্মাকে বুদ্ধিবৃত্তির আচ্ছাদন দ্বারা আচ্ছাদিতের ন্যায় প্রকাশ করেন, তাহার নাম আবরণশক্তি; আর যে শক্তিরূপ উপাদানকারণ দ্বারা লিঙ্গাদি ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত জগৎ সৃষ্টি করেন, তাহারই নাম বিক্ষেপশক্তি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণময়ী মায়া স্বরূপতঃ জড়স্বরূপা, দুঃখরূপিণী ও দুরন্তা। এই মায়ার দুই শক্তি থাকাতে, বেদ বলেন, যে শক্তি সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে দূরে নিক্ষেপ করে, তাহার নাম বিক্ষেপশক্তি, আর যে শক্তি সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে, তাহার নাম আবরণ শক্তি। এই অজ্ঞানরূপিণী মায়া আবরণশক্তি দ্বারা নির্ব্বিকার নিরঞ্জন ব্রহ্মকে আবৃত রাখিয়া, বিক্ষেপশক্তি-প্রভাবে তাঁহাকেই জগদাকারে দেখাইয়া বা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

একই নট রঙ্গভূমে যেমন নানা সাজে সজ্জিত হয়, অজ্ঞান ব্যক্তিরা যেমন সেই সজ্জিত নটকে চিনিতে পারে না, কারণ পট-আচ্ছাদিত থাকা হেতু; সেইরূপ আবরণ-বিক্ষেপকারী মায়ারূপ যবনিকায় আচ্ছাদিত থাকাতে কেহ আমাকে চিনিতে পারে না। আগুন যেমন শরা চাপা দিলে লোক-লোচনের অন্তরালে থাকে, আমিও সেইরূপ যোগমায়া দ্বারা সমাবৃত হেতু সকলের নিকট প্রকাশ পাই না। ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, অজ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মপদার্থ আবৃত থাকাতে এই বিশ্বভ্রম জন্মিয়াছে; সকলেই মায়াতে অন্ধ হইয়াছে; মোহে ভ্রান্ত কল্পনা

করিতেছে, অভাব পদার্থ দ্বারা আবরণ কল্পনা করে। জ্ঞানের অভাব অজ্ঞান, অজ্ঞানের অভাব জ্ঞান; যেমন আলোকের অভাব অন্ধকার, অন্ধকারের অভাব আলোক; প্রকৃতির তমঃ গুণই অজ্ঞান নামে অভিহিত হইয়াছে।

এই বিশ্ব চিন্ময়, জড় বলিয়া যে বোধ হয় তাহাই মায়া। এক ব্রহ্মই মায়া-সাজে সজ্জিত হইয়া, মায়িক অংশটুকুকে জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, ভোক্তা, ভোগ্য, দ্রষ্টা, দৃশ্য রূপে প্রতীত হইতেছেন। অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায়, মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি। মায়ার আসন ব্রহ্মবক্ষেই নির্দ্দিষ্ট আছে, রজোগুণী মায়া চিন্ময় ব্রহ্মকে ক্ষোভিত করিলেন; ক্ষোভিত করিয়া আব-রণাত্মক তমঃশক্তি দ্বারা প্রকাশাত্মক সত্ত্বগুণ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। মায়ার শক্তি অসীম; এককে দুই দেখায়, সৎকে অসৎ বোধ করায়। ব্রহ্ম মুক্ত, জীব বদ্ধ। মুক্ত ও অমুক্তে যোগাযোগ রহিয়াছে; জীব ও ব্রহ্ম এক সূত্রে গাঁথা রহিয়াছে, অথচ ভিন্নের ন্যায় দেখাইতেছে। জীব মুক্তই হউক আর বদ্ধই হউক, এক ব্রহ্ম সূত্রে গাঁথা। জীব বদ্ধাবস্থায়ও তাঁহার সহিত যুক্ত আছে, মুক্ত হইলেও তাঁহার সহিত যুক্ত থাকিবে। মনে কর, একটি নিস্তরঙ্গ, নিষ্কল্লোল, ধীর, স্থির, প্রশান্ত, কূল-কিনারা-বিহীন, অগাধ, পারাপার-রহিত পারাবার বিস্তৃত রহিয়াছে, তুমি দেখিতেছ তরঙ্গহীন সাগরের জল সমস্ত এক-ভাবাপন্ন, যেন সব সমান, কেহ কাহারও সহিত বিভিন্ন নাই, পরস্পর মিলিত, কেহ কাহাকে ছাড়িয়া নাই, পরস্পর যোগ

হইয়া এক হওয়াতে অসীম ও অনন্ত হইয়াছে। হঠাৎ সমুদ্রবক্ষে মৃদু বাতাস বহিল, সমুদ্রও ঈষৎ চঞ্চল হইল; বাতাস আর একটু বাড়িল, সমুদ্রও কিঞ্চিৎ ক্ষোভিত হইল; ক্রমে পবন-হিল্লোল প্রবল হইল, পূর্ব্বে যাহাকে একভাবাপন্ন দেখিয়াছিলে, তাহাকে এখন ভিন্নভাবাপন্ন দেখিতেছ; যাহা সমান ছিল, তাহা বিষমভাব ধারণ করিয়াছে; যাহা নিস্তরঙ্গ নিষ্কল্লোল ছিল, তাহা সতরঙ্গ সকল্লোল হইয়াছে, যাহা অভিন্ন ছিল, তাহা ভিন্নবৎ বোধ হইতেছে। এই পবন কোথায় ছিল? ইহা কি আগন্তুক? না সমুদ্রবক্ষেই ছিল, কাল বায়ুর রজঃগুণকে ক্ষোভিত করিয়া চালনানন্তর সমুদ্রকে ক্ষোভিত করিয়াছে, সেইজন্য তরঙ্গ উঠিয়াছে; ঐ তরঙ্গ কোন্ স্থানে উঠিল? সমুদ্রের সমতল ক্ষেত্রের উপরিভাগে উঠিয়াছে; সতরঙ্গ সকম্প জলের নিম্নে তাহার আশ্রয়স্বরূপ নিষ্কম্প, নিস্তরঙ্গ জল রহিয়াছে, কারণ সেখানে পবনের প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই, সুতরাং আলোড়নও নাই; তরঙ্গে নানারকম ছোট বড়, রঙ্গ-বিরঙ্গের বুদ্বুদ উঠিতেছে পড়িতেছে, জলের অল্প বিস্তর তারতম্যানুসারে কোনও বুদ্বুদ বড়, কোনও বুদ্বুদ ছোট; সূর্য্যকিরণ পতিত হওয়াতে রঙ্গ-বিরঙ্গ ধারণ করিয়াছে, কোনটা লাল, কোনটা সবুজ; কিন্তু ঐ বুদ্বুদ, ফেনিল তরঙ্গ আকৃতি কার্য্যগত ভিন্ন হইলেও জলরূপে একই। তরঙ্গায়িত জল, গভীর সমুদ্রের নিস্তরঙ্গ জল ছাড়া নয়। তুমি মনে করিলে তরঙ্গ গণনা করিব, ইহার আদি অন্ত কোথায় দেখিব; দেখার সাধ মিটিল না, অন্তের

সীমা পাইলে না। অনন্ত কাল দাঁড়াইয়া থাক, অনন্ত কাল দেখিতে থাক, তরঙ্গ উঠিতেছে, পড়িতেছে, ছুটিতেছে, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। যে দর্শক তরঙ্গের উঠাপড়া ছুটাছুটি দেখিতেছে, সে নিজেও অনন্ত কাল উঠাপড়া ছুটাছুটি করিতেছে, তাহা তাহার বোধ নাই। তুমি কোনও বস্তুর আদি অন্ত দেখিয়াছ কি? তোমার নিজের আদি অন্ত দেখিয়াছ কি? তোমার নিজের আদি অন্ত যদি না দেখিয়া থাক, তবে অন্যের আদি অন্ত দেখিতে চাহিও না। যখন নিজের আদি অন্ত পাইবে, তখন অন্যেরও আদি অন্ত সহজেই পাইবে।

বিশ্ব যখন এক ব্রহ্মেরই বিকাশ, তখন মায়া ব্রহ্মাংশ, বিশ্বের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে; কিন্তু উভয়ই এক। ত্রিগুণের তারতম্য অনুসারে, কেহ বুদ্ধিমান্, কেহ নির্ব্বুদ্ধি, কেহ অমল, কেহ সমল, কেহ সবল, কেহ দুর্ব্বল, কেহ ছোট, কেহ বড় ইত্যাদি। মুক্ত হও বা বদ্ধ থাক, চিৎ-সাগরেই থাকিতে হইবে। মায়ামুক্তের সহিত মায়াবদ্ধের পূর্ণযোগ, এক সূত্রে গ্রথিত; সূত্র ছাড়াইবার উপায় নাই, ছিন্ন করিবারও সাধ্য নাই। ব্রহ্মের মায়াতীত অংশ অগাধ, অনন্ত, নিশ্চল, নিষ্কম্প, নিস্তব্ধ, অনন্ত-বিশ্রাম, অনন্ত-বিরাম, ধীর, স্থির, শান্ত, গম্ভীর, মহানন্দ, মহাসুখের ক্ষীরোদার্ণব। অনন্ত বিশ্ব-তরঙ্গ চিদ্‌বক্ষে একটার পর আর একটা অনাদি অনন্তকাল হইতে অবিরাম উঠিতেছে, ছুটিতেছে, পড়িতেছে, আবার

মায়া

উঠিবে, ছুটিবে, পড়িবেও অনন্তকাল। ব্রহ্মবক্ষে যে অংশে মায়ার বিকাশ হইয়াছে, সেই অংশেই বিশ্বরূপ তরঙ্গ উঠিতেছে ; গভীর সমুদ্রে প্রবেশ করিলে মায়ারূপ বাতাস লাগিবে না, সুতরাং উঠা পড়া যাওয়া আসার জ্বালায় জ্বলিতে হইবে না।

প্রাণ

শ্বাস প্রশ্বাস যাহার কার্য্য, স্থূল শরীরে তাহাকেই আমরা প্রাণ বলিয়া জানি। বিজ্ঞানের বিষয় নয় অথচ সন্দেহের বিষয়ও নয়, তাহাই প্রাণের রূপ। প্রাণের এক উপাধি হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্ময় কোষে অধিষ্ঠান হেতু হিরণ্যগর্ভ নাম হইয়াছে। প্রাণের এক নাম "ঋক্", যে হেতু প্রাণই সমস্ত ইন্দ্রিয়কে উত্থিত করে। প্রাণের এক নাম "যেজুঃ," যে হেতু প্রাণ থাকিলেই সর্ব্ব ভূতের সহিত যোগ হয়। প্রাণের এক নাম "সাম," যেহেতু সংযোগ ও সাম্যকরণ জন্য সাম নাম হইয়াছে। প্রাণের এক নাম "আঙ্গিরস" যেহেতু প্রাণই অঙ্গের রস,-অর্থাৎ যে অঙ্গ হইতে প্রাণ বিযুক্ত হয় সেই অঙ্গ শুষ্ক হয়, এই হেতু প্রাণ যে শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের আত্মা ইহাও সিদ্ধ হইল; আত্মা না থাকিলেই মরণ ও শরীরের শোষণ হয়, প্রাণ না থাকিলেও তাহাই হয়। যেপ্রকার প্রদীপালোক গৃহ ও ঘটাদির পরিমাণ অনুসারে সঙ্কোচ ও বিকাশ লাভ করে, সেইপ্রকার প্রাণও শরীরমাত্রে পরিমিত হয়।

প্রাণ আপোময় অর্থাৎ কিছু না খাইয়া কেবলমাত্র জল খাইয়া থাকিলেও প্রাণ বাঁচিয়া থাকিতে পারে। প্রাণ সর্ব্ব-ব্যাপী ও সর্ব্বগত, কারণ রাজসিক বৃত্তি বিশ্বব্যাপী। প্রাণ ও

বাক্য মিথুনীভূত, সেই মিথুনীভূত প্রাণ ও বাক্য শব্দব্রহ্ম প্রণবে সংসৃষ্ট আছে। স্বর ও অকারাদি বর্ণ প্রাণ হইতে উৎপন্ন হয়। প্রাণ উদয়-অস্তশীল। আদিত্য যেমন উদয়-অস্তশীল, জন্ম-মৃত্যু দ্বারা প্রাণেরও উদয় অস্ত অনুমান করা যায়। জন্মেতে প্রাণের উদয়, মৃত্যুতে প্রাণের অস্ত হয়, কিন্তু ধ্বংস হয় না, যেমন আদিত্য উদয় ও অস্তে ধ্বংস হয় না।

অনেক প্রাণাত্মবাদী আত্মাকেই প্রাণ বলেন। তাহার কারণ এই, যাহার প্রাণ আছে তাহারই আত্মা আছে, যাহার আত্মা আছে তাহারই প্রাণ আছে। এমন কোনও প্রাণী দেখা যায় না, যাহার আত্মা নাই; এমন কোন আত্মবান্ দেখা যায় না, যাহার প্রাণ নাই। শ্রুতিতে প্রাণ, পরমাত্মা পরব্রহ্ম রূপে বর্ণিত আছে, যেহেতু স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সকল প্রাণেই প্রতিষ্ঠিত আছে। যিনি সমুদয় ভূতের আত্মা রূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনিই প্রাণস্বরূপ। সমস্ত জগৎ যাহা কিছু, সেই প্রাণস্বরূপ। ব্রহ্মই চালিত হইতেছেন এবং তাঁহা হইতেই নিঃসৃত হইতেছে।

প্রাণকে কেহ কেহ ইন্দ্রিয়ের রজঃ-অংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া থাকেন। প্রাণ আত্মার ভোগশক্তির ব্যাপার। প্রাণের দ্বারাই আত্মার ভোগ সাধিত হয়। অন্ন-জলের সারাংশ প্রাণের সহিত মিশিয়া প্রাণ হইয়া যায়, তাহাতে শরীর পুষ্ট হয় এবং আত্মার ভোগ সাধিত হয়। প্রাণ সকল অপেক্ষা প্রিয়। লোকে নিজ প্রাণকে যত ভাল বাসে, এত আর কাহাকেও ভাল বাসে না।

তত্ত্ববোধ

প্রাণ, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, ইহারা শরীরে কার্য্য করিয়া থাকে? প্রাণের চেষ্টাতেই ইন্দ্রিয় সকল চেষ্টাশীল। প্রাণই ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব কার্য্যে প্রয়োগ করিতেছে। মন চঞ্চল, কার্য্য করিবার জন্য সদাই ব্যস্ত, ইন্দ্রিয়গণ স্বীয় স্বীয় বিষয়ে ধাবিত হয়; প্রাণ যে স্পন্দিত হয়, সমস্তই রজঃ-গুণের কার্য্য। সমস্ত বিশ্বে যখন এই সকল গুণ কার্য্য করিতেছে, রজোগুণ যখন সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছে, রজোগুণেরই ব্যক্ত ধারা প্রাণ, সুতরাং প্রাণই সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া কার্য্য করিতেছে, প্রাণের চেষ্টাতেই জগৎ কার্য্যক্ষম, সুতরাং প্রাণ সর্ব্বব্যাপী। প্রাণের দ্বারা ধার্য্য ধারণ, কার্য্য কারণ নির্ব্বাহ হয়। সর্ব্বদাই প্রাণের ক্রিয়া হইতেছে, নিদ্রাবস্থাতেও প্রাণের ক্রিয়া সমভাবে হইয়া থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়তই প্রবাহিত হইতেছে। যখন প্রাণ ক্রিয়া না করে, অক্ষম হয় বা প্রাণের কার্য্য বন্ধ হয়, তখন আর জীবের বোধশক্তি থাকে না, মৃত্যু আসিয়া গ্রাস করে।

সূর্য্য যেপ্রকার সকল বস্তুর প্রকাশক ও অস্তিত্বজ্ঞাপক, প্রাণও তদ্রূপ। ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে সূর্য্যই জগতের অস্তিত্ব প্রকাশক, আদিত্য রূপে অবস্থান করিতেছেন। এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত বিশ্বই এক মহাপ্রাণ। প্রাণই পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, কন্যা, আচার্য্য, দেব, পশু, পক্ষী, কীট ইত্যাদি। প্রাণ বিদ্যমান থাকিলে, পিতা মাতা সম্বোধন হইয়া থাকে; প্রাণ চলিয়া গেলে, যাঁহাকে এতক্ষণ সম্ভ্রম করা

হইত, তাঁহাকে আর সম্ভ্রম করা হয় না, বরং জ্বলন্ত কাষ্ঠ দ্বারা তাঁহাকে দগ্ধ করা হয়।

প্রাণ ক্রিয়াশক্তি বা রজোগুণ-প্রধান প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত চিৎশক্তি। সূত্র দ্বারা যেমন পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও দূরবর্ত্তী বস্তু সকলকে গ্রথিত ও একীভূত করা হয়, সেইরূপ প্রাণ, অণুসমূহকে গ্রথিত করিয়া শরীর নির্ম্মাণ করে। প্রাণকে আশ্রয় করিয়া শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে। প্রাণ মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় ও ভূত, সকল পদার্থই চৈতন্য-অধিষ্ঠিত ত্রিগুণময়ী পৃথক্ পৃথক্ পরিচ্ছিন্ন অবস্থা। ভৌতিক রাজ্য তমোগুণপ্রধান, প্রাণরাজ্য রজোগুণপ্রধান এবং বুদ্ধিরাজ্য সত্ত্বগুণপ্রধান।

প্রকৃত পক্ষে প্রাণই দেহরাজ্যের সর্ব্বাধিকারী মহারাজ। জীবাত্মা পরমাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কাহার অবস্থিতিতে আমি অবস্থিত হইব? পরমাত্মা বলিলেন—প্রাণের অবস্থিতিতে তুমি অবস্থিত হইবে। কোনও সময়ে প্রাণ, মন, বুদ্ধি, চক্ষু, কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকল পরস্পর আমি প্রধান, আমি প্রধান, আমি না থাকিলে জীব দেহ আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না, এই-প্রকার বিবাদ উপস্থিত করিল; কে প্রধান, ইহার মীমাংসা করিয়া দিবার জন্য ব্রহ্মাকে মধ্যস্থ মানা হইল। ব্রহ্মা বিচার করিয়া বলিলেন—তোমরা দেহ হইতে একে একে চলিয়া যাও, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, কে প্রধান এবং কাহার অভাবে দেহ থাকে না। প্রথম চক্ষু গেল, চক্ষু যাওয়াতে জীবের কোনও

ক্ষতি হইল না, অন্ধ হইয়াও বাঁচিয়া রহিল; তাহার পর কর্ণ গেল, তাহাতেও কালা হইয়া বাঁচিয়া রহিল; বুদ্ধি গেল, জড়ের ন্যায় হইয়া বাঁচিয়া রহিল। এই প্রকারে সকল ইন্দ্রিয় চলিয়া গেল, তাহাতে প্রাণের কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হইল না; যেমন প্রাণ যাইবার উপক্রম করিল, অমনি সকল ইন্দ্রিয় চীৎকার করিয়া বলিল, তুমি যাইও না, তুমি যাইলে আমাদের এক মুহূর্ত্তও থাকিবার ক্ষমতা নাই, তোমার সঙ্গে সকলকেই যাইতে হইবে। তখন ব্রহ্মা বলিলেন—এখন বুঝিতে পারিয়াছ, প্রাণই প্রধান; তাহার প্রমাণ, এই সুষুপ্তিসময়ে অহঙ্কার বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকলের কার্য্য থাকে না, তাহাতে জীবের বাঁচিয়া থাকিবার কোনও ব্যাঘাত হয় না, কেননা প্রাণ জাগ্রৎ থাকে, প্রাণ না থাকিলে জীব থাকিতে পারে না, সুতরাং দেহ-রাজ্যে প্রাণই সকলের শ্রেষ্ঠ।

প্রাণই কর্ত্তা, ক্রিয়া, কর্ম্ম, কর্ম্মকর্ত্তা ও কর্ম্মফল-ভোক্তা। এই মহাপ্রাণ ছায়ার ন্যায় ঈশ্বরের অনুগত। প্রাণ স্বীয় শক্তিতেই গমন করে ও প্রকাশ পায়। প্রাণের বহির্ভূত থাকিয়া এ পর্য্যন্ত কোনও ক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই এবং কোনও কর্ত্তাও প্রাণ ব্যতিরেকে কোনও কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে পারে নাই। প্রাণ বা সজীবতা না থাকিলে কোনও কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে না। প্রাণই প্রাণ দ্বারা গমন করে, প্রাণই প্রাণ প্রদান করে। এক প্রাণই যদি কর্ম্মকর্ত্তা হইল, তবে কর্ম্মফল-ভোক্তাও তিনিই। জীব যাহা কিছু কর্ম্ম করিয়াছে, করিতেছে

ষ্ঠ করিবে, সে সমস্তই ফল সহিত সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া অদৃশ্য রূপে, ছাপ-লাগা বা দাগ-লাগার ন্যায়, বস্ত্রে কুসুমগন্ধের ন্যায়, প্রাণে অঙ্কিত থাকে। কর্ম্ম করিলেই জীবের সূক্ষ্ম শরীরে কর্ম্ম-জন্য ধর্ম্মাধর্ম্মনামক গুণ বা শক্তিবিশেষ জন্মিবেই জন্মিবে। ধর্ম্মাধর্ম্মনামক গুণ জন্মিলে সে আপনার আশ্রয়ীভূত জীবকে অবস্থান্তরে পাতিত করিবে, সেই সেই স্বকৃত কর্ম্মের ভাল মন্দ ফল ভোগ করিতে হইবে ; বার বার জন্ম, বার বার মরণ, বার বার অল্পকাল ও বহুকাল জীবনধারণ, পুনঃপুনঃ সুখ দুঃখাদি ভোগ করিতে হইবে ; কত দিনে বা কোন্ সময়ে কিরূপ অবস্থায় পাতিত করিবে, তাহার স্থিরতা নাই ; ফলতঃ এক সময়ে করিবেই করিবে, কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না। কিন্তু কোন্ কর্ম্মের কিরূপ ফল, তাহা অতীব দুর্ব্বোধ্য।

প্রাণ পরলোক-সত্তার ঈক্ষণ যন্ত্র। প্রাণে পরলোক-সত্তা গাঁথা রহিয়াছে, প্রাণই জগৎকেন্দ্র, প্রাণই বিশ্বকেন্দ্র। জগৎ ব্রহ্মাণ্ড এই প্রাণেই অবস্থিত। যেমন মৃণাল সকল নাল-মধ্যে তন্তু দ্বারা সংযুক্ত আছে, সেইরূপ আশারূপ পাশ দ্বারা সকলেই প্রাণে অবস্থিত আছে। মুকুরাদিতে যেরূপ প্রতিবিম্ব পড়ে, তদ্রূপ এই প্রাণে, পরমাত্মা জীবাত্মা রূপে অবস্থিত আছেন। এই বিশ্বে তুমি যাহা কিছু দেখিয়াছ, শুনিয়াছ, দেখিতেছ, শুনি-তেছ এবং যাহা কিছু দেখিবে, শুনিবে, সে সমস্তই প্রাণে গাঁথা রহিয়াছে, রহিতেছে ও রহিবে। মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত মহা-প্রলয়েও ধ্বংস হইবে না, এক কথায় সমস্ত বিশ্বই তোমার

প্রাণে গাঁথা ; তাহার প্রমাণ এই, মনে কর, তোমার পুত্র বিদেশে আছে, তাহাকে আজ তোমার স্মরণ হইল, স্মরণ হওয়ার অর্থ এই, তোমার পুত্রের আকৃতি ও ক্রিয়াকলাপ সমস্ত মনে পড়িল। মনে পড়িল অর্থাৎ তোমার পুত্রের আকৃতি ও ক্রিয়া-কলাপ যাহা প্রাণে গাঁথা রহিয়াছে, তাহা তুমি মানস প্রত্যক্ষ করিতেছ, তাহারই নাম স্মরণ বা স্মৃতি। স্মৃতি বলিয়া যাহাকে বলা হয়, তাহা প্রাণে গাঁথা পদার্থের মানস প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তোমার পুত্রের আকৃতি প্রকৃতি ও ক্রিয়াকলাপ যেমন প্রাণে গাঁথা রহিয়াছে, সেইরূপ বিশ্বের সমস্ত পদার্থই তোমার প্রাণে গাঁথা রহিয়াছে ; বিশ্বে এমন কোনও পদার্থ নাই, যাহা তুমি দেখ নাই বা শুন নাই ; বিশ্ব অনাদি অনন্ত কালের, তুমিও বার বার মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া সমস্ত বিশ্ব ভ্রমণ করিয়াছ, সুতরাং তোমার দেখিতে শুনিতে কিছু বাকি নাই। যদি বল ইহার প্রমাণ কি ? ইহার প্রমাণ এই, স্বপ্নে যাহা কিছু অদ্ভুত অসম্ভব ঘটনা প্রত্যক্ষ কর, যাহা তুমি এ জীবনে দেখ নাই বলিয়া বিবেচনা কর, তাহা অন্য জীবনের, অন্য স্থানের বিভিন্ন অবস্থার ঘটনা। স্মরণ হয়, প্রাণে গাঁথা ঘটনা বলিয়া ; প্রাণে যাহা গাঁথা নাই, তাহা কখনও স্মরণ হইতে পারে না ; প্রাণে যাহা গাঁথা নাই, মানসেও তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, স্মরণ হইতে পারে না এবং স্বপ্নেও দর্শন হইতে পারে না ; সুতরাং তুমি যাহা স্বপ্ন দেখিলে, তাহা প্রাণে গাঁথা মানস প্রত্যক্ষ পদার্থ ; সুতরাং প্রাণে "পরলোক-সত্তা" প্রথিত থাকে।

প্রাণ

যাহার চিত্ত-দর্পণ মার্জ্জিত ও স্বচ্ছ, সেই চিত্ত-দর্পণের দ্বারা তাহার প্রাণে সমস্ত বিশ্ব প্রতিফলিত দেখিতে পায়। যদি বল পরলোকের কথা স্মরণ থাকে না কেন ? যাহার গত-কল্যর কথা মনে থাকে না তাহার পরলোকের কথা মনে রাখা কত অসম্ভব ; বিশেষতঃ মৃত্যু-যন্ত্রণায় সমস্ত স্মৃতি লোপ হইয়া যায় ; মৃত্যুর সময়ে যাহার যন্ত্রণা না হয়, তাহারই পক্ষে পূর্ব্বজন্মের কথা মনে থাকিবার সম্ভব। যে প্রাণ দুঃখযন্ত্রণায় ব্যথিত, ভয়যুক্ত ও হিংসিত হয় না, কামের দ্বারা কলুষিত নয়, আশা-পাশে বদ্ধ নয়, তাহার প্রাণই দৈব প্রাণ। প্রাণ উৎক্রমণ-সময়ে দৈবভাবাপন্ন থাকিলে তাহারই পূর্ব্ব ও পরজন্ম-স্মৃতি মনে থাকিতে পারে, অন্যের স্মরণ থাকিতে পারে না।

প্রাণ সদা জাগরিত। জীব সুষুপ্তি প্রাপ্ত হইলে, বাহ্যেন্দ্রিয়ের ও অন্তরিন্দ্রিয়ের জ্ঞান যখন লুপ্ত হয়, অহঙ্কার যখন তিরোহিত হয়, জীব মৃত কি জীবিত যখন এইরূপ সংশয় হয়, তখন প্রাণই সেই সংশয় অপনোদন করে। জীবের সহজ অবস্থা তিনটি— জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। জীব জাগ্রৎ হইতে স্বপ্নে, স্বপ্ন হইতে সুষুপ্তিতে অবস্থান করে ; প্রাণ কিন্তু নিত্য জাগ্রদবস্থায়ই বিরাজমান থাকে ; জীব যে বেঁচে আছে, তাহার সাক্ষ্য দেয়। প্রাণ স্বপ্নাবস্থাও পায় না, নিদ্রাবস্থাও পায় না ; প্রাণ স্বপ্নের অতীত, নিদ্রারও অতীত।

জীবের জাগ্রদবস্থা কারে বলে ? ইন্দ্রিয়গণ যখন কার্য্যে রত থাকে, তখন জীবের জাগ্রদবস্থা। ঐ জাগ্রদবস্থা তিন

প্রকার—প্রথম জাগ্রৎ-জাগ্রৎ, দ্বিতীয় জাগ্রৎ-স্বপ্ন, তৃতীয় জাগ্রৎ-সুষুপ্তি। যে অবস্থায় সত্য জ্ঞান হয়, তাহার নাম জাগ্রৎ-জাগ্রৎ। যে অবস্থায় ভ্রম জ্ঞান হয়, তাহার নাম জাগ্রৎ-স্বপ্ন; তুমি জাগ্রদবস্থায় কোনও একটা কিছু ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ চমকিয়া উঠিলে, ইহার নামও জাগ্রৎ-স্বপ্ন। যে অবস্থায় জ্ঞানের ক্ষণিক উপরতি হয়, তাহার নাম জাগ্রৎ-সুষুপ্তি। তুমি এক জায়গায় বসিয়া কিছু ভাবিতেছ, ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ নিদ্রার আবল্য আসিল, চক্ষুও কিঞ্চিৎ নিমীলিত হইল, ঐ অর্দ্ধনিমীলিতাবস্থায়, সম্মুখে একটি বৃক্ষ দেখিয়া ব্যাঘ্র-ভ্রমে চমকিয়া উঠিলে, ইহারই নাম বা এই অবস্থাকেই বলে জাগ্রৎ-সুষুপ্তি।

জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির মধ্যস্থিত অবস্থার নাম স্বপ্ন অথবা তোমার দিবাভাগের সমস্ত কার্য্য যাহা গ্রথিত রহিয়াছে তাহার চক্ষুর অন্তরালে সুষুপ্তির পূর্ব্বে মানস প্রত্যক্ষের নাম স্বপ্ন। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত—প্রথম স্বপ্ন-জাগ্রৎ, দ্বিতীয় স্বপ্ন-স্বপ্ন, তৃতীয় স্বপ্ন-সুষুপ্তি। যে অবস্থায় স্বপ্নে সত্য জ্ঞান হয়, তাহার নাম স্বপ্ন-জাগ্রৎ। যদিও স্বপ্নাবস্থায় প্রায়ই মিথ্যাজ্ঞান উদিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু তাহার মধ্যে অনেক সময়ে সত্য জ্ঞানও উদিত হইতে দেখা গিয়াছে। অনেকে অনেক সময় মন্ত্র ও ঔষধ লাভ করিয়াছেন, অনেকে অনেকপ্রকার জ্ঞানও লাভ করিয়া-ছেন। যে অবস্থায় স্বপ্নে স্বপ্ন দৃষ্ট হয়, তাহার নাম স্বপ্ন-স্বপ্ন। যে অবস্থায় প্রকৃত সুষুপ্তি হয় নাই, অথচ স্বপ্ন-দর্শনও উপরত

হইয়াছে, এইরূপ দুর্লক্ষ্য অবস্থার নাম স্বপ্ন-সুষুপ্তি। স্বপ্ন—ইহা একটী আশ্চর্য্য বিজ্ঞান, মলিন চিত্তে তাহার অনুভব হয় না ; ইহা একটি মানস শিল্প, ইহা ত্রিকাল জ্ঞানের বীজ। ইহা পাত্র-বিশেষে সত্যও বটে মিথ্যাও বটে : যেমন টাকা সৎপাত্রে ন্যস্ত হইলে সৎকার্য্য সাধিত হয়, অসৎ পাত্রে ন্যস্ত হইলে নানা-প্রকার অসৎ কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে, সেইরূপ স্বপ্নও সাধকে সত্য, অসাধকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সত্ত্বগুণ-উদিত স্বপ্ন সত্য হয়, রজোগুণান্বিত স্বপ্ন মিথ্যা হয়। সাধক-দিগের সাধনার তারতম্য-অনুসারে সত্ত্বেরও উৎকর্ষ হইতে থাকে, স্বপ্নও সেই পরিমাণে সফলতা ধারণ করিতে থাকে। এই সফলতার শেষ সীমা ত্রিকালজ্ঞান বা সর্ব্বজ্ঞত্ব। মনে কর, তুমি সাধনা আরম্ভ করিলে, এই সময়ের স্বপ্ন কখনও সত্য কখনও মিথ্যা ; ক্রমে তোমার সাধনার উৎকর্ষ হইতেছে, সেই সঙ্গে সত্ত্বগুণও বৃদ্ধি হইতেছে, স্বপ্নও ততই সফলতা ধারণ করি-তেছে। যাহা পূর্ব্বে স্বপ্নাবস্থায় দেখা যাইত, তাহা সাধনার উৎকর্ষে সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হওয়াতে জাগ্রদবস্থায়ই দেখা যাইবে, তাহাই সর্ব্বজ্ঞত্ব। শোকগ্রস্ত, রোগগ্রস্ত, চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তির স্বপ্ন মিথ্যা। সময়ে সময়ে রোগগ্রস্ত ব্যক্তির স্বপ্ন সত্য হইতে দেখা যায়, তাহাতে মনে করিতে হইবে, দৈবাধীন সত্ত্ব-গুণের উদ্রেক-সময়ে সেই স্বপ্ন দেখিয়াছে, সেইজন্য সত্য হই-য়াছে। স্বপ্ন দ্বারা পরকাল-সত্তারও অনুমান সিদ্ধ হয়। তুমি যাহা দেখ নাই, শুন নাই, তাহা যেমন বলিতে পার না, মনও

যাহা দেখে নাই, শুনে নাই, তাহা বলিতে পারে না। স্বপ্নাবস্থায় কখনও বিচিত্র নগর, উদ্যান, অট্টালিকা, গো, হস্তী, রেলগাড়ি, সর্প, জলে সাঁতার প্রভৃতি কত ভয়ঙ্কর স্থান এবং কত মনোরম স্থান দেখা যায় ; সেই সকল তুমি মিথ্যা মনে করিও না, কারণ কোন না কোন জন্মে, কোন না কোন সময়ে, কোন না কোন স্থানে, মন তাহা দেখিয়াছে, তাহাই মন স্বপ্নাবস্থায় তোমাকে দেখাইল।

যে অবস্থায় বিভিন্ন জ্ঞান বিষয়চ্যুত হইয়া আত্মাভিমুখে এক অখণ্ড আকার ধারণ করে, তাহার নাম সুষুপ্তি। যে অবস্থায় সত্ত্ববৃত্তি সুখাকার হওয়াতে অস্পষ্ট ঘন সুখজ্ঞান হইতে থাকে, সেই অবস্থার নাম সুষুপ্তি-জাগ্রৎ। যে অবস্থায় রজোবৃত্তি অর্থাৎ দুঃখভাব লুক্কায়িত আবদ্ধ থাকে, তাহার নাম সুষুপ্তি-স্বপ্ন। যে অবস্থায় সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান তিরোহিত হয় অর্থাৎ যে অবস্থায় চিত্ত তমঃ অর্থাৎ অজ্ঞান মাত্র অবলম্বন করিয়া নির্ব্বিকার হয়, তাহার নাম সুষুপ্তি-সুষুপ্তি।

ঐ সমস্ত অবস্থার মধ্যে স্বপ্ন-জাগ্রদবস্থা বিশেষ অদ্ভুত এবং অনুসন্ধানযোগ্য। কিপ্রকার সত্যপ্রজ্ঞা উদিত, তাহা জানিতে পারিলে অবশ্যই তাহার দ্বারা সেইরূপ জ্ঞান লাভের কোন না কোন কৃত্রিম উপায় আবিষ্কৃত হইতে পারে। পূর্ব্বকালে ঋষিগণ উক্ত অবস্থার তাৎপর্য্য বিশেষরূপে অবগত হইয়াই যোগবলে বিভূতি লাভের উপায় আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, যে সময় পুরুষ সুষুপ্তি প্রাপ্ত হয়,-সেই সময়ে

প্রাণ

বাক্, মন, চক্ষু ও শ্রোত্র প্রাণে বিলীন হইয়া থাকে ; যে সময়ে জাগরিত হয়, সেই সময় প্রাণ হইতে তফাৎ হইয়া যায়।

প্রাণই জীবিকা শক্তি। প্রকাশময় বিজ্ঞানাত্মা চিদাত্মাকে আশ্রয় করিয়া শরীরের চৈতন্য সম্পাদন করেন ; প্রাণ সেই চিদাত্মাতে ও বিজ্ঞানাত্মাতে বর্ত্তমান থাকিয়া বিচেষ্টমান হন : ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, সকলই প্রাণেতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে. প্রাণই ভূতবর্গের কার্য্যরূপ পরব্রহ্ম এবং তিনিই বিরাট প্রভৃতির কারণ। চিদ্বিজ্ঞান-সমন্বিত সূত্রাত্মারূপ প্রাণই সর্ব্ব-ভূতের চেতয়িতা জীবাত্মা ; তিনিই সনাতন পুরুষ, তিনিই মহান্, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এবং ভূতপঞ্চকের শব্দাদিরূপ বিষয়ও তিনি ; এইরূপে সেই সূত্রাত্মা উপাধির আবেশ হেতু জীবভাব প্রাপ্ত হইলে পর, এই দেহমধ্যে বাহ্য কি আভ্যন্তর কি সর্ব্ব-বিষয়েই প্রাণবায়ু দ্বারা প্রতিপালিত হন। এই প্রাণ দেহমধ্যে প্রাণ অপানাদি পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত হইয়া বিদ্যমান আছেন। সেই প্রাণবায়ু পশ্চাৎ অপানবায়ুত্ব প্রাপ্ত হইলে তদ্দারা জীব পৃথক্ পৃথক্ গমনীয় গতি আশ্রয় করে, সেই অপান বায়ু আবার সমান নামে অভিহিত হইয়া জঠরানল অবলম্বন পূর্ব্বক ভুক্তান্ন পরিপাক করিয়া মূত্রাশয়ে ও পুরীষাশয়ে মূত্র ও পুরীষ বহন করত পরিবর্ত্তিত হয়। সেই এক বায়ু প্রযত্ন, কর্ম্ম ও বল, এই তিন বিষয়ে বর্ত্তমান থাকে ; শাস্ত্র তদবস্থ বায়ুকে উদান বায়ু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনুষ্যের সমুদয় শরীরমধ্যে প্রত্যেক সন্ধিস্থলে সন্নিবিষ্ট থাকিবার অবস্থায় ব্যান বায়ু বলিয়া

উপদিষ্ট হয়। জঠরানল ত্বগাদি ধাতু সমস্তের মধ্যে ব্যাপ্ত থাকে ; সেই অগ্নি প্রাণাদি বায়ু কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া অন্নাদি রস, ত্বগাদি ধাতু ও পিত্তাদি দোষ সমস্ত পরিবর্ত্তন করত দ্রুতবেগে সঞ্চরণ করে। প্রাণ সকলের একত্র সন্নিপাত নিমিত্ত সঙ্ঘর্ষণ জন্মে ; সেই সংঘর্ষ দ্বারা জঠরাগ্নি উৎপন্ন হয়, এবং সেই অগ্নিই দেহাদির ভুক্ত অন্ন পরিপাক করে।

সমান ও উদান বায়ুর মধ্যে প্রাণ ও অপান বায়ু সন্নিবেশিত আছে, তাহাদিগের সংঘর্ষ দ্বারা নিষ্পাদিত সপ্তধাতুময় শরীরকে পরিণত করিতে থাকে এবং সর্ব্ব শরীরে অন্নরস সমস্ত বহন করে। যে ক্রিয়া দ্বারা হৃদয় হইতে মুখ নাসিকা পর্য্যন্ত ঔর্দ্ধ্য বায়ুর গতাগতি ঘটনা হয়, সেই ক্রিয়ার নাম "প্রাণ"; যে ক্রিয়ার দ্বারা পরিচালক বায়ু নাভিস্থান হইতে পদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত রস-রক্তাদি বহন করিয়া পরিব্যাপিত করে, সেই ক্রিয়ার নাম "অপান" ; যে ক্রিয়া দ্বারা নাভিদেশ বেষ্টন করত ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক, মল মূত্রাদির পার্থক্য ও রস রক্তাদি উৎপাদন করত যথাযথ স্থানে লইয়া যায়, সেই ক্রিয়ার নাম "সমান" ; গ্রীবার পশ্চাৎভাগ হইতে মস্তকচূড়া পর্য্যন্ত সমস্ত দৈহিক উপাদান সহিত ঊর্দ্ধগমনশীল কণ্ঠস্থায়ী যে বায়ু, তাহাকে "উদান" বায়ু বলে ; যাহা সর্ব্বশরীরে শিরায় শিরায় সঞ্চরণ করত বল রক্ষা করিতেছে, তাহার নাম "ব্যান" বায়ু।

জীবের কোন্ অবস্থাকে জীবনী শক্তি বলে ? প্রাণ যতক্ষণ শরীরপোষক বায়ুকে পোষণ করে, ততক্ষণ তাহার আয়ু ; আয়

প্রাণ

সেই প্রাণ শরীরপোষক বায়ুকে যখন ত্যাগ করে, তখনই তাহার মৃত্যু হয়। কড়ি, বরগা, ইট, চূণ, সুরকি প্রভৃতি একত্র করিয়া গৃহের যে দৃঢ়তা ও বাসোপযোগিতা সম্পাদন করা যায়, তাহার নাম গৃহের জীবন। সেই দৃঢ়তার সহিত স্থিতিকালই সেই ঘরের পরমায়ু বা প্রাণ। জীবদেহের জীবন, প্রাণ বা আয়ু তাহারই অনুরূপ। জল অগ্নি ও বায়ু বা বায়ু পিত্ত ও কফ, এই তিন পদার্থের দ্বারা উৎপন্ন শক্তিবিশেষের নাম জীবন। যেমন অগ্নি দ্বারা জল উত্তপ্ত হইয়া বায়ু উৎপাদন করে এবং সেই বায়ুর শক্তি দ্বারা বাষ্পীয়যান গতি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জীবন নামক যানও প্রাণ অপানাদি দশ বায়ু দ্বারা ধৃত হইয়া মনের সাহায্যে গতি প্রাপ্ত হয়। আত্মা উহার আরোহী, যখন তেজের বৃদ্ধি হইয়া রসের ন্যূনতা প্রযুক্ত বায়ু কুপিত হয়, তখনই সন্ন্যাস রোগে মৃত্যু হয়। যখন তেজের ন্যূনতা দ্বারা রসের আধিক্য হইয়া বায়ুর অল্পতা হেতু দেহ গতি-হীন হয়, তখন বাতশ্লেষ্মা বিকারের মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয় : যখন রস ও বায়ুর ন্যূনতা হইয়া তেজের আধিক্য দ্বারা দেহ গতিহীন হয়, তখন সান্নিপাতিক মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ জীবন নামক ষট্‌শক্তি একবার চালিত হইলে, যতদিন বাধা প্রাপ্ত না হয়, ততদিন চলিতে থাকে। ঐ নির্জীব জীবনী শক্তি যখন আত্মা দ্বারা সঞ্জীবত্ব প্রাপ্ত হয় তখন উহাকে জীবন বা জীবাত্মা বলা যায় ; শরীর হইতে জীবনী শক্তির বিশ্লেষণই মৃত্যু। সপ্তদশ-অবয়ব-বিশিষ্ট শরীরমধ্যে যতগুলি পদার্থ

আছে, তাহাদের মধ্যে সকলের বিশ্রাম করিবার সময় আছে; কিন্তু প্রাণের দিবা নাই, রাত্রি নাই, সন্ধ্যা নাই, সকাল নাই, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই; অনবরতই শ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে; ইহাতে বশ বুঝা যায় যে, প্রাণই দেহরাজ্যের রাজা, এবং প্রাণের তেই সকলকে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

মন

মন সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক। বিচিত্র বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হওয়াই মনের ধর্ম্ম। মন যখন আত্মার সহিত অভিন্নরূপে অবস্থান করিয়া দ্রব্যাদি বিবিধ জ্ঞানের উৎপাদন-কারণ হয়, তখন মন বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। যাহার সংযোগ না হইলে চক্ষু দেখিতে পায় না, কর্ণ শুনিতে পায় না, হস্ত ধরিতে পারে না, কোনও ইন্দ্রিয়ই কার্য্যক্ষম হয় না, তাহারই নাম মন, অর্থাৎ অন্যমনস্ক থাকিলে কিছুই সিদ্ধ হয় না। ইহা এইপ্রকার, উহা এইরূপ নহে, ইহা করিব কি করিব না, তথায় যাইব কি যাইব না, হয় ত কিছু দূর যাইয়া ফিরিয়া আসিলাম ইত্যাদি বিবেচনা করা মনের ধর্ম্ম। এই ক্ষমতা মন ব্যতীত অন্য কোনও ইন্দ্রিয়ের নাই। অন্যান্য ইন্দ্রিয় বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হয়; এই বস্তু অমুকপ্রকার, এরূপ ধারণা করিতে পারে না।

যাহা দ্বারা আমরা ইচ্ছামত নানা সামগ্রী কল্পনা করি, যাহা দ্বারা আমরা ইচ্ছামত নানাপ্রকার কার্য্য করি, কখনও কাহাকেও স্বাধীন করি, কখনও কাহাকেও অধীন করি, জড় এবং আত্মার মধ্যবর্ত্তী এই যে এক অদ্ভুত পদার্থ, ইহাকেই বিশিষ্ট রূপে মন কহা যায়। আমরা যখন বস্তু সকলকে প্রত্যক্ষ করি, তখন সঙ্গে সঙ্গে এই এক শক্তিও অনুভব করি যে, ইহার সমান

অন্যান্য বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিলেও করিতে পারি; সুতরাং প্রত্যক্ষ ক্রিয়াতে আমাদের মন উপস্থিত বিষয়েতেই সর্ব্বসমেত আবদ্ধ থাকে না; কিন্তু উহা উপস্থিত বিষয়ের দিকে সমধিক আকৃষ্ট হইলেও কিয়ৎ পরিমাণে আমাদের আপন বশে থাকে, তাহাতে আর সংশয় নাই। এইজন্য স্বীয় চেষ্টা দ্বারা আমাদের মনকে এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে অনায়াসে নিয়োগ করিতে পারি। লোকের ভাব অভাব সুখ দুঃখাদি ক্ষণমধ্যেই উদিত ও অস্তমিত হয়, মনের কল্পনাই তাহার কারণ।

মনকে পৃথক্ রাখিয়া কি জ্ঞানেন্দ্রিয় কি কর্ম্মেন্দ্রিয় কেহই কোনপ্রকার কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। মনকে পৃথক্ রাখিয়া যদি কোনও ইন্দ্রিয় কদাচিৎ কোনও বিষয়ে সংযুক্ত হয়, তবে তাহা নিষ্ফল হয়, অর্থাৎ জ্ঞান জন্মায় না। মন অন্যদিকে নিবিষ্ট থাকিলে কোনও বিষয়েরই ভোগজনিত তৃপ্তিলাভে সমর্থ হওয়া যায় না। মন যখন যে ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হয়, তখন সেই ইন্দ্রিয়কে কার্য্য করায়; অন্যমনস্ক থাকিলে কোনও কার্য্য হয় না। দেহের কোনও চেষ্টা নাই, মনই চেষ্টা করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করে, সুতরাং মনই তাহার নায়ক। সুখদুঃখ চক্ষুকর্ণাদি দ্বারা বোধ হয় না, হয় তাহা মনের দ্বারা। বাহ্য পদার্থ যেমন ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া অন্তরে প্রবেশ করে, সুখদুঃখ পদার্থও মন-দ্বার দিয়া অন্তরে প্রবেশ করে। যে বস্তু সমীপে নাই, যে বস্তু বিদ্যমান নাই, চক্ষুকর্ণাদি হস্তপদ তাহা গ্রহণ করিতে পারে না; কিন্তু মন পারে। কোনও ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত মন সকল কার্য্যই

করিতে পারে। যে কোনও কার্য্য হউক, প্রথমে মনে উদয় হয়, তাহার পর বাক্য এবং হস্ত পদ দ্বারা তাহা কৃত হয়। যদি হাত পা বদ্ধ থাকে, তাহা হইলেও মন চুপ করিয়া স্থির থাকিবে না। সে নিজের কল্পনা-সাহায্যে পূর্ব্বদৃষ্ট, পূর্ব্বশ্রুত বস্তুর চিন্তা বা আলোচনা করিয়া তাহা স্বায় শরীরে অরোহণ করাইয়া বিচিত্র করিবেই করিবে। চক্ষুর অধিকার কর্ণে নাই, কর্ণের অধিকার চক্ষে নাই ; কিন্তু মনের অধিকার সকলটাতেই আছে।

প্রথম ইন্দ্রিয় দ্বারা বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ, অনন্তর তাহা মনের নিকট সমর্পণ, তাহার পর মনের দ্বারা স্বরূপাদি নির্ণয় হয়। মনের দ্বারা বিবেচিত হইবার পূর্ব্বাবস্থা অস্পষ্ট, এবং উত্তরাবস্থা স্পষ্ট। ইন্দ্রিয় সকল বস্তু গ্রহণ করিয়াছে, মনের নিকট সমর্পণ করে নাই, অথচ অস্পষ্ট মনের ছায়া পড়িয়াছে, তাহাই মুগ্ধ জ্ঞান। বালক, বোবা, উন্মাদ, জড়, ইহারাও বস্তু দেখে, কিন্তু বিবেচনা করিতে পারে না ; আঁ, ওঁ, গ্যাঁ, গোঁ, করে, ইহাই মুগ্ধজ্ঞান। ইন্দ্রিয় সকল বস্তু গ্রহণ করিয়া মনের নিকট অর্পণ করিল, মন বিকল্প করিতে থাকিল—ইহা কি পদার্থ, এইপ্রকার ইতস্ততঃ করিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া অহঙ্কারকে অর্পণ করিল, অহঙ্কার বলিল—উহা কোন্ পদার্থ তাহা বিচার করা আমার কার্য্য নয়, তবে তুমি আমাকে যাহা দিয়াছ তাহা উপেক্ষণীয় নহে, কারণ উহা প্রিয়দত্ত উপহার, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, তোমার প্রসাদে আমি ভিখারী হইয়াও সময়ে সময়ে রাজা তুরিতানন্দ বাবাজীর অনুগ্রহে সচ্চিদানন্দ হইয়া

বসি, সময়ে সময়ে ভিখারী অবস্থায়ও তুমি আমাকে রাজত্ব দাও, অতএব তুমি আমার অতি প্রিয়, সুতরাং তোমার দত্ত উপহার আমি বুদ্ধির নিকট দিলাম, উহা কোন্ পদার্থ বুদ্ধিই নিশ্চয় করিয়া দিবে, আমি ভোগ করিব। এইরূপ ক্রমপরম্পরায় আসিয়া জ্ঞান পরিপক্ক হয়, এবং পদার্থও স্থির হয়। ইন্দ্রিয়গণ মনের সাহায্যে আলোচনা করিল, মন সঙ্কল্প করিল, অহঙ্কার অভিমান করিল, তদনন্তর বুদ্ধির অধ্যবসায় বা অবধারণ হইল, এইখানে জ্ঞান পরিপক্ক হইয়া সম্পূর্ণ হইল।

যেমন জলদাবৃত অমা-রজনীর নিবিড় অন্ধকারে পথভ্রান্ত পথিক অরণ্যে উপস্থিত হইয়া বিদ্যুতের সাহায্যে ব্যাঘ্র দর্শন করিয়া সহসা পশ্চাৎ প্রতিনিবৃত্ত হয়, এখানে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের ন্যায় সহসা আলোচন, সঙ্কল্প, অভিমান ও অধ্যবসায়, এই বৃত্তি কয়টির উদয় হইয়া পরে অপসারণ কার্য্য সম্পাদিত হয়। প্রথমতঃ অস্পষ্ট আলোকে দূরে কিছু দেখা গেল, ঐ জ্ঞান মুগ্ধভাবে অর্থাৎ অস্পষ্টরূপে জন্মিল, তৎপরে দ্বিতীয় অবস্থায় মন আসিয়া সঙ্কল্প করিল ইহা ব্যাঘ্র, ইহা সঙ্কল্পাত্মক মনের কার্য্য—দ্বিতীয় জ্ঞান ; পরে তৃতীয় অভিমানাত্মক জ্ঞান অর্থাৎ অহঙ্কার অভিমান করিল আমার দিকে আসিতেছে—ইহা তৃতীয় জ্ঞান ; তৎপরে চতুর্থ অধ্যবসায়মূলক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান অবধারণ করিল—আমি অপসৃত হই, নচেৎ আমাকে খাইয়া ফেলিবে। এই চারিপ্রকার জ্ঞান, ইহারা বিদ্যুতের ন্যায় এত শীঘ্র শীঘ্র সম্পাদিত হয় যে, পর পর অবধারণ করা যায় না

শতপত্র-ভেদের তুল্য অর্থাৎ এক শত পদ্মপত্র একটা সূচিকা দ্বারা ভেদ করিলে মনে হয় যেন একবারে সমস্ত পত্রই ভেদ হইয়াছে, কিন্তু হইয়াছে পর পর।

মনের সঙ্কোচ ও বিস্তার সংস্কার-ধর্ম্ম। মন এক স্থানে থাকিয়াই মুহূর্ত্তমধ্যে সর্ব্ব বিশ্ব পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে পারে, ইহা সংস্কার-ধর্ম্ম। মন প্রসারণশক্তি-বলে, সর্ব্ব বিশ্বে ব্যাপিত হইতে পারে, আকুঞ্চনশক্তি-বলে পরমাণুতুল্য হইতে পারে, এইজন্য অনেকে মনকে বায়বীয় পরমাণুতুল্য বলিয়া থাকেন। বস্তুর স্মরণ অর্থাৎ ইহা সেই বস্তু বলিয়া অনুভব, ইহা সংস্কার-ধর্ম্ম; লজ্জাও সংস্কারধর্ম্ম, কারণ লজ্জা দ্বারা মন আকুঞ্চিত হয়। মন নিরবয়ব ও নিত্য।

মন কেবল ভাবনা মাত্র। এই ভাবনা স্পন্দিত হইয়া বিহিত নিষিদ্ধ,ক্রিয়ারূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে; ঐ ক্রিয়া দৃষ্টভাবে পরিণত হইলে যে ফল সমুদ্ভূত হয়, জীব তাহারই অনুগামী হইয়া থাকে এবং প্রারব্ধ কর্ম্মের অনুযায়ী দেহ আশ্রয় করে। মনই কর্ম্ম করে এবং স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করে; যাহা কিছু বিদ্যমান, সকলই মনের বিকাশ মাত্র। এই মনের বিকাশকেই কর্ম্মের বীজ বলে। এইজন্য মন ও কর্ম্মে কিছু মাত্র বিভিন্নতা নাই; মনের কর্ম্মশক্তি স্বভাবসিদ্ধ, অগ্নির উষ্ণতার ন্যায়। মনের স্পন্দনই কর্ম্ম। মনের দৃঢ়ত্বই কর্ম্মসিদ্ধির রূপ, কেননা পুরুষকার দ্বারা যে ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়, মনের দৃঢ়ত্বই তাহার কারণ; দৃঢ়মনা ব্যক্তি পর্ব্বতও ভেদ করিতে

পারে। অস্থিরচিত্ত ব্যক্তি সামান্য মৃণাল ভেদেও সমর্থ হয় না. মনে করিলে এক মুহূর্ত্তে যে কার্য্য করা যায়, মনে না করিলে শত মুহূর্ত্তেও সেই কার্য্য সম্পন্ন হয় না। তিলমধ্যে তৈলের ন্যায়, মনের মনেই সুখদুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম অবস্থিত। মনের দোষেই দুঃখ, মনের গুণেই সুখ, মনের দোষেই শত্রু, মনের গুণেই মিত্র। মহর্ষি মাণ্ডব্য শূলে আরোপিত হইলেও কোনও ক্লেশ অনুভব করেন নাই, কারণ তিনি মনকে পবিত্র, রাগহীন ও সন্তাপহীন করিয়াছিলেন। কলঙ্কিত মন হিতকে অহিত এবং মিত্রকে শত্রু বোধ করে।

মনের স্পন্দন হেতুই বহুবিধ ক্রিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। মন ও কর্ম্ম পরস্পর ধর্ম্ম ও কর্ম্ম শব্দে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কর্ম্ম মনের স্পন্দনাত্মক বিলাস সহ সম্মিলিত হইয়া মনরূপে পরিণত হয়। এই মন কর্ম্ম-সাহায্যে আপনার সঙ্কল্প শরীর বিবিধরূপে বিস্তৃত করিয়া এই সঙ্কল্প-সঙ্কুল মায়াময় জগৎকে বহুরূপে প্রকাশ করে। মনের কর্ম্ম-ভাবনাই সংসারে জীবকে নটের ন্যায় বিবিধ নাম ধারণ করায়। উহাই আমি, তুমি ও অন্যান্য বিবিধ নাম. রূপাদি-স্বরূপ। মনই সঙ্কল্প দ্বারা পিতা হইতে পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হয়। এই মনই কখন দেবতারূপে, কখন মনুষ্যরূপে, কখন পশুরূপে উদিত হইয়া উল্লাসিত হইয়া থাকে; বাসনার অনুসরণপ্রসঙ্গে আত্মাকে বহুরূপে বিস্তার করিয়া থাকে; মন কর্ম্মে আসক্ত হইলে বন্ধন হয়; কর্ম্ম পরিত্যাগে বা ভাবনা ত্যাগে মুক্ত হয়।

ভ্রান্তি-দর্শন মনের কার্য্য। রজ্জুতে সর্পভ্রম, চন্দ্রে অগ্নি-শিখাভ্রম, জলাশয়ে মরীচিকাভ্রম, দৃষ্টিদোষে দিক্‌ভ্রম, শুক্তিকাতে রজতভ্রম, ইত্যাদি মনেরই কার্য্য ; মনের মননই জগৎ। এই যে বাহ্য জগৎ পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া মানস-সমুদ্রে ভাসমান হইতেছে, ইহার মূলাধার চৈতন্য। মনের কল্পনা-বারির অভাব হইলে, বাহ্য জগৎ সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়া যায়; সুতরাং মন ও জগৎ উভয়ই এক বস্তু। সত্য বিচার দ্বারা ভ্রান্তি দূর হইলে একের অভাবে উভয়েরই বিনাশ হইয়া থাকে, তখন কেবল অবশিষ্ট ব্রহ্মই অবস্থিতি করেন। আমি জীবিত, জাত, মৃত, এই সকল মনেরই ভ্রান্ত কল্পনা; সুতরাং মন সংযত হইলে, সংসারভ্রান্তির নাশ হয়, ভ্রান্তিনাশে ব্রহ্মে স্থিতি অবশ্যম্ভাবী। মন স্থূল ভ্রান্তির বশীভূত হইলে জীব নামে অভিহিত ও তদ্বিহীন হইলে পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়।

মন স্বভাবতঃই চঞ্চল ; একে ত চঞ্চল পদার্থ ধরিয়া রাখা কঠিন, তাহাতে কেবল চঞ্চল নহে, আবার পীড়নকারী, তাহার উপদ্রবে ইন্দ্রিয় ও শরীর পর্য্যন্ত ক্ষোভযুক্ত হইয়া থাকে ; মনের যাহাতে আগ্রহ হইবে, সে তাহাই করিবে—উহা ভাল কাজই হউক, আর মন্দ কাজই হউক। ইহা ছাড়া ভয়ানক বলবান্, এ এমনি বলবান্ যে, কেহই তাহাকে সে দিক্ হইতে ফিরাইতে পারে না ; বিশেষতঃ আরও দৃঢ়, বিষয়বাসনারাশি দ্বারা দুর্ভেদ্য, তাহার সঙ্গে সঙ্গে জন্মজন্মান্তরের সংস্কাররাশি মনকে এত দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছে যে, তাহাকে ছেদন বা মর্দ্দন করা

অতিশয় কঠিন। যখন অত্যন্ত ঝড় বহিয়া যায়, তখন সেই প্রবল বায়ুকে ধরিয়া রাখা যেমন কঠিন, অব্যাহতগতি চঞ্চল মনকেও নিরুদ্ধ করা সেইরূপ দুষ্কর। ভাল মন্দ সমস্ত কার্য্য মনের আবেগেই হইয়া থাকে।

মন হুতাশনের ন্যায় চিন্তারূপে শিখা ও ক্রোধরূপে ধূমজাল বিস্তার করিয়া শুষ্ক তৃণের ন্যায় জীবকে অহরহঃ দগ্ধ করিতেছে, এবং তৃষ্ণার সহিত মিলিত হইয়া জীবকে আকুল করিতেছে। মন অগ্নি অপেক্ষাও উষ্ণ, পর্ব্বত অপেক্ষাও দুরতিক্রম্য, বজ্র অপেক্ষাও দৃঢ়, বিদ্যুৎ অপেক্ষাও চঞ্চল, এবং বায়ু অপেক্ষাও সদাগতি। মন স্থির থাকিলে সকলই স্থির থাকে, মন অস্থির হইলে সকলই অস্থির বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মন সাগরের ন্যায় অতীব বিস্তীর্ণ, বিবিধ-জন্তু-সমাকীর্ণ। বিমল আত্মতত্ত্বই জগতে বিদ্যমান, আর কিছুই নাই, এইপ্রকার যখন বিচার করে, তখন বিদ্যা নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

মন বিবেকশক্তি ধারণ করে, যে শক্তি দ্বারা একপ্রকার অনুভূতিকে অন্যপ্রকার অনুভূতি হইতে ভিন্ন বলিয়া বুঝিতে পারে, অর্থাৎ যাহা দ্বারা আমাদের বিবেক-প্রতিপত্তি হয়, মনের তাদৃশ শক্তিই বিবেকশক্তি। অঙ্গুলি দ্বারা পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিলে, স্পর্শকর্ত্তাকে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ না করিয়াও যে শক্তি দ্বারা আমরা স্পর্শকর্ত্তাকে বুঝিতে পারি, তাহাই বিবেকশক্তির কার্য্য।

ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত শরীরিমাত্রেই দ্বিশরীর-বিশিষ্ট,

তাহার মধ্যে মন এক শরীর। ইহা অতিমাত্র বেগশালী ও চঞ্চল। অন্য শরীর মাংসময়, ইহা অতি অকিঞ্চিৎকর, কারণ সকলপ্রকার পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। এই মাংস-দেহ ক্ষীণ, হীন, মূক ও ক্ষণভঙ্গুর, এই সকল কারণে অতিশয় হেয়। দ্বিতীয় শরীর মন এইপ্রকার ক্ষণিক বা অসার ধর্ম্ম-বিশিষ্ট নহে। ইহা আয়ত্ত হইয়াও আয়ত্ত নহে ; এই মাংসময় শরীর ইহার আবরণ, কিন্তু এই আবরণে মন বদ্ধ নহে, কারণ ইহা এই মুহূর্ত্তেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বিচরণ করিয়া আসিতে পারে। কামরূপী হেতু হস্ত পদ না থাকিলেও যথায় ইচ্ছা তথায় যাইতে পারে, ইহার শক্তির সীমা নাই।

মনের সহিত আত্মার ও বাহ্য জগতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কোনও কারণ বশতঃ কোনও একটা শরীরে জীবনী শক্তির আবির্ভাব হইলে, সেই শরীরের সহিত আত্মা ও মনের যে সম্বন্ধ উপস্থিত হয়, সেই সম্বন্ধের ঘটক অবস্থার নামই জন্ম, এবং কোনও কারণ বশতঃ কোনও একটি শরীরের জীবনী শক্তি বিচ্ছিন্ন হইলে, সেই শরীরের সহিত আত্মা ও মনের যে সম্বন্ধ ছিল তাহার নাশক অবস্থার নাম মৃত্যু।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত তৈল ও তৈলের আধার, বর্ত্তিকা ও অগ্নি, ইহাদের পরস্পর সংযোগ থাকে, ততক্ষণ তাহাকে প্রদীপ বলা যায়, সেইরূপ দেহাদির সহিত মনের সংযোগকে জন্ম বলা যায়, এবং বিয়োগকে মৃত্যু বলা যায়।

দীপের জ্যোতির দীপত্ব বা জ্বালা পরিণাম। জীবপক্ষে—

তৈলস্থানীয় কর্ম্ম, বাসনারূপে তদধিষ্ঠানীয় মন, বর্ত্তিকাস্থানীয় দেহ, অগ্নিসংযোগস্থানীয় চৈতন্য, দীপস্থানীয় সংসার, দেহক্ষেত্র—দেহসংযোগ-নিবন্ধন এই ভব-সাগর। তৈল থাকিলেও প্রবল বাতাসে বর্ত্তিকা নির্ব্বাণ হয়, সেইরূপ আয়ু থাকিলেও মৃত্যু ঘটিতে পারে। বর্ত্তিকা নিবিয়া গেলেও তাহার অস্তিত্ব নষ্ট হয় না, বায়ুতে তাহার তেজ লীন থাকে, সেইরূপ দেহ ধ্বংস হইলেও আত্মা-সংযুক্ত মন দেহান্তর গ্রহণ করে। এই জন্ম ও মৃত্যু উভয়ই আত্মার উন্নতির জন্য। আত্মাতে জ্ঞানোৎপাদনের জন্যই শরীর। ঐ শরীর যখন জ্ঞানোৎপাদনে অসমর্থ হয়, কর্ম্মে অক্ষম হয়, তখন আত্মার জ্ঞান উদ্বোধনার্থ নূতন শরীর হইয়া থাকে। ইহাই জন্মমৃত্যুর রহস্য।

মনের মানসিক বৃত্তি অস্থিরতা ; ইহা এক বিষয়ে নিবিষ্ট থাকে না, সন্তুষ্ট থাকে না, ইহা করিব উহা করিব বলিয়া সর্ব্বদাই অস্থির থাকে, একটা ছাড়িয়া অন্য একটা, সেটা ছাড়িয়া অপর একটা গ্রহণ করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়, বাহ্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষায় অস্থির থাকার জন্যই অতিশয় চঞ্চলস্বভাব। মনের কামবৃত্তি যথা—কাম, ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা, হিংসা, উপার্জ্জন, বিসর্জ্জন ; আবার মোহবৃত্তি—ভ্রম, প্রমাদ, নিদ্রা, মোহ, সংশয়, ভয়, এবং সুখ, দুঃখ, শোক, হর্ষ, বিষাদ ইত্যাদি। মনের সহানুভূতিও বেশ আছে ; যেমন—দয়া, প্রেম, স্নেহ, ভক্তি, অনুরাগ ক্ষমা ইত্যাদি। নিরোধবৃত্তি—শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, বৈরাগ্য ইত্যাদি।

মন

প্রাণ, মন ও বুদ্ধির এক ভাব। যেমন—আমি প্রত্যহ পথ ভ্রমণে বাহির হই; পথের ধারে আম, জাম, লিচু, লেবু, অনেক-প্রকার গাছ আছে, প্রত্যহ যাতায়াত করিবার সময় ঐ গাছ কয়েকটা অবলোকন করি। প্রতিদিনের দর্শনের ফলে ঐ গাছ কয়েকটা প্রাণে গাঁথা হইয়া গেল; দর্শনের দ্বার দিয়া প্রাণে চুপি চুপি প্রবেশ করিল, কখন কোন্ দিন কোন্ সময়ে প্রবেশ করিল, তাহা আমি জানিতে পারিলাম না। প্রতিদিনই সেই স্থানের আম গাছটা দেখিবামাত্র, জাম গাছটা মনে পড়ে, জাম গাছটা দেখিবামাত্র লিচু গাছটা মনে পড়ে, লিচু গাছটা দেখিবা মাত্র লেবু গাছটার কথা মনে পড়ে। প্রাণে যাহা গাঁথা রহিয়াছে, মনে তাহার একাংশ চাক্ষুষ দৃষ্টিযোগে ব্যক্ত হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পর পরবর্ত্তী অংশের দর্শনাকাঙ্ক্ষা মনে ব্যক্ত হয়। যখন কোনও সংস্কার অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হয়, তখন তাহা প্রাণের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া লুকাইয়া অবস্থিতি করে। মনে কর, তোমার পুত্র বিদেশে আছে, আজ তোমার তাহাকে স্মরণ হইল, এখন মনে ভেবে দেখ দেখি, তোমার মনে হইল কোথা হইতে? অবশ্য তাহা প্রাণে গাঁথা রহিয়াছে; যাহা প্রাণে গাঁথা রহিয়াছে, তাহাই মনে দৃষ্ট হইল; তাহারই নাম স্মরণ। দৃষ্ট, অদৃষ্ট, শ্রুত, অশ্রুত, এ বিশ্বের সমস্ত পদার্থই প্রাণে গাঁথা রহিয়াছে, কোন-প্রকার স্মারকের উত্তেজনায় নাড়াচাড়া পাইলেই তাহা স্মরণ হয় বা মনে পড়ে। আমি আম বাগান হইতে হঠাৎ মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম; আসিয়া দেখি জমিতে কতকগুলি ধান

গাছ। ধান গাছের সহিত আম গাছের বিভিন্নতা বিচার করা বুদ্ধির কার্য্য। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, প্রাণ মন ও বুদ্ধি এক আধারমূলক, এক সঙ্গে গাঁথা রহিয়াছে, কেহ কাহাকে ছাড়িয়া নাই। এক চিৎসূত্রে অহঙ্কার, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি গাঁথা রহিয়াছে।

চাওয়া তিনপ্রকার। প্রথম প্রাণের চাওয়া, দ্বিতীয় মনের চাওয়া, তৃতীয় বুদ্ধির চাওয়া। প্রাণের চাওয়া ব্যাকুলতা, মনের চাওয়া অনুসন্ধান, বুদ্ধির চাওয়া অবধারণ। একটা মাঠের মধ্যে একজন পথিকের প্রাণ জলের জন্য ব্যাকুল হইল, ইহা প্রাণের চাওয়া; মন জলের অনুসন্ধানে দৌড়িল, ইহা মনের চাওয়া; জলের অনুসন্ধানে সম্মুখে মরীচিকা দেখিল; হিতাহিত-বোধরহিত চঞ্চল মন বলিল ইহাই জল; বিজ্ঞ বিচক্ষণ বুদ্ধি বলিল, তুমি চঞ্চল বালকের মত, তোমার কিছুমাত্র হিতাহিত বোধ নাই, তুমি যাহাকে জল বলিতেছ, উহা জল নয়, মরীচিকা। যদি তোমার একান্ত জলের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তবে ঐ দূরে যে গাছটি দেখা যাইতেছে, তাহার নিকট যাও, ঐখানে জলাশয় পাইবে, কারণ ঐ গাছ হইতে কয়েকটা পাখী উড়িয়া আসিয়াছে, তাহাদের পায়ে কাদা লাগিয়া রহিয়াছে, অতএব বুঝা যাইতেছে নিকটে জল আছে;—ইহাই বুদ্ধির চাওয়া, ইহারই নাম অবধারণ। ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যায় প্রাণ, মন, বুদ্ধি একাধারমূলক।

বুদ্ধি

যাহা নিশ্চল, ধীর, স্থির, তাহাই বুদ্ধি। বহু বিচিত্র বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হইয়াও স্থির থাকা বুদ্ধির ধর্ম্ম। যাহা চঞ্চল, অধীর, অস্থির, তাহাই মন। অধ্যবসায় বুদ্ধির গুণ, সঙ্কল্প মনের গুণ। নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের নাম অধ্যবসায়। কোনও একটা পদার্থ আছে, এই যে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান অর্থাৎ আমি আছি, বস্তু আছে, এই যে আছে নিশ্চয়ভাব, তাহাই বুদ্ধি। জীবমাত্রেরই ইহা করিতে পারি, ইহা করিতে পারিব, এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান হইলে বুদ্ধি উত্তেজিত হয়, পরে সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। মনে কর, এক-জন লোক দূর হইতে একটা পশুকে দেখিয়া এইরূপ চিন্তা করিল যে, এটা পশু বটে তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু এটা কোন্ পশু, অশ্ব বা গো, স্থির হইল না। দর্শক এখানে সাধারণ পশুজ্ঞান হইতে কোনও একটা বিশেষ পশুজ্ঞানে অবতীর্ণ হইবার জন্য পন্থা অন্বেষণ করিতে লাগিল, ইহাতে কৃতকার্য্য হইলেই তাহার বুদ্ধি নিশ্চল হয় বা চরিতার্থ হয়, ইহাই বুদ্ধির ধর্ম্ম। যতক্ষণ নিশ্চয় না হইবে, ততক্ষণ সে কিছুতেই স্থির হইতে পারিবে না ; কোন্ পশু স্থির হইলেই, সেই সময় হইতে সেও স্থির হইবে। ইহাই বুদ্ধির নিশ্চয়াত্মক ধর্ম্ম। যতক্ষণ নিশ্চয় না হয়, ততক্ষণ তাহার মনে কেবল ভাবনাই চলিতে থাকে যে,

এটা কোন্ পশু ; ইহা মনের ধর্ম্ম। বুদ্ধিবৃত্তি—ইষ্ট ও অনিষ্ট বৃত্তি-বিশেষের বিনাশ, উৎসাহ, চিত্তস্থৈর্য্য, প্রতিপত্তি, প্রমাণ, স্মৃতি, নিদ্রা, যুক্তি, বিবেকবিচার ও সিদ্ধান্ত।

বুদ্ধি তিন অবয়বে বিভক্ত—বিচার, বিবেচনা, ও যুক্তি। এই তিন অবয়ব আবার দুই ভাগে বিভক্ত—শক্তি ও জ্ঞান। বিচার-বুদ্ধির শক্তি প্রধান অঙ্গ, এবং যুক্তি ও বিবেচনা-বুদ্ধির জ্ঞান প্রধান অঙ্গ। বিচারবুদ্ধির হাত পা, বিবেচনাবুদ্ধির চক্ষু। যুক্তি, বিচার ও বিবেচনার মাঝখানে থাকিয়া, "যেহেতু" ও "অতএবে"র যোগ সাধন করে। লোকে প্রথম উদ্যমের বিচার কার্য্য সরাসরি মতে করিয়া ফেলে, বিবেচনাকে বড় একটা কর্ত্তৃত্ব ফলাইতে দেয় না। যেমন এক ব্যক্তিকে জমকাল পোষাক পরিধান করিতে দেখিয়া মনে করিলাম এই ব্যক্তি বড় ধনী, ইহা সরাসরি বিচার ; বুদ্ধির বিবেচনাশক্তিকে খাটাইয়া দেখিলাম তাহা নয়, যুক্তি আসিয়া বলিল, ঐ পোষাক অপরের নিকট হইতে ধার করিয়া আনিয়াছে, অতএব এই ব্যক্তি ধনী নয়। এক ব্যক্তিকে শ্লোক উচ্চারণ করিতে দেখিয়া মনে করিলাম এই ব্যক্তি একজন মহা পণ্ডিত, কিন্তু বুদ্ধির বিবেচনা-শক্তি খাটাইয়া দেখিলাম তাহা নয়, যুক্তি আসিয়া বলিল, উহার সমস্ত পুঁথিগত বিদ্যা, কারণ ঐ ব্যক্তি কোনও শ্লোকের অর্থ জানে না, কেবল পুস্তক দেখিয়া শ্লোক মুখস্থ করিয়াছে ; অতএব সিদ্ধান্ত হইল ঐ ব্যক্তি পণ্ডিত নয়, যুক্তি এবং "অতএবে"র যোগ সাধন হইল।

বুদ্ধি

কিছু স্বর্ণ হস্তে লইয়া তাহা কত দরের সোণা ; ইহা বিচার-শক্তির কার্য্য। ভাল সোণা কাহাকে বলে, সে তাহা জানে ; ইহা বিবেচনার কার্য্য। কিরূপ ক্রেতাকে কিরূপ সোণা গছাইতে হইবে, ইহা ঠিক করা যুক্তির কার্য্য ; যেহেতু এই ক্রেতা এই সোণার উপযুক্ত, অতএব সিদ্ধান্ত হইল, ইহাকে এই দরের সোণা দেওয়া যাক্, "যেহেতু" এবং "অতএব" যোগ-সাধন যুক্তির কার্য্য করিল।

বুদ্ধি, বিষয় ও বিষয়ী এই উভয়ের সহিত সম্বদ্ধ হয় বলিয়া, উভয়রূপেই ভাসমান থাকে। ঐ বুদ্ধি পুরুষ বা আত্মার দৃশ্য হইয়াও অর্থাৎ বুদ্ধি বিষয়াত্মক হইয়াও অবিষয়াত্মক রূপে, স্বয়ং দ্রষ্টা বা ভোক্তা ভাবে, অচেতন হইয়াও সচেতনের ন্যায় প্রতিভাত হয়, প্রতিবিম্বগ্রাহী স্ফটিকের ন্যায় সর্ব্বপদার্থের অবভাসক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। বুদ্ধি আত্মার সমান আকার ধারণ করে বলিয়া অনেকে বুদ্ধিকে আত্মা বলিয়া থাকেন। বুদ্ধির সংসর্গেই বুদ্ধিগত সুখদুঃখাদি পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয় ; ঐ প্রতিবিম্বই পুরুষের সংসার।

সৎ, চিৎ,আনন্দ, এই তিনে প্রভেদ নাই। শব্দভেদ আছে সত্য, কিন্তু অর্থভেদ নাই। সেইরূপ ব্রহ্মই প্রতিবিম্বভাবে বুদ্ধিরূপ উপাধিতে, তপ্তলৌহপ্রবিষ্ট বহ্নির ন্যায়, অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অন্তঃকরণের জড়তা খর্ব্ব করত সেই বুদ্ধিকে চেতনপ্রায় করেন। সেই বুদ্ধিই চৈতন্যাকার ধারণ করায় জ্ঞাতা ও ভোক্তা; স্ফুলিঙ্গের ন্যায় সমুত্থিত অন্তঃকরণবৃত্তি উজ্জ্বলিত করায় জ্ঞান : প্রতিবিম্ব

দ্বারা পদার্থাকার মনোবৃত্তির আকার ধারণ করায় জ্ঞেয় বা ভোগ্য। তিনিই জ্ঞানেন্দ্রিয় গ্রহণ করিয়া দ্রষ্টা, জ্ঞানেন্দ্রিয়জনিত মনোবৃত্তির ব্যাপ্ত হইয়া দর্শন, মনোবৃত্তির বিষয় ব্যাপ্তি দ্বারা সেই রূপ লাভ করায় দৃশ্য। কর্ম্মেন্দ্রিয় গ্রহণ করায় কর্ত্তা, ক্রিয়ানু-যায়ী হওয়ায় ক্রিয়া। তিনিই এই প্রকারে সর্ব্বাত্মক।

পুরুষ, প্রকৃতির মিলনে অহংবুদ্ধি ধারণ করেন। একখণ্ড লৌহ যেমন অগ্নির সহিত গাঢ় সহবাস করিয়া অগ্নিতুল্য হয়, সেইরূপ পুরুষ, বুদ্ধির সহিত গাঢ় সহবাসে, বুদ্ধি ও পুরুষের মিলনে, অহংচৈতন্যাকার ধারণ করিয়া রাগ বা অনুরাগ নামক ক্লেশের উৎপত্তি করেন। চিৎস্বরূপ আত্মা, বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতি-বিম্বিত হন বলিয়া এইরূপ হয়।

সুখ, দুঃখ, মোহ, এই সমস্তই বুদ্ধির বিকার। অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়াকারে ও সুখ দুঃখাদি আকারে পরিণত হইবা-মাত্র চিৎশক্তি দ্বারা প্রজ্জলিত হয়। এখানে প্রকৃতির মিলনে পুরুষ সুখদুঃখভোক্তা বলিয়া পরিচিত হয়, ইহাই সংসারী জীবের দুঃখসমূহের মূল অর্থাৎ বুদ্ধির উপর পুরুষের বা আত্মার অভেদভ্রান্তি বা আত্মসম্পর্ক কল্পিত হইতেছে বলিয়াই পুরুষ সুখদুঃখাদি বিকারে বিকৃত হইতেছেন। সুতরাং বুদ্ধির সহিত পুরুষের তাদৃশ মিথ্যা সম্বন্ধ ঘটনা থাকাতেই পুরুষের ক্লেশময় ভোগ উপচারক্রমে উৎপন্ন হইতেছে। বুদ্ধিসত্ত্বই বিবিধ আকারে বা সুখদুঃখাদি আকারে পরিণত হইতেছে, আর পুরুষ তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইতেছেন। চন্দ্রপ্রতিবিম্বিত স্বচ্ছ জল

যেমন চন্দ্রতুল্য বা চন্দ্রাকারপ্রাপ্ত হয়, চৈতন্যপ্রতিবিম্বিত বুদ্ধিবৃত্তিও তেমনি চৈতন্যতুল্য বা চৈতন্যাকার প্রাপ্ত হয়। এতাদৃশ তুল্যাকার প্রাপ্ত হওয়ার নাম ভোগ।

রক্তবর্ণ জবা আর স্বচ্ছ স্ফটিক একত্র থাকিলে জবার রক্তবর্ণ স্ফটিকে আসিয়া লালবর্ণ দেখায়, কিন্তু স্ফটিক রক্তবর্ণ নহে; সেইরূপ আত্মচৈতন্য নিকটে থাকাতে চৈতন্যছায়া বুদ্ধিতে পড়িল, বুদ্ধিও চৈতন্যাকার ধারণ করিল। বুদ্ধি চৈতন্যাকার ধারণ করিয়া, কর্ত্তা ভোক্তা হইয়া দাঁড়াইয়া সুখদুঃখ ভোগ করিতে লাগিল। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, আত্মা কর্ত্তা ভোক্তা কিছুই নহেন, তিনি সচ্চিদানন্দ পদার্থ। হিংসা দ্বেষাদি দ্বারা বুদ্ধিই মলিন হয়, আত্মা নির্লিপ্ত, নির্ম্মল, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব। নির্ম্মল দর্পণ যেমন সকল বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে, বুদ্ধিও সেইরূপ রজঃ ও তমঃ গুণের উপদ্রবশূন্য হইলে সমস্ত বস্তুই প্রকাশ করিতে পারে। উপদ্রব-শূন্য অচঞ্চল দীপ যেমন ঠিক সমানাকারে প্রজ্বলিত হয়, রজঃ ও তমঃ গুণের উপদ্রবশূন্য নির্ম্মল চিত্তও তেমনি আত্মচৈতন্যের সন্নিধানে ঠিক সমানাকারে পরিণত হয়। নিত্যচৈতন্যস্বরূপ আত্মা, স্বচ্ছস্বভাব চিত্তে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রতিবিম্বিত হন বলিয়াই, অজ্ঞ লোকেরা অবিবেক বশতঃ চিত্তকে আত্মা বলিয়া প্রতিপন্ন করে। নিত্যচৈতন্য নামক পরমাত্মা চিত্তসত্ত্বে প্রতিবিম্বিত হন, ইহাতে একটি সদর্থ লাভ হইতেছে। কোনও বস্তু কোনও স্বচ্ছ বস্তুতে তদাকারে দৃষ্ট হইলে সেই দৃশ্যটাকে

লোকে প্রতিবিম্ব বলে ; কেননা সেই দৃশ্যটি বিম্বের সদৃশ প্রতিচ্ছায়া, সুতরাং স্বতন্ত্র বস্তু নহে। নিত্যচৈতন্য আত্মা যে বুদ্ধিসত্ত্বে প্রতিবিম্বিত হইতেছেন, সেই ছায়াটি ঠিক সেই নিত্য-চৈতন্যের সদৃশ বা অনুরূপ। অতি ক্ষুদ্রতম আধারে অতিশয় নির্ম্মল এবং অত্যন্ত ব্যাপক পদার্থের প্রতিবিম্ব বা ছায়া জন্মিতে দেখা যায়। ইহার অধিক দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইবে না ; কারণ সকল ব্যক্তিই অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল জলে বৃহত্তম সূর্য্যপ্রতিবিম্ব দেখিয়াছেন এবং সেই সঙ্গেই নির্ম্মল সর্ব্বব্যাপক আকাশের প্রতিবিম্বও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; সূর্য্যপ্রতিবিম্বিত জলাংশ যেমন অবিবেকীর দৃষ্টিতে সূর্য্যাকারে দৃষ্ট হয়, গণ্য হয় বা সূর্য্যপরি-মিত বলিয়া বোধ হয়, আত্ম-প্রতিবিম্বিত বুদ্ধিসত্ত্বও তেমনি অবিবেক-দশায় চেতন বলিয়া গ্রাহ্য হয়।

চিত্ত

শক্তি কার? শক্তিমানের। শক্তিমান্ কে? চিৎ। বিশ্বের সমস্ত পদার্থ যখন জড় দেখা যাইতেছে, তখন শক্তিও জড়। জগতে দুইটি পদার্থ অনুভূত হয়—এক চিৎ আর জড়। হয় জড় চৈতন্যাশ্রিত, না হয় চৈতন্য জড়াশ্রিত; হয় চিৎ জড়ের উৎস, না হয় জড় চিতের উৎস; একটা বলিতেই হইবে। যাহা জড় বলিয়া অনুমান করি, তাহা স্থূলরূপে দৃশ্য জড়, সূক্ষ্মরূপে অবশ্যই শক্তিস্বরূপ।

এই জগৎ চিৎ ও শক্তির বিকাশ। উভয়েই বিভু, ওতপ্রোত ভাবে গ্রথিত রহিয়াছে। চিৎ-বক্ষে চিন্ময়ীর ক্রিয়াই এই বিশ্ব। চিৎ শক্তি ছাড়া নাই, শক্তিও চিৎ ছাড়া নাই, যেখানে শক্তি সেইখানেই চিৎ, যেখানে চিৎ সেইখানেই শক্তি, কেহ কাহাকে ছাড়িতে পারে না, যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি; অগ্নি আছে দাহিকা নাই বা দাহিকা আছে অগ্নি নাই, এরূপ হয় না। আবার অগ্নির দাহিকা শক্তি অগ্নি হইতে পৃথক্ কোনও তত্ত্ব নহে, অথচ স্বয়ং অগ্নিও নহে; সেইরূপ চিতের শক্তি, চিৎ হইতে পৃথক্ কোনও তত্ত্ব নহে; অথচ স্বয়ং চিৎও নহে; ইহারই নাম অচিন্ত্য ভেদাভেদ। চিৎ ও শক্তি পরস্পর একাত্মা, একমন, একপ্রাণ। কোনও কোনও পদার্থের চৈতন্যের প্রকাশ

বেশী, কোনও কোনও পদার্থের শক্তির প্রকাশ বেশী ; যেখানে শক্তি বলিয়া উল্লেখ করা হয়, সেখানেও চৈতন্যের যোগ আছে, যেখানে চৈতন্য বলিয়া উল্লেখ করা হয়, সেখানেও শক্তির যোগ আছে বলিয়া মনে করিতে হইবে। যখন চিৎ হইতে শক্তিকে পৃথক্ বলিয়া মনে করি, তখন চিৎ জ্ঞাতা, চিন্ময়ী জ্ঞেয়, চিৎ ভোক্তা, চিন্ময়ী ভোগ্যা ; অর্থাৎ শিব শক্তি, রাধা কৃষ্ণ, লক্ষ্মী জনার্দ্দন ইত্যাদি। চিৎ স্বানুভবপ্রসিদ্ধ।

চিৎ আছে কি না, তাহার প্রমাণ বেশ আছে। তাহার প্রমাণ আমি ; আমি ছাড়া জীব নাই, যাহার আমি আছে তাহারই চেতন আছে, যাহার চেতন আছে তাহারই আমি আছে—সেই আমিই চিৎ। আমাদের স্ব স্ব আত্মা আছে, ইহা পরম সত্য। সেইজন্য আমি আছি, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যদি কোনও ব্যক্তি বলে আমি নাই, সে যদি বাস্তবিকই না থাকে, তবে আমি নাই, এ কথা বলিতেছে কে ? সুতরাং চিৎ আছে। আমি চিন্তা করি, এইহেতু আমি আছি। চিন্তা আত্মার স্বীয় গুণ, এইহেতু চিন্তা দ্বারা আত্মার বা চিতের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।

বিশ্বের এমন একটা অবস্থা আসিবে, যখন ইহার কিছুই থাকিবে না, কেবলমাত্র জ্ঞান ও চিৎ বিরাজমান থাকিবে। আমরা বিশ্বে যাহা কিছু পদার্থ অনুভব করি, সকলেরই মূল এই তিনের একাধার অর্থাৎ তাহাই বিশ্বমূল বা বিশ্ববীজ। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের পার্থক্য-অনুভব পদার্থই জ্ঞান। যে শক্তি দ্বারা

জ্ঞাতার সহিত জ্ঞেয় বস্তুর সংযোগ হয়, তাহার নাম জ্ঞান-শক্তি।

জ্ঞান স্বপ্রকাশ। জ্ঞান প্রকাশ-স্বভাব হেতু বিবিধ বাহ্য বস্তুর গ্রাহক বা প্রকাশক; সেইজন্যই বস্তু সকল জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হয়। জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোনও বস্তু প্রকাশ-স্বভাব নহে। একই জ্ঞান বুদ্ধিরূপ উপাধি দ্বারা ভ্রান্ত ও নানাপ্রকার কল্পিত হইয়া থাকে। একই জল নানা বস্তুতে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানাপ্রকার প্রতিবিম্ব উৎপাদন করিলেও, জল যেমন নানাপ্রকার হয় না, জল সেই একই জল থাকে, সেইপ্রকার একই জ্ঞান নানা বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া, নানারূপে প্রতিভাত হইলেও জ্ঞানরূপে একই ভাবে থাকে।

বুদ্ধি কাল বা আধার-জ্ঞানের জননী নহে। কিন্তু আধার ও কালের ভাব-বোধ আমাদিগের আত্মগত বিজ্ঞানশক্তির সামর্থ্যে বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া স্বতঃসিদ্ধভাবে জ্ঞানরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। জ্ঞানমাত্রেরই মূলে "বিবেক" নামক পদার্থ আছে। বিবেক অর্থাৎ ভেদজ্ঞান। সকল জ্ঞানেরই মূলে এই ভেদজ্ঞান দেখিতে পাওয়া যায়; ভেদ জ্ঞান না থাকিলে জ্ঞানের সম্যক্ উপলব্ধি হইত না। এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুর পার্থক্য-অনুভবই জ্ঞান। জগতে যদি একপ্রকার পদার্থই থাকিত, তাহা হইলে জ্ঞানের আবশ্যক হইত না। এক পদার্থকে অন্য পদার্থ হইতে, বৃক্ষ হইতে পশুকে, ভিন্ন বলিয়া অনুভব করাই জ্ঞানের কার্য্য। যদি একপ্রকার পদার্থ হইত,

বৃক্ষাদি না হইয়া পশুই যদি জগৎময় হইত, তাহা হইলে চিন্তা শক্তির বিভিন্নতার আবশ্যক হইত না। বিনা চিন্তায় জ্ঞানের উৎকর্ষ হইত না। জ্ঞানের বিভিন্নতাই জগৎকে এত উন্নতিশীল করিয়াছে। নিত্য নূতন চিন্তা, নিত্য নূতন জ্ঞান আবিষ্কৃত হইতেছে। যদি সংসারে এক ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু না থাকিত, তাহা হইলে জ্ঞানই অসম্ভব হইত।

অগ্নি ও দাহিকা শক্তিতে যেমন অভেদ, চৈতন্য ও জ্ঞানে সেইপ্রকার অভেদ; সুতরাং চিৎও যাহা, জ্ঞানও তাহা, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। জগতে যেখানে যাহা আবশ্যক, অন্তর্নিহিত জ্ঞানের দ্বারা তাহাই সমুৎপন্ন হইতেছে। সমস্ত বিশ্বে আকর্ষণ বিকর্ষণ কার্য্য চলিতেছে। কি চেতন, কি অচেতন, সকলে-তেই আকর্ষণ বিকর্ষণ ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইতেছে। চেতন পদার্থ ভালবাসা ও স্নেহ মমতা দ্বারা অন্য চেতন পদার্থকে আকর্ষণ করিতেছে ;- হিংসা ঘৃণা দ্বারা বিকর্ষণ করিতেছে। জড়েতেও তাহাই; জড়ও এক পদার্থকে আকর্ষণ করিতেছে, অন্য পদার্থকে ত্যাগ করিতেছে ; পৃথিবী পার্থিব পরমাণুকে আকর্ষণ করে, জল জলীয় পরমাণুকে আকর্ষণ করে, কিন্তু তৈজস পরমাণুকে ত্যাগ করে। পৃথিবী গাছ হইতে আমকে আকর্ষণ করিতেছে, সেই-জন্য তাহার অধোগতি ; সূর্য্য অগ্নিকে আকর্ষণ করিতেছে, সেই-জন্য তাহার ঊর্দ্ধগতি। ত্যাগ, গ্রহণ, আকর্ষণ, বিকর্ষণ—ক্রিয়ার রূপ। কি ত্যাজ্য, কি গ্রাহ্য, তাহা না জানিলে, কাহাকে আক-র্ষণ, কাহাকে বিকর্ষণ করিতে হইবে, তাহা নিশ্চিত না হইলে,

ত্যাগ গ্রহণ বা আকর্ষণ বিকর্ষণ-মূলক কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। ভৌতিক পদার্থসমূহ যখন আকর্ষণ বিকর্ষণ করে, তখন ইহাদের রাগ ও দ্বেষ আছে বলিতে হইবে। রাগ দ্বেষের অনুভব জড়ের ধর্ম্ম নয়, বাস্তবিক তাহা জ্ঞানেরই ধর্ম্ম ; সুতরাং বলিতে হইবে জড়েরও জ্ঞান আছে। অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে, প্রকৃতি অজ্ঞানা নয়, বস্তুতঃ সজ্ঞানা ; জড়া নয়, চেতনা ; সুতরাং বিশ্ব জ্ঞানময় ; যে কারণে জ্ঞানময়, সেই কারণে চিন্ময়।

একমাত্র যে জ্ঞান, তিনিই আত্মা এবং পরম প্রীতির আস্পদ হেতু ,তিনিই পরমানন্দ। জ্ঞান ও চৈতন্যের সত্তা বশতঃ জ্ঞ নামক চেতন পদার্থের অনুমান সিদ্ধ হয় ; তাহা যে কেবল অনুমানসাপেক্ষ তাহা নহে, প্রত্যেক জ্ঞানের ক্রিয়াতে জ্ঞ নামক পদার্থকে সাক্ষাৎকার করিতেছি। বৈদান্তিকেরা তাহাকে আত্মা বলেন, সাংখ্যেরা তাহাকে জ্ঞ বা পুরুষ বলেন। আত্মা চর্ম্মচক্ষুর অগোচর, মনের অগম্য।

যখন 'আমি' ব্যবহারের স্থিরতা নাই, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে মানুষ আপনাকে চিনে না ; চিনিলে ঐরূপ হইত না। অজ্ঞানই উহার কারণ। অজ্ঞানের মোহে, বুদ্ধির প্রলোভনে, প্রকৃতির আলিঙ্গনে মুগ্ধ হইয়া সর্ব্বজ্ঞ অজ্ঞ হন ; ছিদ্রহীন হইয়া ছিদ্রবানের ন্যায়, দেহশূন্য হইয়া দেহবানের ন্যায়, অমর হইয়া মৃত্যুগ্রস্তের ন্যায়; নির্ব্বিকার হইয়া বিকারীর ন্যায়, পূর্ণ হইয়া অংশীর ন্যায়, অচল হইয়া সচলের ন্যায়, জন্মহীন হইয়া জন্ম-

বানের স্থায়, অমৃত হইয়া মৃতের স্থায়, নির্ভীক হইয়া ভীতের স্থায়, অক্ষর হইয়া ক্ষরের স্থায়, কালাধীন না হইয়াও কালাধীনের স্থায়, শুদ্ধ হইয়া অশুদ্ধের স্থায়, নির্গুণ হইয়া সগুণের স্থায়; শিব হইয়া জীবের স্থায় সংসারে বিচরণ করেন।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার বিভিন্নতা। পরমাত্মাতে সকল-ভাবাত্মক লক্ষণই বিদ্যমান আছে, সুতরাং জ্ঞাতৃত্ব ও জ্ঞেয়ত্ব যাহা আত্মাতে আছে, তাহা পরমাত্মাতেও আছে; পরমাত্মাতে মঙ্গল ভাবের একটুও অভাব নাই, কিন্তু অমঙ্গল ভাবের সম্পূর্ণ অভাব আছে; জ্ঞানের একটুও অভাব নাই, অজ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব আছে; স্বাধীনতার একটুও অভাব নাই, পরাধীনতার সম্পূর্ণ অভাব আছে; স্থায়ের একটুও অভাব নাই, অন্যায়ের সম্পূর্ণ অভাব আছে; সর্ব্বশক্তির একটুও অভাব নাই, অশক্তির সম্পূর্ণ অভাব আছে; এইরূপ পরমাত্মাতে ভাবের অভাব নাই, বরঞ্চ অভাবেরই অভাব আছে।

চিৎশক্তি ও প্রকৃতির একভাব। চিতের সহিত শক্তির বিভিন্নতা নাই, যেমন চিনির সহিত মিষ্টতার বিভিন্নতা নাই, চিনিময় মিষ্টতা, মিষ্টতাময় চিনি; সেইরূপ চিৎময় শক্তি, শক্তিময় চিৎ; আবার শক্তিময় প্রকৃতি, প্রকৃতিময় শক্তি। যে কোনও পদার্থ হউক বিনা আশ্রয়ে থাকে না; শক্তিও কোনও পদার্থ, সুতরাং তাহারও কোনও আশ্রয় আছে; তাহার যাহা আশ্রয়, তাহাই চিৎ। যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি, অগ্নিবক্ষেই আপন আসন নির্দ্দেশ করে, সেইরূপ চিন্ময়ী শক্তিও চিৎবক্ষে আপন

আসন নির্দ্দেশ করে। আশ্রয়ী হইতে আশ্রয় সূক্ষ্ম, যেমন সূক্ষ্ম বটবীজ, স্থূল বটবৃক্ষের আশ্রয়। চিৎ আশ্রয়, শক্তি আশ্রয়ী, আবার শক্তি আশ্রয়, প্রকৃতি আশ্রয়ী। মনে কর দুগ্ধ, নবনীত ও ঘৃত। দুগ্ধময় ননী, ননীময় ঘৃত ; ঘৃতময় ননী, ননীময় দুগ্ধ। দুগ্ধের সূক্ষ্মাবস্থা ননী, ননীর সূক্ষ্মাবস্থা ঘৃত ; ঘৃতের স্থূলাবস্থা ননী, ননীর স্থূলাবস্থা দুগ্ধ। দুগ্ধকে মথিত করিলে তাহার সূক্ষ্মাবস্থা ননী বাহির হয়, ননী মথিত করিলে তাহার সূক্ষ্মাবস্থা ঘৃত বাহির হয়। কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। এক্ষণে চিৎ, শক্তি ও প্রকৃতিকে ঘৃত, ননী, ও দুগ্ধস্থানীয় মনে কর। যাহা স্থূল তাহা প্রকৃতি, প্রকৃতির সূক্ষ্মাবস্থা শক্তি, শক্তির সূক্ষ্মাবস্থা চিৎ ; অথবা চিতের স্থূলা-বস্থা শক্তি, শক্তির স্থূল বিকাশ প্রকৃতি। ক্ষিতি একটি প্রকৃতি, গন্ধ তাহার শক্তি ; ক্ষিতিময় গন্ধ, গন্ধময় ক্ষিতি। ক্ষিতিতে এমন একটুও অংশ পাইবে না যাহাতে গন্ধ নাই, কারণ সূক্ষ্ম গন্ধসমষ্টির স্থূল বিকাশই ক্ষিতি। চিৎ ও শক্তি প্রত্যক্ষসাধ্য নয়, তাহা অনুভবগম্য। ক্ষিতি হইতে গন্ধ উঠাইয়া লইলে, ক্ষিতির অস্তিত্ব থাকে না ; এইপ্রকার অপ্-তেজাদি অনুমান করিবে।

চিন্ময় বিশ্ব। নাভিস্থান তাহার কেন্দ্র। কেন্দ্রই সকল পদার্থের মূল, শক্তি বা বীজ। যাহা কেন্দ্রে নাই, তাহা বিস্তারেও নাই। পদার্থ মাত্রেরই শক্তি আছে। প্রকৃতির যাহা কেন্দ্র, তাহাই তাহার শক্তি বা তাহাই তাহার বীজ অর্থাৎ চিৎ।

তত্ত্ববোধ

প্রকৃতিকে যত সূক্ষ্মাংশে বিভাগ কর, প্রত্যেক বিভাগেই কেন্দ্র থাকিবে এবং প্রত্যেক কেন্দ্রেই চিৎ ও শক্তি যুগলরূপে বিরাজিত ; চিন্ময় বিশ্বে চিৎ ছাড়া কিছুই নাই। চিৎকে সকল ভূতের সনাতন বীজ বলিয়া জানিবে। বৃক্ষের বীজ অঙ্কুর উৎপন্ন করিয়া নষ্ট হয়, কিন্তু চিৎ-বীজ বিশ্বাঙ্কুর উৎপাদন করিয়া নষ্ট হয় না বলিয়া সনাতন বীজ। এই বীজ হইতে স্ফুরিত ব্রহ্মাণ্ড-বৃক্ষই কালে বিনষ্ট হয়, কিন্তু বীজ-ভূত ভগবান্ স্বরূপ-অবস্থাতেই থাকেন ; তাহাতেই বেশ বুঝা যায় যে, চিৎ সনাতন বীজ, ইনিই সর্ব্বমূল, সর্ব্বব্যাপী, ইহা ছাড়া কিছুই নাই।

তত্ত্বসার

বিক্ষেপ কার ? পূর্ণতা নাই যার। যেমন অপূর্ণ কলসীর জল নড়ে, কিন্তু কলসী পূর্ণ থাকিলে নড়ে না অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত হয় না। যাঁহার জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ, যিনি পূর্ণ-প্রাজ্ঞ, তাঁহার চঞ্চলতা হইবে কেন ? শক্তির রজোগুণ হইতে বিক্ষেপ উপস্থিত হয় ; শক্তি যাহার বশ, রজোগুণ যাহার কাছে দমিত, সুতরাং সে শমিত, সেইজন্য বিক্ষেপরহিত, পূর্ণজ্ঞানী, পূর্ণপ্রাজ্ঞ।

জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ জগৎ-কারণ আর কেহই নাই। জ্ঞান হইতে কোনও পদার্থই পরমার্থতঃ সত্য বা স্বতন্ত্র নহে। মণি-সমূহ যেমন সূত্রে গ্রথিত থাকে, সেইরূপ নিখিল বিশ্ব সংসার জ্ঞানকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। এক চিৎই প্রকৃতিযোগে জগদুৎপত্তি ও বিনাশের হেতুভূত হইয়া, তিনিই মায়িক জগতে মায়া-লীলা করিয়া থাকেন্। যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে, সমস্তই তিনি ভিন্ন আর কিছু নহে। যেখানে দেখ সেই খানেই, ও যাহা দেখ তাহাই ভগবৎসত্তা ভিন্ন আর কিছুই নাই। রসই জলের মূলতত্ত্ব, রসই জলের সার, ভগবান্ বলেন উহা আমিই। চন্দ্র-সূর্য্যের প্রভা, বেদের প্রণব, আকাশের শব্দ, পৃথিবীর পুণ্য গন্ধ, অগ্নির তেজ, প্রভৃতি সমস্তই ভগবানের সত্তা।

তত্ত্ববোধ

প্রকৃতি ও পুরুষকে আমরা একটি আশ্চর্য্য সম্বন্ধসূত্রে জড়িত দেখিতে পাই, তাহারই ফল ব্যক্ত সংসার। পুরুষের যে জ্ঞান, তাহা প্রায় সম্পূর্ণ প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধজনিত। এই জ্ঞানের ফলে সুখ ও দুঃখের উৎপত্তি, ঐ সম্বন্ধের ফলে আত্মায় ইচ্ছাশক্তির বিকাশ। ইচ্ছার বিকাশে কার্য্যে প্রবৃত্তি, ঐ কার্য্যপ্রবৃত্তি দ্বারা প্রকৃতিকে চালিত হইতে দেখা যায়। উভয়েই উভয়ের উপর ক্রিয়া উৎপাদন করিতেছে। জ্ঞান-পদার্থ কখনও নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে না ; জ্ঞান কোন না কোন চিন্তা, কোন না কোন অনুভূতি-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবেই থাকিবে।

প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ ও অসংযোগে যে কিছু পার্থক্য আছে, তাহা বোধ হয় অল্প অনুমানেই বুঝা যায়। একটা পদার্থের সহিত অন্য একটা পদার্থের যোগ হইলে, অযোগ-অবস্থার সহিত কিছু না কিছু, কোন না কোন বিষয়ে, কোন না কোন গুণে পার্থক্য হইবেই। আত্মা যখন একা ছিলেন, প্রকৃতি-মুক্ত ছিলেন, তখন তাঁহার বিশুদ্ধ জ্ঞান, তখন তাঁহার বিশুদ্ধ চৈতন্য, তখনকার অবস্থা পূর্ণ জ্ঞান। যখন অজ্ঞান প্রকৃতির সংযোগ হইল, অবশ্যই তখন তাঁহার বিশুদ্ধ জ্ঞান কিছু মলিন হইল, কিছু বিকৃত হইল ; যখন অচৈতন্য প্রকৃতির যোগ হইল, অবশ্যই শুদ্ধ চৈতন্য কিছু অশুদ্ধ হইল ; সেই যে আদি বিকৃত অশুদ্ধ জ্ঞান, তাহা একখানি দর্পণের স্বরূপ। দর্পণে যেমন বস্তু প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ জ্ঞানেও বিশ্ব প্রতিবিম্বিত হয়।

যে জ্ঞানে আবরণ-বিক্ষেপাদি রহিয়াছে, তাহা অপূর্ণ জ্ঞান। আর যে জ্ঞানে আবরণ-বিক্ষেপাদি নাই, তাহাই পূর্ণ জ্ঞান। সেই পূর্ণ জ্ঞান যাহাতে আছে, তিনি মহাপ্রাজ্ঞ। জ্ঞান আবৃত হয় কিসের দ্বারা? মোহের দ্বারা। কেন মোহের আক্রমণ? শক্তিচ্যুত বলিয়া। কেন শক্তিচ্যুত? বীর্য্যচ্যুত বলিয়া। এই কারণে সে হীনশক্তি হইয়াছে, সুতরাং মোহশক্তি তাহাকে আবরণ করিয়া ফেলিয়াছে, অভিভূত করিয়াছে। আর যিনি বীর্য্যচ্যুত হন নাই, তিনি শক্তিহীনও হন নাই, পূর্ণ শক্তিমান্‌ই রহিয়াছেন; সুতরাং সেই শক্তি তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই, পূর্ণ প্রাজ্ঞই রহিয়াছেন।

ঐশ্বর্য্য—অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িতা, এই অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য বা শক্তি। যাহা ঐশ্বর্য্য তাহাই শক্তি, যাহা শক্তি তাহাই ঐশ্বর্য্য। ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শক্তি। শক্তি আয়ত্ত যার, ঐশ্বর্য্য আয়ত্ত তার। যে যেরূপ শক্তিশালী, সে সেইরূপ ঐশ্বর্য্যবান্। যাতে শক্তি পূর্ণ, তাতে ঐশ্বর্য্য পূর্ণ; যাতে শক্তি অপূর্ণ, তাতে ঐশ্বর্য্যও অপূর্ণ।

বিশ্ব একটি যুদ্ধক্ষেত্র। ইহার যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই দেখি যুদ্ধ। আব্রহ্ম পিপীলিকা সকলেই যোদ্ধা—পরস্পর সকলেই যুদ্ধে ব্যাপৃত। রাজায় রাজায় যুদ্ধ, প্রজায় প্রজায় যুদ্ধ, রাজা প্রজায় যুদ্ধ, দেব দৈত্যে যুদ্ধ, পশুতে পশুতে যুদ্ধ, নর বানরে যুদ্ধ, নরে পশুতে যুদ্ধ, পক্ষীতে পক্ষীতে যুদ্ধ; সকলেই যুদ্ধ লইয়া ব্যস্ত। মাতৃগর্ভে প্রবেশ হইতে মৃত্যু,

পর্য্যন্ত কোনও প্রাণীরই এক মুহূর্ত্তের জন্যও যুদ্ধে বিরাম বিশ্রাম নাই। মাতৃগর্ভে যেই প্রবেশ করিল, অমনি কৃমিকীটে আসিয়া দংশন করিতে লাগিল। সেই কামড় তোমাকে সহ্য করিতে হইল, অথবা হাত পা ছুড়িয়া তাহা তাড়াইলে; এইপ্রকার অনবরত যুদ্ধে গর্ভবাস কাটাইলে। তাহার পর ভূমিষ্ঠ হইলে। ভূমিষ্ঠ হইয়াও যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যেই ভূমিষ্ঠ হইলে, অমনি প্রাকৃতিক শক্তি ক্ষুধা তৃষ্ণা আসিয়া আক্রমণ করিল, ক্ষুধা তৃষ্ণার তাড়নে তুমি কাঁদিয়া আকুল, যুদ্ধে পারিলে না—হারিয়া গেলে, মায়ের শরণ নিলে। কখনও কখনও মশা, মাছি, পিপী-লিকা আক্রমণ করিয়া কত যাতনা দিয়া থাকে, সকলই সহ্য করিতে হয়। এই প্রকারে বাল্য গেল, যৌবন আসিল; এই কালে কাম, ক্রোধ, অভিমানাদির আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইতে লাগিলে, জীবনসংগ্রাম দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিল, হংসপুচ্ছ সহিত মসীযুদ্ধ আরম্ভ হইল, অর্থাৎ লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করিলে। অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া অদৃষ্ট-অনুযায়ী বিদ্যা শিক্ষা হইল। তাহার পর অর্থলালসা বড়ই প্রবল হইয়া উঠিল, নানা উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিতে কতই যুদ্ধ করিতে হইল। কাহাকেও বা কোনও অজ্ঞাত প্রদেশে যাইয়া বর্ম্ম ধারণ করিয়া যুদ্ধার্থ ধাবিত হইতে হইল; এই ভাবে যৌবন কাটিল। আসিল বার্দ্ধক্য; বৃদ্ধাবস্থায় শক্তির হ্রাস হেতু ব্যাধি জরা আক্রমণ করিল, সেই আক্রমণ নিবারণ করিতে পারিলে না—যুদ্ধে হারিলে, অমনি মৃত্যু আসিয়া হাত ধরিল; তুমি যাইবে

স্না, সেও ছাড়িবে না, অবশেষে তোমাকে হার মানিয়া তাহার সহিত যাইতে হইল; এখন বল দেখি, কোন্ মুহূর্ত্তে তোমার যুদ্ধের বিরাম ছিল? শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বাত, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম, ক্রোধ প্রভৃতির সহিত অনবরত যুদ্ধ চলিতেছে। কখনও তুমি হারিতেছ, সে জিতিতেছে; কখনও সে হারিতেছে, তুমি জিতিতেছ। জীবনসংগ্রামে কত জনকে পরাজয় করিয়াছ, কত জনের কাছে পরাজিত হইয়াছ, তাহার ইয়ত্তা নাই। আব্রহ্ম কীট সকলেরই এই দশা। বিশ্ব-রণভূমে প্রাণী মাত্রেই যোদ্ধা।

জগৎ দুই ভাগে বিভক্ত;—এক অন্তর্জগৎ, আর এক বহির্জগৎ। যোদ্ধাও দুই ভাগে বিভক্ত;—এক অন্তর্যোদ্ধা, আর এক বহির্যোদ্ধা। অন্তর্জগতের যোদ্ধা শুক, নারদ, সনক, গৌতম, বশিষ্ঠদেব প্রভৃতি। ইহারা কাম-ক্রোধাদির সহিত সর্ব্বদাই যুদ্ধ করিয়াছেন, কখনও জয়ী হইয়াছেন, কখনও বিজয়ী হইয়াছেন। বহির্যোদ্ধা দেব দৈত্য প্রভৃতি। ইহারাও কখনও জয়ী, কখনও বিজয়ী হইয়াছেন। হরি হর বিরিঞ্চি প্রভৃতি যাঁহারা আদি শক্তিমান্, যাঁহাদিগকে আমরা অজেয় মনে করি, তাঁহারাও দৈত্যযুদ্ধে কতবার হারিয়া পলায়ন করিয়াছেন, তাহার ঠিক নাই। ইহাতে বেশ জানা যায় যে, সংসার-রণভূমে কেহই অজেয় নাই, শক্তি কর্ত্তৃক সকলেই পরাভূত। তবে কি শক্তি কর্ত্তৃক অজেয় কোনও শক্তি নাই? বিশ্বে কি এমন কোনও শক্তি নাই, যে শক্তি শক্তিকে জয় করিয়াছে?

শ্রমাদি-গ্লানিযুক্ত যিনি, তিনিই পরাভবনীয়। দুই শক্তির মধ্যে যে পক্ষ শ্রমে কাতর হইবে, সে পক্ষই ক্লান্তিরহিতের সহিত পরাজিত হইবে। গ্লানিরহিত যিনি, তিনি অনবরত অনন্তকাল শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিবেন। যিনি খেদান্বিত, তিনি অনবরত শক্তি চালনা করিতে পারিবেন না এবং সেই শক্তি ধারণেও সমর্থ হইবেন না। শ্রমহীনের নিকট শ্রমান্বিতকে পরাজয় স্বীকার করিতেই হইবে। শ্রমরহিত যিনি, তিনিই বিজয়ী; শ্রমান্বিত যিনি তিনিই জয়ী। যিনি বিচলিত হন না, তিনিই জয়ী। ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকিলেই শক্তির হ্রাস অনুমেয়। কার্য্যে শ্রম হেতু, শক্তিহ্রাস-কালে, ক্ষুধা তৃষ্ণায় বিচলিত করে। কার্য্যে শ্রমরহিতের শক্তিহ্রাসরূপ কারণ নাই, ক্ষুধারূপ কার্য্য নাই, সুতরাং অবিচলিত, সেইজন্য জয়ী।

যিনি দেহভেদ-দাহাক্রান্ত, তিনি বিজয়ী। অস্ত্রে শস্ত্রে যাঁহার দেহভেদ করে, যাঁহাকে অগ্নিতে দাহ করে, বায়ুতে শোষণ করে, তিনি জয়ী হইতে পারেন না, তাঁহাকে অবশ্যই পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে। যিনি দেহভেদ-দাহের অতীত, অস্ত্র-শস্ত্রের অনধীন, তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয় না, সেইজন্য তিনি জয়ী।

ক্ষুধা তৃষ্ণা কার? শক্তিহ্রাস যার। কোন্ পদার্থের নাম ক্ষুধাতৃষ্ণা? শক্তিমাপক যন্ত্রের নাম ক্ষুধাতৃষ্ণা। শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি অপচয় যাহা দ্বারা ওজন হয়, তাহারই নাম ক্ষুধা, এবং তৃষ্ণাও সেইরূপ শক্তির রস-শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি-অপক্ষয়-পরিমাপক যন্ত্র।

ক্ষুধা দ্বারা কি বুঝা যায় ? ক্ষুধা পাইলে বুঝা যায় শক্তির হ্রাস হইয়াছে। অত্যন্ত ক্ষুধা পাইলে শরীর দুর্ব্বল বোধ হয়, শরীর কাঁপিতে থাকে। ক্ষুধা জানাইতেছে যে, তোমার শক্তির হ্রাস হইয়াছে, তাহা পূরণ কর ; অমনি বাহ্য পদার্থ হইতে শক্তি সংগ্রহ করিবার জন্য তাহাকে পাকযন্ত্রে পরিপাক করাইয়া তাহা হইতে শক্তি আহরণ করিতে হয়। যাহার শক্তির হ্রাস হইয়াছে, তাহারই ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে। যাহার ক্ষুধার ইচ্ছা হইয়াছে, তাহারই শক্তিহ্রাস হইয়াছে, ইহা নিশ্চয়। বিশ্বে এমন কে আছে, যে ক্ষুধাতৃষ্ণাবর্জ্জিত ? কেহই নাই অর্থাৎ কোনও জীব বা কোনও পদার্থই নাই। আব্রহ্ম কীট সকলেই ক্ষুৎ-পিপাসা-যুক্ত। দেবতারা সকলেই যজ্ঞভুক্। কেহ দীর্ঘ-কাল পরে প্রচুর আহার করেন, কেহ অল্প আহারে সন্তুষ্ট, এই মাত্র প্রভেদ। ক্ষুধা তৃষ্ণা জীবব্যাপী। ক্ষুধা তৃষ্ণা জয় করিয়াছে, এমন কোনও প্রাণী নাই। সমস্ত জীব এবং উদ্ভিদ প্রভৃতি ক্ষুধাতৃষ্ণার অধীন।

ক্ষুধা তৃষ্ণাকে যিনি জয় করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বজয়ী এবং পূর্ণশক্তিমান্। পূর্ণশক্তিমানের শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি নাই, সুতরাং ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই। পূর্ণশক্তির ক্ষুধা কোথায়? পূর্ণরসের তৃষ্ণা কোথায় ? তবে কি যাঁহারা পূর্ণ, তাঁহারা কিছু আহার করেন না ? হাঁ, তাঁহারা আহার করেন লৌকিক ব্যবহারের জন্য, ইচ্ছা করিলে তাঁহারা না খাইয়া থাকিতে পারেন। তাঁহারা পূর্ণতৃপ্ত। পূর্ণতৃপ্তের ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না। ক্ষুধাতৃষ্ণাবর্জ্জিত পূর্ণ

তত্ত্ববোধ

শক্তিশালী অচ্যুত ভগবানের ভক্তেচ্ছায় ক্ষুধা জন্মে ; ভক্ত যত দিতে পারেন, তিনিও ততই খাইতে পারেন, না দিলে না খাইয়া থাকিতে পারেন। সেইরূপ পূর্ণশক্তিশালী যাঁহারা, ক্ষুৎশক্তি যত ইচ্ছা বাড়াইতে পারেন, আবার যত ইচ্ছা কমাইতে পারেন। ক্ষুৎশক্তি এত বাড়াইতে পারেন যে, অনন্ত-কাল বসিয়া অনন্ত বিশ্ব খাইতে থাকিলেও ক্ষুধার নিবৃত্তি হইবে না ; আবার এত কমাইতে পারেন যে, অনন্তকাল না খাইলেও ক্ষুধার উদ্রেক হইবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কুমার দেবব্রত

গমধাতু-নিষ্পন্ন হইয়া গঙ্গা হইয়াছে; যাহা গমন করে তাহাই গঙ্গা। যে শক্তি গাঙ্গেয়কে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, তাহারই নাম গঙ্গা অথবা গাঙ্গেয়কে শক্তি প্রদান করিবার জন্য ভারতে গমন হেতু গঙ্গা নাম হইয়াছে। কথিত আছে, গোলোকে রাধাকৃষ্ণ হরগৌরীর গানে দ্রবীভূত হওয়াতে গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে।

রাধাকৃষ্ণ চিৎশক্তি-সমন্বিত ব্রহ্মপদার্থ, হরগৌরীর গান অর্থে শব্দব্রহ্ম; ইহাতে বুঝা যাইতেছে, শব্দব্রহ্ম কর্ত্তৃক মথিত হইয়া ব্রহ্মের দ্রবীভাব অবস্থাই গঙ্গা, সুতরাং গঙ্গা চিৎশক্তিসমন্বিত ব্রহ্মপদার্থ। শক্তিগর্ভে যেমন শক্তিমান্ বিরাজিত রহিয়াছেন, সেইরূপ আদ্যা শক্তি পতিতপাবনী গঙ্গার গর্ভেও পূর্ণশক্তিমান্ পতিতপাবন বিরাজিত রহিয়াছেন, তাঁহারই নাম গাঙ্গেয়। যেমন দুগ্ধগর্ভে নবনীত রহিয়াছে, মথিত না হইলে তাহার বিকাশ হয় না, সেইরূপ গঙ্গা মথিত না হওয়া পর্য্যন্ত গঙ্গা-গর্ভস্থিত গাঙ্গেয়শক্তিরও বিকাশ হইতেছে না। এই শক্তি-মথনের পাত্র কে? সুরধুনী দেখিলেন, পরাধীন বদ্ধসৃষ্টি সুর-

লোকে তাঁহার উপযুক্ত পাত্র নাই, সুতরাং স্বাধীন মুক্তস্পৃষ্টি আর্য্যগলায় বরমাল্য অর্পণ করিলেন।

প্রকৃতি কোন্ পুরুষকে আলিঙ্গন করিলেন? শান্তনুকে। কোন্ পদার্থের নাম শান্তনু? সর্ব্বপ্রকার-অহঙ্কারবর্জ্জিত যে ব্রহ্মভাব, তাহাই শান্তভাব। যাহা সুখ, দুঃখ, চিন্তা, দ্বেষ, রাগ, কামাদি ইচ্ছাবর্জ্জিত, সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত, এবং যে ভাব সামান্যমাত্র স্পর্শ হইলেও নিরানন্দকে সদানন্দ, বৃদ্ধকে তরুণ করে, এবং যাহা অশান্তিভাবকে শান্তি দেয়, তাহাই শান্তভাব। এই শান্তভাব যে তনুকে আশ্রয় করিয়া আছে, তাহাই শান্তনু; ইহা দ্বারা শান্তনু শব্দে ব্রহ্মই বুঝা যাইতেছে। সমস্তই ব্রহ্ম; স্থাবর বল, জঙ্গম বল, প্রকৃতি বল, পুরুষ বল, সমস্তই ব্রহ্মপদার্থ। এক ব্রহ্মই দ্বিধা বিভক্ত হইয়া প্রকৃতি ও পুরুষরূপ ধারণ করিলেন; সুতরাং প্রকৃতিও ব্রহ্ম, পুরুষও ব্রহ্ম। প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগে বিশ্বের উৎপত্তি, সুতরাং তাহাও ব্রহ্ম। কাজে কাজেই বলিতে হয়, ব্রহ্মই ব্রহ্ম কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া ব্রহ্মই প্রসব করিতেছেন।

পূর্ণই পূর্ণ স্বরূপকে যথাক্রমে উদ্ধার, নির্ম্মাণ ও সংহার করেন, সুতরাং পরিণামে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। সেইজন্য বলা যাইতে পারে, গঙ্গা ব্রহ্ম, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াছে। যে শান্ত-ভাব তনু, তাহাও ব্রহ্ম, সেইজন্য প্রসূত পদার্থও ব্রহ্ম; সুতরাং বলা যাইতে পারে, গঙ্গা ব্রহ্ম কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া ব্রহ্মকে প্রসব করিলেন, তাহারই নাম গাঙ্গেয়। ব্রহ্মের প্রাণস্বরূপ এক•

কুমার দেবব্রত

দেহ এক আত্মার ন্যায় দ্বিতীয় ব্রহ্ম হৃদয়ে লীন ছিল, তাহা শব্দব্রহ্ম কর্ত্তৃক মথিত হইয়া গঙ্গাগর্ভে অবস্থিতি করিতেছিল, তাহা শান্তনু কর্ত্তৃক মথিত হইয়া বিশ্বকেন্দ্র ভারতে, শক্তিকেন্দ্র আর্য্যাতে অবতীর্ণ হইলেন; সুতরাং বলা যাইতে পারে, ব্রহ্ম-পদার্থই ব্রহ্ম কর্ত্তৃক মথিত হইয়া, ব্রহ্ম কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া, ব্রহ্মগর্ভ ভেদ করিয়া প্রকাশিত হইলেন। পৌরাণিক ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার গর্ভে "কুমার দেবব্রত গাঙ্গেয়" জন্মগ্রহণ করিলেন।

সিদ্ধাশ্রম

ব্রহ্মবিদ্যা-অভ্যাস-জনিত্ তেজঃপ্রভাবে আশ্রমমণ্ডল মাত্রেই এমনই সমুজ্জ্বল হইয়াছে যে, গগনতলস্থিত প্রদীপ্ত সূর্য্য-মণ্ডলের ন্যায় উহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাও নিতান্ত দুঃসাধ্য। সমস্ত আশ্রম এতাদৃশ সুশ্রী ও অতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন যে, সকল প্রাণীই তথায় সুখে বাস করিতে পারে। ইহার রমণীয়তা দর্শনে অপ্সরাগণ ইহার সন্নিহিত প্রদেশে নৃত্যাদি করিয়া থাকে এবং তাহারা সময়ে সময়ে আশ্রমস্থিত ঋষিগণের সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকে। বিস্তৃত অগ্নিহোত্রগৃহ, অতি সুদৃশ্য পবিত্র মনোমোহকারী বিবিধ ফলমূল সকল এই আশ্রম-মণ্ডলের সর্ব্বত্রই শোভা সম্পাদন করিতেছে। যে সকল বৃক্ষে নানাপ্রকার পবিত্র সুস্বাদু ফল উৎপন্ন হয়, তাদৃশ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আরণ্য বৃক্ষে ইহার চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। অভ্য-ন্তর ভাগে বিচিত্র পুষ্পপাদপসমূহও অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। স্থানে স্থানে প্রফুল্ল-পঙ্কজ-পরিশোভিত সরসী সকল, সকলেরই নয়ন মন হরণ করিতেছে। ইহার চতুর্দ্দিক্ পবিত্র বেদধ্বনি দ্বারা অনুনাদিত। ব্রহ্মভূত মহাভাগ ব্রাহ্মণ-গণ ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পরিশোভিত এই আশ্রমমণ্ডল ব্রহ্ম-লোকের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। ইহার চতুর্দ্দিকেই নানাবিধ

মৃগগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে এবং সর্ব্বত্রই বিবিধ বিহঙ্গগণ মনোহর সুমধুর রব করিতেছে।

পূর্ব্বকালে কোনও সময়ে কুমার দেবব্রতকে লইয়া গঙ্গাদেবী বশিষ্ঠাশ্রমের চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, মহাতপা ধর্ম্মনিরত শান্তশীল ঋষিগণের অধিষ্ঠান বশতঃ ঐ আশ্রমপদ সর্ব্বদা সর্ব্বসমৃদ্ধির নিদান, সর্ব্বপুণ্যের অধিষ্ঠান, সর্ব্বকল্যা-নের আধার, সর্ব্বমঙ্গলের আস্পদ ও সর্ব্বতীর্থের একত্র সন্নিধান-স্বরূপ, সর্ব্বলোকসুখাবহ এবং সর্ব্বকাল রমণীয়তা পরিগ্রহ করিয়াছে। সকল ঋতু-সুলভ ফল ও কুসুম সকল সর্ব্বদা ফলিত ও বিকসিত হওয়াতে সকল-লোক-প্রার্থনীয়, সুষমা-লক্ষ্মীর নিত্য সান্নিধ্য বশতঃ ধরাতলে উহার কুত্রাপি উপমা লক্ষিত হয় না। পথশ্রান্ত দিক্‌ভ্রান্ত পথিক যেরূপ ক্রমাগত গমন করিতে করিতে একান্ত অবসন্ন হইয়া কোনও নিরাপদ আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে সহসা তাহা পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হয় না, সেইরূপ আশ্রমে প্রবেশ করিলে স্বর্গপ্রবিষ্টের ন্যায় পুন-রায় বহির্গমন-বাসনা দূরীভূত হয়। কোথা হইতে কিরূপে তপোবনের ঈদৃশ সর্ব্বলোকমোহিনী অসীম শক্তি সমুদ্ভূত হইল? মানুষ সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিব বলিয়া স্বকীয় অভিনব কল্পনা-বলে সাধ্যাতীত যত্ন ও পরিশ্রম-সহকারে প্রাণান্ত ও সর্ব্বস্বান্ত স্বীকার করিয়াও সুখ ও শান্তি সাধন জন্য কতই অভিনব বস্তুর উদ্ভাবন ও নির্ম্মাণ করে; প্রাসাদ, অট্টালিকা, উপবন, উদ্যান সৃষ্টি করিয়াও শ্রান্ত বা নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু তাহাদের সেই

তত্ত্ববোধ

অভিলষিত সুখ ও শান্তি কোথায় ? সুখ ও শান্তি কদাচ লোকালয়ের ঈর্ষাদ্বেষে পরিপূর্ণ, অহঙ্কার অভিমানে আকুলিত ও অনর্থক কল্পনায় বিষবৎ বিষমায়িত অতি দারুণ কোলাহলমধ্যে বাস করিতে পারে না।

মানুষ আকুল ও ব্যাকুল হইয়া মনের দুরন্ত আবেগে ইতস্ততঃ অভিমানপূর্ব্বক যতই অন্বেষণ করুক, কুত্রাপি তাহাদের সন্ধান পাইবে না। যেখানে তপস্যা, সাধুতা, অমৃত ও সাক্ষাৎ পরমার্থ অবস্থিতি করে, সুখ ও শান্তি সেই স্থানের নিবাসী হইয়া থাকে। বিষয়মধ্যে, বিভবমধ্যে, বিবাদ ও বিগ্রহমধ্যে, ঈর্ষা ও অসূয়ার মধ্যে, অপবাদ ও নিন্দার মধ্যে, স্বার্থপরতা, ও স্বকীয় পরিবারমাত্রের ভরণপোষণের মধ্যে অথবা তৎসদৃশ অন্যস্থানে সন্ধান করিলে, সেই সুখ ও শান্তির সাক্ষাৎকার কখনই সম্ভবে না। বলিতে কি, মানুষ যেরূপ সুখের অন্বেষণ করে, তাহাকে মত্ততা, ভ্রষ্টতা, অথবা তাহাকে দুঃখের অন্বেষণ ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না।

আমাদের কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস এই সম্বন্ধে রাজপ্রাসাদে ও তপোবনে কি বিভিন্নতা, তাহা দেখাইয়াছেন।—এই মহারাজ অত্যন্ত ভাগ্যবান্, ইঁহার লোকমর্য্যাদারও শেষ নাই, ইঁহার রাজ্যে চতুর্বর্ণের মধ্যে নিকৃষ্ট হইলেও কোনও ব্যক্তি অসদাচরণ করে না, তথাপি আমার মন আজীবন নির্জ্জন বন সেবা করিয়াছে বলিয়া জনপূর্ণ রাজপ্রাসাদ অগ্নি-আক্রান্ত গৃহের মত বোধ হইতেছে।

সিদ্ধাশ্রম

তপোবন, কেমন শান্তি-শীতলতা-পূর্ণ, আর রাজধানীতে রাজপ্রাসাদে কত অশান্তি। রাজপ্রাসাদবাসী ও তপোরণ্যবাসী কত বিভিন্ন, তাহা একটু বিবেচনার চক্ষে দেখিলেই, শান্তি ও অশান্তি এই দুই পদার্থের পার্থক্য বেশ বুঝা যায়। তৈল মাখিয়াছে যে ব্যক্তি তাহাকে দেখিলে, শুচি ব্যক্তি অশুচিকে দেখিলে, জাগরিত ব্যক্তি সুপ্তকে দেখিলে এবং স্বাধীন ব্যক্তি বদ্ধকে দেখিলে যেরূপ মনে করে, সংসারসুখে মগ্ন ব্যক্তিকেও তপোবনবাসীরা সেইরূপ মনে করেন। রামচন্দ্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভরতকে বলিয়াছিলেন—হে ভরত! পিতা আমাকে বড়ই ভাল বাসিতেন, সেইজন্য সুখময় যে অরণ্য, তাহাই আমার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কারণ নিশ্চিন্ত মনে শান্তিজীবনে আমি এখানে ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে পারিব; আর সভয়, সচিন্ত, অশান্তিময় রাজকার্য্যে তোমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন; এক্ষণে পিতার আজ্ঞা তোমার ও আমার পালন করা উচিত। আমি সুখবাস অরণ্য ত্যাগ করিয়া দুঃখবাস রাজপ্রাসাদে যাইব না।

আশ্রমের পাদপ সকল সুস্বাদু ফলভরে অবনত হইয়া, অতি বিনীত সাধুজনের অনুকরণ করিতেছে; বিকসিত কুসুমা-নত লতা সকল লজ্জাভরে বিনীত কুলবালার প্রতিযোগিতা করিতেছে; কলকণ্ঠ বিহঙ্গম সকল সুমধুর কলরব করিয়া, সৎ-কথার ন্যায় সকলেরই মন হরণ করিতেছে; অতিস্বচ্ছ-সলিল-গর্ভ জলাশয় সকল সাধুহৃদয়-সদৃশ সুনির্ম্মল প্রতিভা বিস্তার

করিতেছে ; সিংহব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ সকল চিরপরিচিত হিংস্র স্বভাব বিসর্জ্জনপূর্ব্বক পরস্পর ভ্রাতৃভাবে বিচরণ করিতেছে, চন্দ্র উহাতে নিত্য সুনির্ম্মল স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না বিকিরণ করিতেছে ; জলাশয় সকল নিত্য কমলাদি সুগন্ধি কুসুম প্রসব করিতেছে ; পাদপ সকল নিত্য সুমধুর ফল প্রদান করিতেছে ; অতি সুরভি মলয়ানিল নিত্য প্রবাহিত হইতেছে ; দিবাকর নিত্য অতিমাত্র সুখসেব্য কিরণ বিতরণ করিয়া সকলের চিত্তবিনোদন সাধন করিতেছে ; তথায় রোগ নাই, শোক নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, আধি নাই, ব্যাধি নাই, শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, চিন্তা নাই, বিষাদ নাই ; সর্ব্বত্রই প্রীতি, আনন্দ, হর্ষ, বিকাশ, শান্তি, মাধুর্য্য ইত্যাদি সাক্ষাৎ বিগ্রহ পরিগ্রহপূর্ব্বক বিচরণ করিতেছে ; এবং ধর্ম্ম, সত্য, ন্যায়, ক্ষমা, দয়া প্রভৃতি যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাহাদের পোষণ ও বর্দ্ধন করিতেছে। সংসারের কোথায় এরূপ প্রদেশ আছে যে, এই তপোবনের সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে ?

কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না এবং আধার ব্যতিরেকে আধেয় থাকিতে পারে না, ইহা নিত্য সিদ্ধ সনাতন নিয়ম। এই নিয়মের ব্যভিচার-ঘটনা কদাচ সম্ভব নহে ; কিন্তু ঋষিগণের অসামান্য তপঃশক্তি তাহারও অন্যথা সাধন করে। আশ্চর্য্য দেখা যায়, তপোবনে নন্দন কানন নাই, কিন্তু আপনা হইতে পারিজাত প্রাদুর্ভূত ও বিকসিত হইতেছে ; কুবের-সরোবর নাই, আপনা হইতেই স্বর্ণপদ্ম প্রস্ফুটিত হইতেছে ;

ক্ষীরোদসাগর নাই, আপনা হইতেই অমৃত উদ্ভূত হইতেছে; বৈকুণ্ঠ বা গোলোক নাই, আপনা হইতেই কমলাদেবী বিরাজমানা হইতেছেন; মনুষ্যসুলভ দিবারাত্রি পরিশ্রম ও যত্নের সম্পর্ক নাই, আপনা হইতেই সিদ্ধি সমাগত হইতেছে; তথায় বাসনা বা কামনার নামমাত্র নাই, কিন্তু আপনা হইতেই পরম কাম্য-ফল পরিণত হইতেছে। যে কারণের যে কার্য্য, ঋষিগণের তপঃ-শক্তি তাহারও ব্যভিচার বিধান করে। তপোবলে বয়সের পরিণামেও লোকের পলিত বা গলিত দশা আপতিত হয় না, যৌবনের সমাগমেও কাম রাগ প্রাদুর্ভূত হয় না। বিষয়-বিভবের অভাব হইলেও সম্পন্নতার অভাব হয় না, এক পিতা হইতে জন্ম না হইলেও ভ্রাতৃভাবের অসদ্ভাব হয় না, সজাতীয় বা সবংশীয় না হইলেও বন্ধুতার হানি হয় না, এবং এক দেহ না হইলেও একপ্রাণতার অভাব হয় না।

এই তপোবনে সর্ব্বলোক নিঃস্বার্থ হিতশিক্ষার সাক্ষাৎ আদর্শ। তথাকার তরুগণ অযাচিত ও অসেবিত হইয়াও ফল ফুল বল্কলাদি প্রদানপূর্ব্বক সর্ব্বদা অভিলষিত গ্রাসাচ্ছাদন বিধান করে; নির্ঝর সকল সুশীতল সলিল প্রদানপূর্ব্বক পিপাসার শান্তি করে, এবং শাদ্বল সকল অর্থাৎ নবতৃণবহুল দেশ সকল বসিবার নিমিত্ত বিচিত্র আসন বিতরণ করে। অধিকন্তু পৃথিবী শয়নের জন্য সর্ব্বদা স্বকীয় ক্রোড় বিস্তার করিয়া অবস্থিতি করে; অতি মনোজ্ঞ নিকুঞ্জ সকল সুরম্য হর্ম্ম্য অপেক্ষাও সুখবাস বিধান করে; মৃদু মন্দ সুগন্ধ সমীরণ মনো-

হয় ব্যঞ্জনপদ পরিগ্রহ করে ; এবং তারকা-স্তবক-শবলিত অতি মোহন গগনবিভাগ দিব্য বিচিত্র বিতানরূপে অর্থাৎ চাঁদোয়ার মত অনন্ত সুষমা অর্থাৎ পরম শোভা বিস্তার করে। ইচ্ছা মাত্রেই এই সকল অক্ষয়, অকৃত্রিম ও দিব্য বিভব সকল কালে সকল ব্যক্তির অধিগত অর্থাৎ আজ্ঞাধীন হইয়া থাকে। কপট ক্রূর মানুষ স্বপ্নেও ঈদৃশ অতি দিব্য বিশুদ্ধ সুখের বার্ত্তামাত্র অবগত নহে। সে সকল লোক আত্ম-বঞ্চনাপূর্ব্বক অর্থ অর্জ্জন করে, বর্দ্ধন করে, রক্ষণ করে ও সঞ্চয় করে,—স্বার্থের দাস, ইন্দ্রিয়ের দাস, রিপুর দাস ও পরি-বারের দাস হইয়া আজীবন বিদ্ধনাসিক বলীবর্দ্দের অর্থাৎ বলদের ন্যায় ভারমাত্র বহন করে,—হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা, অসূয়া, গ্লানি, নিন্দা ও পরপীড়ন প্রভৃতি মহাপাপ সকল বন্ধুবৎ, আত্ম-বৎ ও দেববৎ পরম প্রীতি স্থাপনপূর্ব্বক তাহারই অনুসরণ করে, সেই মানুষ—হত বিড়ম্বিত দগ্ধ মানুষ—কিরূপে তপস্বি-সেব্য, দেবসেব্য, তাদৃশ তপোরণ্যের ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবে ? মানুষ কি হতভাগ্য, সে রাশি রাশি অর্থ ব্যয় এবং শতধা ও সহস্রধা শরীর প্রাণ ও মন ক্ষয় করিয়া শান্তি লাভের অভি-লাষে যে বিচিত্র প্রমোদ-বাপী, কূপ, তড়াগ, উদ্যান ও গৃহ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করে, কোষকার কৃমির ন্যায় তাহাতেই বদ্ধ হইয়া অনন্ত যাতনা সহ্য করে। সে কুমুদ ও কমলাদির ন্যায় স্বচ্ছ কোমল বিচিত্র শয্যা নির্ম্মাণ করে, বিধাতা তাহার অন্তরে অন্তরে কুটিল কণ্টক নিহিত করেন। সেইজন্য সে শয্যা-

কণ্টক রোগীর ন্যায়, পার্শ্ব পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক সমস্ত রজনী জাগরণ করিয়া অতি ক্লেশে যাপন করে; অথবা সে অতিমাত্র আয়াস-চিন্তা-সহকারে সুবর্ণ ও রজতাদি-বিনির্ম্মিত দিব্য পাত্রে যে সঘৃত পলান্ন সঞ্চয় করে, বিধাতা তাহারও অন্তরে অন্তরে নিদারুণ রোগবীজ বপন করেন। সেইজন্য সে তাদৃশ বহুমূল্য, বহুপ্রিয় ও বহুযত্নবিশুদ্ধ অন্ন সেবন করিয়াও রোগের হস্ত অতিক্রম ও অরুচির যন্ত্রণা পরিহার করিতে সমর্থ হয় না। সে বিপুল-যত্নাতিশয়-সহকারে যে প্রীতিময় ও সুখময় বিচিত্র বিষয় সংগ্রহ করে, বিধাতা তাহারও অন্তরে অন্তরে রাশি রাশি দুঃখ বিষাদ সঞ্চিত করেন। সেইজন্য সে অতুল বিষয়লক্ষ্মীর অধিকারমধ্যে দিবানিশি বাস করিয়াও, অকিঞ্চন দরিদ্রের ন্যায়, ক্ষুণ্ণ, বিষণ্ণ, অবসন্ন দশা সম্ভোগ করে; ইহার নাম অতর্ক্যহেতু দৈবী যাতনা। মনুষ্যগণ ইহাকেই আহার্য্য শোভার বিষম পরিণাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

যাঁহারা কায়মনে প্রকৃতি দেবীর পরিচর্য্যা করেন, সেই ঋষিগণের সহিত ঈদৃশী দৈবী যাতনার কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। ঈশ্বরচিন্তা ও পরমার্থচিন্তার নিত্য সংযোগ জন্য তাঁহাদের দিবা রাত্রি সমান সুখ বিতরণ করে, অথবা সমস্ত সংসার তাঁহাদের সুখের উপায় কল্পনা করিয়া থাকে। সংসারে যত প্রকার শোভা ও সমৃদ্ধি আছে, সৌকুমার্য্য ও সৌন্দর্য্য আছে, গুণ ও ধর্ম্ম আছে, এবং সুখ ও সৌভাগ্য আছে, তপোবলে সেই সমস্তই তথায় একত্র সমবেত হইয়াছে। বিধাতা যেন আপ-

নায় শান্তিশোভাময়ী মনোহারিণী সৃষ্টি একত্র দর্শন করিবার অভিলাষে এই শান্তরসাস্পদ আশ্রমপদের নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং স্বয়ং স্বীয়লোক পরিহারপূর্ব্বক সাক্ষাৎ তপঃস্বরূপে প্রতিনিয়ত তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। এইজন্য বিরোধী গুণ সকলও পরস্পর সমভাব অবলম্বনপূর্ব্বক অবিরোধে তাহাতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। ব্যাঘ্র সকল হরিণের গাত্র লেহন করিতেছে। বসন্ত-সময়-সমুদ্ভূত সুগন্ধ মলয়ানিল তথায় সকল কালই প্রবাহিত হইতেছে; অথচ কাহারও তাহাতে অণুমাত্র চিত্তবিকার উপস্থিত হয় না। অন্যের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রিয়ের চিরদাস, কামমাত্রপরায়ণ অতি বিষয়ী ব্যক্তিও তথায় গমনপূর্ব্বক তাহার সেবা করিলে অণুমাত্র বিকার অনুভব করে না। তথায় প্রবেশ করিলে অতিদুরাচার-পাষণ্ড-হৃদয়েও দুষ্প্রবৃত্তির দারুণ স্রোত তৎক্ষণাৎ বলপূর্ব্বক রুদ্ধ এবং অকৃত্রিম ধর্ম্মানুরাগ অজ্ঞাতসারে সমুদ্ভূত ও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অধিকন্তু তদীয় সঙ্গ মাত্রেই পুত্রবিয়োগবিধুরা জননীরও দুরপনেয় শোকভার সদ্যঃ শিথিলিত হয়, কামীরও অতি বদ্ধ কামরাগ তাহাকে ত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করে। স্বাভাবিক ও কৃত্রিম এই উভয়ের যে পার্থক্য, তপোবন ও উপবন এই উভয়ের তদনুরূপ বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। যাহা কৃত্রিম, তাহা আপাততঃ রমণীয় ও পরিণামে অতিমাত্র বিরস হইয়া থাকে। যাহা অকৃত্রিম, তাহা সকল কালেই মন হরণ করে। ফলতঃ তপোবন ধর্ম্ম ও তপস্যার পরিচর্য্যার নিমিত্ত, উপবন কাম ও

ইন্দ্রিয়াদির সেবার নিমিত্ত ; তপোবন বিরতি-বনিতার ক্রীড়া-ভূমি, উপবন আসক্তি-ললনার আবাসভূমি। তপোবনের কুসুম-গন্ধ অমৃতময়, উপবনের পুষ্পসৌরভ প্রাণান্তিক বিষ। তপো-বনের মৃদু মন্দ শীতল বায়ু স্বর্গের শান্তি বহন করে, উপবনের সুগন্ধ গন্ধবহ নরকের অবসাদ উদ্গার করিয়া থাকে। তপো-বনে আত্মশক্তি সঞ্চিত হয়, উপবনে বিষয়শক্তি ক্ষয়িত হয়। তপোবনে আত্মভাববৃত্তির দৃঢ়তা হয়, উপবনে অনাত্মজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয়। তপোবনে পরম পুরুষার্থের সেবা হয়, উপবনে অধম ইন্দ্রিয়ার্থের পরিচর্য্যা হয়। তপোবনে নিত্য তেজ ও নিত্য গৌরব, উপবনে নিত্য ক্ষীণতা ও নিত্য লাঘব। তপো-বনে নিত্য অভয় ও নিত্য ক্ষেম, উপবনে নিত্য ভয় ও নিত্য হানি।

জাহ্নবী দেখিলেন, বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ নানাশাস্ত্রালাপে ধর্ম্মপ্রসঙ্গে সুখময় কাল যাপন করিতেছেন। মহর্ষিবৃন্দ শান্তির পরিবারের ন্যায়, ধর্ম্মের সন্ততির ন্যায়, সত্যের পোষ্যবর্গের ন্যায়, ক্ষমার আত্মীয়গণের ন্যায়, এবং ন্যায়ের সহচর ও অনুচর-সমূহের ন্যায়, বিচিত্র অদ্ভুত নিরুপম শোভা বিস্তার করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই অসামান্য তপঃপ্রভাবসম্পন্ন, সকলেই সত্যধর্ম্ম ও শান্তি-নিরত, সকলেই দিব্য বিচিত্র অমানুষী ব্রহ্মশ্রীতে পরিপূর্ণ, এবং সকলেই প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায়, সমুদিত ভাস্করের ন্যায়, অথবা মূর্ত্তিমান্ তেজোরাশির ন্যায়, একান্ত দুর্দ্ধর্ষ ও দুরপনেয় প্রতাপ বিশিষ্ট। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহারা ঈদৃশ তেজঃপুঞ্জ হই-

লেও, পৌর্ণমাসী-শশাঙ্কের ন্যায় ব্যক্তিমাত্রেরই নিতান্ত দর্শনীয় ; শোকে সান্ত্বনার ন্যায় ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত স্পৃহণীয় ; এবং সন্তাপে শৈত্য-ক্রিয়ার ন্যায় ব্যক্তিমাত্রেরই সেবনীয়। তাঁহাদের শান্তি-বিকশিত ছবির অন্তরালে যে বিশ্বজননী বিরাজ করিতে-ছেন, তাহা শত্রু মিত্র সকলেরই সমান বশীকরণ ; এবং সরলতা ও শান্তিরূপ যে মহামূল্য বিচিত্র রত্ন তাঁহাদের প্রশস্ত হৃদয়ভাণ্ডার অলঙ্কৃত করিতেছে, কুটিল-হৃদয় কপট মানুষের বসবাস পাপময় সংসারে কখনও এই রত্নের জন্ম সম্ভব হয় না। কেহ বলে ঐ রত্ন দেবলোকের সম্পত্তি, কেহ বলে উহা শান্তির প্রসূতি, কেহ বলে উহা তপোলক্ষ্মীর সাক্ষাৎ বিশুদ্ধ প্রাসাদ, এবং কেহ বলে ঐ রত্ন ঈশ্বরসেবার মূর্ত্তিমান্ ফল। সেই সরলতারূপ অমূল্য রত্নের সুনির্ম্মল প্রতিভারাশি ক্ষণে ক্ষণে উচ্ছলিত হইয়া ঋষিগণের স্বভাবসুন্দর লোচন এবং সর্ব্বক্ষণ সুখদৃশ্য মুগ্ধমোহন বদনমণ্ডলে প্রতি-নিয়ত সুন্দর বেশে নৃত্য করিতেছে। সংসারে ঐ লীলা ও সৌকুমার্য্যের উপমা নাই। ঈশ্বরের যে জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপ উল্লিখিত হয়, এই প্রতিভা তাহারই অংশ। যাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে সেই সত্য পুরুষ পরমাত্মার পরিচর্য্যায় প্রগাঢ় প্রণয় প্রদর্শন করেন, তাদৃশ পরমাত্মদর্শী, আত্মরসজ্ঞ, বিদ্বান্ পুরুষগণই ঈদৃশ প্রতিভা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আহা! ঐ প্রতিভার কি মোহিনী শক্তি! দর্শনমাত্র অতি মলিন সন্তপ্ত চিত্তেও, সুশীতল-সলিল-সেকের ন্যায়, অনির্ব্বচনীয় শান্তিরস সঞ্চারিত

হয় এবং অন্তরে অন্তরে, পঞ্জরে পঞ্জরে, শিরায় শিরায় ও অস্থিতে অস্থিতে অমৃতের দিব্য লহরী-লীলা করিয়া থাকে। অধিকন্তু মন ও প্রাণ আপনা হইতে উদ্যত হইয়া, একান্ত অনুগত ও নিতান্ত বশংবদ হইতে অভিলাষী হয়। ঋষিগণ উক্ত প্রতিভা-বলে বলপূর্ব্বক মায়া বা দৈবী শক্তির ন্যায় সকলেরই মন হরণ করেন, পরম আত্মীয় ও পরিচিতের ন্যায় সকলেরই প্রণয় ও অনুরাগ আকর্ষণ করেন, সাক্ষাৎ ঈশ্বরের ন্যায় সকলেরই মনেরও প্রভু হইয়া থাকেন। ভক্তিভাজন জনকজননীর ন্যায় সকলেরই' প্রীতি শ্রদ্ধা বহন করেন, 'অভীষ্ট দেবদেবীর ন্যায় সকলেরই পূজাপ্রাপ্ত হন, অভিমত অর্থসমৃদ্ধির ন্যায় সকলেরই স্পৃহণীয়তা সংগ্রহ করেন, মূর্ত্তিমতী ক্ষমা ও দয়ার ন্যায় সকলেরই অন্তরে আলিঙ্গন লাভ করেন, সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ন্যায়, সত্যের ন্যায়, সকলেরই নিকট প্রীতিভাজন হইয়া বিনা ব্যাঘাতে সর্ব্বত্র বিচরণ করেন।

তাঁহাদের তপঃপ্রভাব কি অসামান্য! তাঁহাদের সেনা নাই, প্রহরী নাই, রক্ষী নাই, বিষয় নাই. বিভব নাই, তথাপি তাঁহারা মনুষ্য অপেক্ষা সুরক্ষিত, সুসমৃদ্ধ, সুসম্পন্ন ও সুদৃঢ় স্থিতিসম্পন্ন। ঋষিগণ চিরকালই বলীয়ান্, তেজীয়ান্ মহীয়ান্ ও গরীয়ান্। মনুষ্যগণ বিজ্ঞানবলে, বুদ্ধিবলে ও কৌশলে যাহার আবিষ্কার ও রক্ষা করিতে না পারে, ঋষিগণ সঙ্কল্প মাত্র অনায়াসেই তাহার সংগ্রহ ও ভোগ করিয়া থাকেন। মনুষ্যের যত সঞ্চয় ও বর্দ্ধন হয়, ততই তাহার নব নব অভাব প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে,

সুতরাং সে কোনও কালেই আপ্তকাম ও সুখী হইতে পারে না ; কিন্তু ঋষিগণের সঞ্চয় বা বর্দ্ধন নাই, অথচ কোনও কালেই কোনও বিষয়ের অভাব নাই, নিত্য সুখ ও নিত্য সন্তোষ তাঁহাদের দাসবৎ সেবা করে। ফলতঃ বিষয়ী অন্ধকারে, ঋষিগণ আলোকে ; মানব ছায়ায়, ঋষিগণ সত্তায় ; মানব কল্পনায়, ঋষিগণ বস্তুতে ; মনুষ্য দাসত্বে, ঋষিগণ প্রভুত্বে ; মনুষ্য ফাঁকিতে, ঋষিগণ আত্মাতে ; মনুষ্য দৈবে, ঋষিগণ পুরুষকারে ; মনুষ্য দোষসমূহে, ঋষিগণ গুণসমূহে অবস্থিতি করেন। ইহাই মনুষ্যত্বের ও ঋষিত্বের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ প্রভেদ। আত্মসেবা পরিহারপূর্ব্বক পরমাত্মসেবায় প্রবৃত্ত হইলেই এই-প্রকার ঋষিগুণ অধিগত অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনবরত বিষয়ের সেবা করিলে মনের জড়তা এবং অবসাদবিশেষ উপস্থিত হয় এবং কার্য্যশক্তি ও আত্মশক্তি প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়। কিন্তু তপস্বিগণের স্বভাব সেরূপ নহে ; তাঁহারা একবারেই বিষয়ের দাসত্ব পরিহার করেন এবং অনাসক্ত হইয়া তাহাকে আয়ত্ত করিয়া থাকেন। সেইজন্য সুখ, সন্তোষ, প্রফুল্লতা তাঁহাদের নিত্য ভোগ্য হইয়া থাকে। ত্রিভুবন ইঁহাদের গৃহ ও পরিজন ; প্রকৃতি ইঁহাদের সখা ও সখী ; ঈশ্বর ইঁহাদের গুরু ও উপদেষ্টা ; ধর্ম্ম ইঁহাদের ধন ও সমৃদ্ধি ; সত্য ইঁহাদের সাধ্য ও সাধন ; শান্তি ইঁহাদের পরিচ্ছদ ও ভূষণ ; সদাচার ইঁহাদের আশ্রয় ও অবলম্বন ; সৎপ্রসঙ্গ ইঁহাদের আমোদ প্রমোদ ; লোকের অকৃত্রিম হিতকামনা ইঁহাদের স্বার্থ ও

প্রয়োজন ; পরমার্থই ইঁহাদের অভীষ্ট উদ্দেশ্য। ইঁহারা যুগপৎ নম্র ও উন্নত, তেজস্বী ও শান্তশীল, সরল ও বিনয়ী, ভয় ও অভয়স্বরূপ—দুর্জ্জনের ভয়, শিষ্টজনের অভয়, দীপ্ত ও সুস্নিগ্ধ, বৃদ্ধ ও অতি ক্ষুদ্র, অকিঞ্চন ও সর্ব্বসম্পন্ন, অগ্নি ও জলস্বভাব। শান্তচিত্ত ঋষিগণের সহিত, অশান্ত ও অসংযতচিত্ত মনুষ্যের কি প্রকারে তুলনা হইতে পারে? সেইজন্য মনুষ্য সর্ব্বদাই দগ্ধ, বিদ্ধ, রোগ-শোক-জর্জ্জরিত, দীনহীন দুঃখীর ন্যায় জীবন যাপন করে। অথবা মনুষ্যের চক্ষু আছে, দৃষ্টি নাই; শক্তি আছে, সাধন নাই; হস্ত আছে, কার্য্য নাই; পদ আছে, গতি নাই; কর্ণ আছে, শ্রুতি নাই। তপোবনে স্থানে স্থানে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, স্থানে স্থানে হোম-বহ্নি হইতে ধূম নির্গত হইতেছে, স্থানে স্থানে হোমাগ্নিনির্গত ধূম নীল চন্দ্রাতপের শোভা ধারণ করিতেছে; এই ধূম কতই পবিত্র ও কতই মঙ্গলকারী।

অন্ন হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হয়। বৃষ্টি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়। ঐ বৃষ্টি যজ্ঞরূপ কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়। কর্ম্ম ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ হইতে উদ্ভূত। বেদ অক্ষর অচ্যুত হইতে উৎপন্ন, অতএব তাদৃশ যজ্ঞেতেই সর্ব্বগত অবিনাশী ব্রহ্ম নিত্য প্রতিষ্ঠিত। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে, যজ্ঞাগ্নি-ধূম হইতে যে মেঘ জন্মে, তাহা হইতে যে বর্ষণ হয়, সেই বর্ষণই জীবের মঙ্গলকারী; তাহা হইতে যে অন্ন উৎপন্ন হয়, তাহাই জীবের শরীর, মন ও বুদ্ধির পবিত্রতা সম্পাদন করে। সেই ধীসম্পন্ন বুদ্ধি হইতে

জ্ঞান, বিজ্ঞান, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, শরীর আধিব্যাধিহীন ছিল, সবল, সুস্থ, সহর্ষ বিদ্যমান ছিল, তাহা আজ কবির কল্পনা বলিয়া মনে হইতেছে। কেন এমন হইল ? আর্য্যগৃহে ত্রিদিবপবিত্রতাকারী সেই হোমাগ্নি, হোমধূম আর দৃষ্ট হয় না ; তৎপরিবর্ত্তে কলুষিত শরীর মনের অপবিত্রতাকারী, আধি-ব্যাধির হেতুভূত, পূতিগন্ধি মৃদ্-ধূমাগ্নি নির্গত হইতেছে। আর্য্যতপোরণ্যের সে শোভা আর নাই, সে যজ্ঞ নাই, সে বেদধ্বনি নাই, সে শ্রী সম্পদ্ নাই ; প্রকৃতি যেন চোরের ভয়ে, কোনও দস্যুর ভয়ে, সেই শ্রী সম্পদ্ শোভা লুকাইয়া রাখিয়াছেন ; বেদধ্বনির পরিবর্ত্তে হিল হিল, কিল কিল রব উত্থিত হইতেছে। আর কি দেবতারা আর্য্যদের নিকট হোমান্ন যাচ্ঞা করেন ? কোথা হইতে দিবে ? আজ কাল আর্য্যেরাই অন্নের ভিখারি, দুর্ভিক্ষ প্রতিবৎসর লাগিয়াই আছে। আর কিছুদিন এই ভাব থাকিলে, বস্ত্র-অভাবে উন্মাদ হইয়া এবং অন্নাভাবে পেটের জ্বালায় ক্ষুধাতুর হইয়া চারিদিক্ অন্ধকার দেখিয়া এ দেশ সে দেশ করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে হইবে।

আর্য্যতপোবনে সেই শ্রবণমনোহারী সামগান আর শ্রুত হইতেছে না, তৎপরিবর্ত্তে শৃগাল-কুক্কুরের বিকট ধ্বনি শ্রুত হইতেছে। আর সেই ত্রিদিববাসীরা মহানন্দে তপোবনে বিচরণ করেন না, আজ সেই তপোবনে ভূত-প্রেতের তাণ্ডব-নৃত্য চলিতেছে। যে তপোবনে পবিত্র দেববালারা বিচরণ

করিত, তাহারা আর সেই তপোবনে বিচরণ করে না। যে তপোবনে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তু সকল হিংসা ভুলিয়া, করি-শিশুর সহিত খেলা করিয়াছে, আজ সেই তপোবন হিংস্রভূমে পরিণত হইয়া চতুর্দ্দিকে হিংসাব্যাপ্ত হইয়াছে। কেহ কি বলিয়া দিতে পারেন,—কোন্ মহাপাপে এমন মহাসুখের মহাপবিত্র তপোবন হিংসাগার হইয়াছে? যে তপোবনে তাপস-বালকেরা কোমলপদে বিচরণ করিত, জানি না কোন্ মহাপাপে আজ সেই স্থানে শৃগাল, কুকুর, মেষ, মহিষ, গণ্ডার, বরাহ, খরপদে দম্ভভরে বিচরণ করিতেছে। যাহা হউক্, এ হেন তপোবনে, বশিষ্ঠদেব, পরাশর, বাল্মীকি, শুক, নারদ প্রভৃতি মহাত্মগণ যোগ সাধনা করিয়া ভারতে মহাগৌরব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাই বলি, আজ একটু সময় মন্দ হইয়াছে বা সেই বায়ুর পরিবর্ত্তন হইয়াছে, অথবা মহর্ষি দেবর্ষিগণ পাপীর সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিয়া গা ঢাকা দিয়াছেন বলিয়া কেহ হতাশ হইবেন না; আর্য্যগণ সদাচারী হউন, অকপটে স্বধর্ম্ম সেবা করুন, দেবব্রত ও সত্যব্রত হউন, ব্রহ্মচর্য্য পালন করুন, আবার সেই দিন আসিবে, আবার সেই তপোবনে সেই মহর্ষিগণ আসিয়া ভারতবাসীকে হৃদয়ে ধরিয়া মহাসুখ ও মহাশান্তি প্রদান করিবেন। দুঃখের পর সুখের দিন নিশ্চয়ই আসিবে।

ব্রহ্মচর্য্য

ব্রহ্মও যাহা, ব্রহ্মচর্য্যও তাহা। যাহা ব্রহ্মহৃদয় বা ব্রহ্মপ্রাণ, তাহাই ব্রহ্মচর্য্য; যে আচারে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব, তাহাই ব্রহ্মচর্য্য। যে আচার ব্রহ্মাতেই নিরন্তর প্রতিষ্ঠিত, যে আচারে ও ব্রহ্মে অভেদ, তাহাই ব্রহ্মচর্য্য। সমস্ত সদ্‌গুণের বৃহত্ত্ব আছে যে আচারে, তাহাই ব্রহ্মচর্য্য। যে আচারের দ্বারা বিচারনিরপেক্ষ নিশ্চয় ও পূর্ণরূপে ব্রহ্মকে বা সমস্ত সদ্‌গুণকে লাভ করা যায়, তাহার নাম ব্রহ্মচর্য্য।

যাহা লাভ করিলে কিছুই অপ্রাপ্ত থাকে না,—সমগ্র ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, শক্তি ও জ্ঞান লাভ হয়, যাহার প্রতিষ্ঠায় সর্ব্বশক্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়, যাহার স্থিতিতে সর্ব্বশক্তির স্থিতি, সর্ব্বজ্ঞানের স্থিতি, সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের অবস্থান; যাহার পোষণে সর্ব্ব শক্তি ও জ্ঞানের বৃদ্ধি, সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের বৃদ্ধি, যাহার পূর্ণসত্তায় সত্তাবান্ হইলে পূর্ণসত্তায় অবস্থিতি করা যায়, সেই নিত্য সত্য শুক্রব্রহ্মকে ধ্যান করিয়া মহাদেবের মহাব্রত, মহৎ ব্রহ্মের মহৎ আচার, ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্য যে কি, তাহা সকলের জ্ঞাত হওয়া উচিত। দৃষ্ট, শ্রুত, অনুভূত প্রপঞ্চ হইতে যাহা কিছু বিশেষ, তাহার নাম ব্রহ্ম; এইপ্রকার পদার্থ যাহাতে বিচরণ করে, তাহাই ব্রহ্মচর্য্য।

ব্রহ্মচর্য্য

বীর্য্য বা শুক্র ধারণকে ব্রহ্মচর্য্য বলে। স্থূল কথা, শুক্র-ধারণই ব্রহ্মচর্য্য। শুক্রধারণ, ব্রহ্মচর্য্য, অষ্টাঙ্গ-মৈথুনত্যাগ বা উর্দ্ধরেতঃ একই কথা। শুক্রধারণে অষ্টাঙ্গ-মৈথুনত্যাগ সিদ্ধ হয়, অষ্টাঙ্গ-মৈথুনত্যাগে শুক্রধারণ সিদ্ধ হয়। এখন দেখা যাউক, শুক্র কি, কোন্ পদার্থের নাম শুক্র।

শুক্র অর্থে ব্রহ্ম, শক্তি, বীজ, বীর্য্য, চৈতন্য, তেজ, বল, আনন্দ ইত্যাদি। সব্রহ্ম বিশ্বপ্রপঞ্চের যাহাতে উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হয়, তাহারই নাম শুক্র। শুক্র হইতে সকল পদার্থ উৎপন্ন, শুক্রের দ্বারা বর্দ্ধিত ও শুক্রেই প্রতিষ্ঠিত। যাহা আসিলে সকল আসে, যাহা থাকিলে সকল থাকে; যাহা যাইলে সকল যায়, এমন যে পদার্থ, তাহাই শুক্র। যাহা জ্ঞানের আধার, প্রজ্ঞার আধার, শক্তির আধার, আনন্দের আধার, তাহাই শুক্র।

শুক্র দ্বারা পুষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়গণ চেষ্টাশীল হয়, নচেৎ ইন্দ্রিয় সকল নিস্তেজ হয়, এইজন্য শুক্রই সর্ব্বচেষ্টা-প্রবর্ত্তক। শুক্রই মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিয়া চৈতন্যরূপ ধারণ করে। শুক্রই প্রাণাদি-সংযোগে জীবত্ব প্রাপ্ত হয়। শুক্র প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু। শুক্র আশ্রয়, চৈতন্য আশ্রয়ী। যে তনু শুক্রময়, তাহাই চিন্ময়। এই শুক্র, ব্রহ্মবীজেরও বীজ, বিশ্ব-উৎপত্তির মূল কারণ। এই শুক্রই বিশ্ববীজ। যাহার যাহা বীজ, তাহাই তাহার শুক্র। সকল পদার্থের মূল বীজ; সার পদার্থ যখন ব্রহ্ম, শুক্রও সকল পদার্থের

সার মূলবীজ। অতএব শুক্রও যাহা, ব্রহ্মও তাহা ; শুক্র-রূপী ব্রহ্মই সর্ব্বভূতের সনাতন মূল বীজ।

শুক্রই ঘনীভূত ব্রহ্মস্বরূপ, অমৃত ও অব্যয়স্বরূপ শুদ্ধ-সত্ত্বাত্মক। অখণ্ডিত সুখপ্রতিমা সর্ব্বত্র একস্বরূপ, সকল প্রাণীর আত্মার স্বরূপ, সর্ব্বশরীরের স্থিতিস্বরূপ। শুক্র-আশ্রয়, ব্রহ্ম আশ্রয়ী। ব্রহ্মতনু শুক্রময়। যে তনু শুক্রময়, তাহাই ব্রহ্মতনু। শুক্রই সর্ব্বপ্রকাশক জ্ঞান। শুক্রহ্রাসে জ্ঞানের নাশ স্বতঃসিদ্ধ। শুক্র ধৃত রহিলে জ্ঞান বর্দ্ধিত হয়, সুতরাং শুক্রই জ্ঞান। শুক্র দ্বারা পুষ্ট হইয়া জ্ঞান প্রকাশ-সামর্থ্য ধারণ করে, সর্ব্বপ্রকাশক ক্ষমতা প্রকাশ করে। শুক্র আশ্রয়, জ্ঞান আশ্রয়ী। যে তনু শুক্রময়, তাহাই জ্ঞান-ময়। শুক্রই আনন্দস্বরূপ ; শুক্রের হ্রাসে আনন্দের হ্রাস, শুক্রের বর্দ্ধনে আনন্দের বর্দ্ধন হয়। এই সমস্ত ভূত আনন্দ হইতে উৎপন্ন, আনন্দের দ্বারা জীবিত এবং পুনরায় আনন্দেই প্রবেশ করে। শুক্র আশ্রয়, আনন্দ আশ্রয়ী। যে তনু শুক্র-ময়, তাহাই আনন্দময়।

সূর্য্যাদিরূপে প্রকাশমান, জ্যোতির্ম্মাত্র, দীপ্তিশীল মহাযশঃ নামক শুক্রকে দেবতারাও উপাসনা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মের ব্রহ্মতেজ শুক্র হইতে উদ্ভূত এবং তাহা দ্বারাই পরি-বর্দ্ধিত হন, অন্য দ্বারা অপ্রকাশিত সেই স্বয়ংজ্যোতিঃ শুক্র সূর্য্যাদি জ্যোতিঃপদার্থ সকলের মধ্যে থাকিয়া সমুদয় প্রকাশিত করিতেছেন। সর্ব্বাবভাসক সূর্য্যচন্দ্রাগ্নিজ্যোতিঃ—

যাহা পাইলে মুমুক্ষুরা সংসার-অভিমুখে পুনঃ আবর্ত্তন করে না, সেই সনাতন জ্যোতিঃ শুক্রব্রহ্মকে যোগীরা ভজনা করেন। মার্ত্তণ্ডের তীক্ষ্ণ তেজ, চন্দ্রের শীতল রশ্মি, ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মতেজ, সমস্ত শুক্রব্রহ্মেরই তেজ। কি আধ্যাত্মিক, কি আধিভৌতিক, কি আধিদৈবিক, সমস্ত তেজের মূলই শুক্র। শুক্রই যখন ব্রহ্ম, জগৎ যখন ব্রহ্মতেজেই জ্যোতির্ম্ময়, তখন তাহা শুক্র-ব্রহ্মেরই জ্যোতিঃ। যার যত শুক্র, তার তত তেজ।

যিনি অশরীরী হইয়াও শরীরী, ইন্দ্রিয়বর্জ্জিত হইয়াও সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়ে ভাসমান, ইন্দ্রিয়াতীত হইয়াও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অদৃষ্ট হইয়াও দ্রষ্টব্যের ন্যায়, সাক্ষাৎ না হইলেও সর্ব্বসাক্ষীর ন্যায় সকলকে দেখিতেছেন, এইপ্রকার শুক্ররূপ তেজোব্রহ্মকে নমস্কার। এইপ্রকার শুক্রব্রহ্মের যিনি শরণ লইয়া থাকেন, সমস্ত তেজই তাঁহাতে উদ্ভাসিত হয়। শুক্র আশ্রয়, তেজ আশ্রয়ী ; যে তনু শুক্রময়, তাহাই তেজোময়। শুক্রই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিতেছে। জগৎকে ধারণ করিতেছে কে ? সত্য। এই বিশ্ব সত্য হইতে উৎপন্ন, সত্যেই প্রতিষ্ঠিত এবং সত্যেই ইহার লয়। সত্য কি ? যাহার যাহা সার, তাহাই তাহার সত্য। পৃথিবীর সার গন্ধ, জলের রস, চিনির মিষ্টতা, অগ্নির তেজ ইত্যাদি। ইহারাই ইহাদিগের সার, ইহারাই ইহাদিগের সত্য। বিশ্ব-সার শুক্র, সুতরাং শুক্রই সত্য। পৃথিবীর যাহা অতিশয় সার, তাহাই শুক্র ; সুতরাং শুক্রই সার এবং শুক্রই সত্য।

জগতে সত্য কি ? যাহার ধ্বংস হয় না, তাহাই সত্য।

তত্ত্ববোধ

পৃথিবীর কার্য্যকে কারণে লীন করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই সত্য : সুতরাং যাহার যাহা কারণ,—যে কারণের লয় ক্ষয় নাই, তাহাই সত্য। পৃথিবীকে কারণে লীন করিলে শক্তিই অবশিষ্ট থাকে, সুতরাং শক্তিই সত্য ; আবার সেই শক্তি চৈতন্যাশ্রিত, সুতরাং চৈতন্যও সত্য। চেতন নিত্য সৎ, শক্তি নিত্যা সতী। আবার এই চিৎ শক্তি উভয়ই শুক্র ; সুতরাং শুক্রই নিত্য সত্য। যে তনু শুক্রময়, তাহাই সত্যময়। যার শরীরে শুক্র যত ধৃত থাকে, তার শক্তি তত বর্দ্ধিত হয় ; শুক্র যার যত ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তার শক্তিও তত হ্রাস হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। পঞ্চভূতের অতিশয় সাররূপ যাহা, তাহা শক্তি ; অতএব শুক্র শক্তিপদবাচ্য। শুক্র আশ্রয়, শক্তি আশ্রয়ী। যে তনু শুক্রময়, তাহাই শক্তিময়।

বিন্দুর রক্ষণে জীবন, পতনে মরণ। যাহার প্রসাদে ঈশত্ব লাভ হয়, তাহাকে অতি যত্নপূর্ব্বক ধারণ করা উচিত। শুক্র-স্খলনেই জরা মরণ সংঘটিত হয়। জরামরণশীল বিমূঢ় সংসারকে বিন্দুই সুখদুঃখে সংস্থিত করে। বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু আছে। যে সিন্ধু চায়, তাহার বিন্দু রাখিবার যত্ন, বিন্দু ধরিবার চেষ্টা পূর্ব্বেই করা উচিত। বিন্দুধারণেই সিন্ধুর লাভ ঘটিবে। সিন্ধুর এক নাম রত্নাকর। রত্নাকর-গর্ভে সকল রত্নই নিহিত আছে। রত্ন যে সিন্ধুগর্ভে রহিয়াছে, সেই সিন্ধু যাহার গর্ভে নিহিত, সেই গর্ভে যে কত রত্ন আছে, তাহা সংখ্যা করিবার সাধ্য বা ক্ষমতা কাহারও নাই।

ব্রহ্মচর্য্য

যাহা লাভ করিলে গতাগতি শেষ হয়, তাহাই গতি। যাতায়াত কেন? ভোগের জন্য। যাতায়াত শেষ হইবে কবে? ভোগ শেষ হইবে যবে। ভোগ শেষ হইবে কবে? পূর্ণ হইবে যবে। পূর্ণ ভোগের জন্যই দৌড়াদৌড়ি ও যাতায়াত। জীব যেখানে পূর্ণ ভোগ পাইবে, গতি শেষ সেইখানেই হইবে। পূর্ণ ভোগ যেখানে, যাতায়াত সেখানে। পূর্ণ ভোগ কোথায়? পূর্ণ শুক্রেই পূর্ণ ভোগ। অগতির যদি কেহ গতিদাতা থাকে, তবে একমাত্র শুক্রই সমস্ত রক্ষা করিতে পারে।

বিশ্বের পোষণকর্ত্তা ইহার তুল্য আর কিছু বা কেহ নাই। শুক্র যাহাকে পোষণ না করে, তাহাকে কেহ রক্ষা করিতে পারে না। ইহা পোষক নহে যার, কেহ ধারক নাহি তার। ইহার ন্যায় সুখদাতা আর কেহ নাই, শুক্রধারণই সর্ব্ব সুখের আগার। শুক্রই আশ্রয় ও ভোগের স্থান অর্থাৎ নিবাস। এমন নিরুপদ্রব শান্তিসুখস্থান, এমন পূর্ণ নির্ম্মল আনন্দভোগের স্থান আর নাই। ইহাকে যিনি আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহার পরবাস ঘুচিয়াছে, তিনি স্ববাসে নিবাস স্থাপন করিয়াছেন।

শুক্র দুঃখ হইতে রক্ষা করে। ইহার যিনি শরণ লইতে পারেন, তাঁহার সকল দুঃখের অবসান হয়। সর্ব্বসুখদাতা ইহার ন্যায় আর কেহ নাই। শুক্র যাঁহার রক্ষক, কাল তাঁহার নিকট ভিক্ষুক। শুক্র যাহাকে রক্ষা করে, ইন্দ্রের বজ্র, বরুণের পাশ, যমের মৃত্যুদণ্ড, ব্রহ্মার ব্রহ্মাস্ত্র, শিবের পাশুপত, বিষ্ণুর বৈষ্ণবাস্ত্র তাহার কিছুই করিতে পারে না। এমন মহাশরণ্য

আর কেহ নাই। ইহার সঙ্গে যিনি বন্ধুত্ব করেন, তাঁহার কল্যাণের পরিসীমা থাকে না। এমন কল্যাণকারী বিশ্বে আর কেহ নাই।

শুক্রই বিশ্বের উৎপত্তির মূল কারণ। শুক্রই বীজের বীজ মহাবীজ, অবিনাশী বিশ্ববীজ। এই বীজের ধ্বংস নাই, সুতরাং এই বীজ নিত্য ও অব্যয়। সর্ব্বযশ যাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, যাহা থাকিলে সকল যশ আয়ত্ত হয়, সর্ব্বোপরি যশস্বী হওয়া যায়, তাহাই মহাবীজ।

শুক্রই দার্শনিকের দর্শন, কবির কল্পবৃক্ষ, জ্ঞানীর জ্ঞান-ভাণ্ডার, বলীর বলাধার, অন্ধের বিমল দিব্যচক্ষু, বধিরের দিব্যকর্ণ, গৃহীর পরম ধন, ভিক্ষুকের শরণ, কাঙ্গালের নিধি, দীনের দীনবন্ধু দীননাথ, সন্ন্যাসীর অবলম্বন, ভক্তের হৃদয়ধন। তাহাই শুক্র, যাহা মূককে বাচালতা-শক্তি প্রদান করে, পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘন-সামর্থ্য জন্মায়। তাহাই শুক্র, যাহা দুর্ব্বলকে বলবান্, ভীরুকে সাহসী, নিস্তেজকে তেজীয়ান্, নিদ্রিতকে জাগরিত এবং মৃতকে পুনর্জ্জীবিত করে। তাহাই শুক্র, যাহা ভবসাগরের অটল পোত, যাহাতে আরোহণ করিলে ভব-সাগর অনায়াসে পার হওয়া যায়। শুক্রই অখণ্ড অবস্থায় ব্রহ্ম, আর খণ্ডাবস্থায় বিশ্ব।

শুক্র যেমন চ্যুত হইল অমনি মায়াও আচ্ছন্ন করিল, মোহও জন্মিল। শুক্র যেরূপ যে পরিমাণে চ্যুত হইবে, ত্রিগুণা প্রকৃতিও সেইরূপ সেই পরিমাণে বিকৃতা হইবে।

ত্রিগুণ যে পরিমাণে বিকৃত হইবে, বুদ্ধি, জ্ঞান, শম, দম, শৌর্য্য. ধৈর্য্য, সুখ, দুঃখ, যশ, অযশ, ভাব, অভাব, বল, বীর্য্য ইত্যাদি সকল বিষয়ই সেইরূপ লাভালাভ হইবে। শুক্রের খণ্ডাবস্থায়ই বিকার, অখণ্ডাবস্থায়ই নির্ব্বিকার। বীর্য্যের অচ্যুতাবস্থায়ই স্বাধীন, আর চ্যুতাবস্থায়ই পরাধীন। শুক্র যাহার খণ্ডিত হইয়াছে, সে বিকৃত হইয়াছে, সুতরাং কালেরও অধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইজন্য মৃত্যুরও বশ হইয়াছে। বীর্য্য যাহার চ্যুত হয় নাই, সে বিকারও প্রাপ্ত হয় নাই, কালেরও বশ হয় নাই, মৃত্যুরও অধীন হয় নাই, সুতরাং তিনিই অমৃত, স্বাধীন, ও মহামৃত্যুঞ্জয়। শুক্র যেমন খণ্ডিত হইল, অমনি কাল, মৃত্যু, রোগ, শোক, শীত, গ্রীষ্ম তাহাকে জয় করিল। শুক্র যেমন খণ্ডিত হইল, শারীরিক ও মানসিক শক্তি সেই সঙ্গে হ্রাস পাইল। শুক্র যেমন খণ্ডিত হইল, অমনি বিকারও আশ্রয় করিল, ব্যাধিও জন্মিল। শুক্রের খণ্ডাবস্থাই নিদ্রা, অখণ্ডাবস্থাই জাগ্রৎ। শুক্রের খণ্ডাবস্থাই জরা মৃত্যু, অখণ্ডা-বস্থাই অজরা অমৃত্যু। শুক্রের খণ্ডাবস্থাই দুঃখ, অখণ্ডাবস্থাই সুখ।

শুক্র, মনুষ্যশরীরে কিরূপে অবস্থিতি করে এবং কিরূপে ক্ষরিত হয়, তাহা জ্ঞাত থাকা উচিত। শরীরের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ শুক্র। শরীর পঞ্চভূতাত্মক। পঞ্চভূতের অতিশয় সারভাগ শুক্র। রসের সারভাগ রক্ত, রক্তের সারভাগ মাংস, মাংসের সারভাগ মেদ, মেদের সারভাগ অস্থি,

অস্থির সারভাগ মজ্জা, মজ্জার মথিত সারভাগ শুক্র। চৈতন্য যেরূপ জীবশরীরে সর্ব্বব্যাপী, শুক্রও জীবশরীরে সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী।

যেমন দুগ্ধে ঘৃত, ইক্ষুতে চিনি, কাষ্ঠে অগ্নি গূঢ়ভাবে নিহিত থাকে, শুক্রও সেইরূপ সর্ব্বদেহের শক্ত্যাধার হইয়া অবস্থিতি করে। ঘৃত যেমন দুগ্ধে অলক্ষিত ভাবে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছে, অথচ দেখা যায় না, সেইরূপ শুক্রও রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা সমস্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে, অথচ দেখা যায় না। যেমন দুগ্ধ মথিত হইলে ঘৃত বাহির হয়, কিন্তু মথনের পূর্ব্বে, দুগ্ধে যে ঘৃত আছে তাহা অনুভব হয় না, সেইরূপ শরীর মথিত হইলে শুক্র বাহির হয়, মথনের পূর্ব্বে শুক্রের অস্তিত্বের অনুভব হয় না। যাহার শরীরে শুক্র বেশী, তাহার অল্প মথনে শুক্র বহির্গত হয়; যাহার শরীরে শুক্র অল্প, তাহার শরীর সেই পরিমাণে শুষ্ক এবং বেশী মথনে শুক্র বহির্গত হয়। দুগ্ধ মথিত করিবার জন্য যেমন মন্থনদণ্ড রহিয়াছে, শরীর মথিত করিবার জন্যও মন্থনদণ্ড রহিয়াছে। সেই মন্থনদণ্ডই মনুষ্যের মন। যেমন মন্থনদণ্ড দ্বারা দুগ্ধ মথিত হইয়া ঘৃত নির্গত হয়, সেইরূপ মন দ্বারা শরীর মথিত হইয়া শুক্র নির্গত হয়। যেমন দুগ্ধ মথিবার মন্থনদণ্ডে তির্য্যক্ ভাবে আট্‌টা কাঠি সংলগ্ন রহিয়াছে, সেইরূপ শরীর মথিবার মন্থনদণ্ড মনেও আট্‌টা অঙ্গ সংলগ্ন রহিয়াছে। এই অষ্টাঙ্গ-যুক্ত মনের দ্বারা শরীর মথিত হয় বলিয়াই ইহার অষ্টাঙ্গ-মৈথুন

নাম হইয়াছে। এই অষ্ট অঙ্গের দ্বারা মন শরীরকে মথিত করিয়া শুক্র নির্গত করে। হৃদয়ের মধ্যভাগে এক মনোবহা নাড়ী আছে, সেই শিরা মানবগণের সর্ব্বগাত্র হইতে সঙ্কল্প-জন্য শুক্রকে সঞ্চরণ করত উপস্থাভিমুখে আনয়ন করে। সর্ব্ব-গাত্রসন্তাপিনী শিরা সকল সেই মনোবহা নাড়ীর অনুগত তৈজস গুণ বহন করত, নয়নদ্বয়ের সন্নিহিত থাকে। দুগ্ধ-মধ্যে অন্তর্হিত নবনীত যেমন মন্থনদণ্ড দ্বারা মথিত হয়, সেই-প্রকার দেহস্থ সঙ্কল্প এবং ইন্দ্রিয়জন্য রমণীদর্শন ও স্পর্শনাদি দ্বারা শুক্র মথিত হইয়া থাকে। স্বল্পসময়ে মন যখন রমণী-বিষয়ক সঙ্কল্পজন্য অনুরাগ লাভ করে, তখন মনোবহা নাড়ী দেহ হইতে সঙ্কল্পজন্য শুক্র ক্ষরণ করে। অন্নরস, মনোবহা নাড়ী ও সঙ্কল্প এই তিনটি শুক্রের বীজ, এইজন্য উপবাসে শরীর বলহীন থাকা হেতু কামোদ্রেক থাকে না। এই অষ্টাঙ্গ-মৈথুন যিনি বর্জ্জন করিতে পারেন, তিনি ঊর্দ্ধরেতা হইতে পারেন। তাঁহারই ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধ হয়, তিনিই সর্ব্বজয়ী কন্দর্পকে জয় করিয়া বিশ্ববিজয়ী হইতে পারেন। শ্রবণ, কীর্ত্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সঙ্কল্প, অধ্যবসায়, ক্রিয়া-নিষ্পত্তি, ইহাকে অষ্টাঙ্গ মৈথুন-বলে।

অষ্টাঙ্গ-মৈথুন যথা—প্রথম, রসপূর্ব্বক রমণীসংক্রান্ত কথা শ্রবণকে শ্রবণ বলে। দ্বিতীয়, আগ্রহপূর্ব্বক স্ত্রীলোকসংক্রান্ত কথাবার্ত্তাকে কীর্ত্তন বলে। তৃতীয়, স্ত্রীলোকের সহিত সরস ক্রিয়াকে কেলি বলে। চতুর্থ, রসপূর্ব্বক রমণী-অঙ্গ দর্শনকে

প্রেক্ষণ বলে। পঞ্চম, রসপূর্ব্বক রমণীসংক্রান্ত নানা গুহ্য রহস্য কীর্ত্তনকে গুহ্যভাষণ বলে। ষষ্ঠ, পূর্ব্বোক্ত পঞ্চভাব স্মরণ করিয়া তাহা করিব কি না ইত্যাদি মনে করাকে সঙ্কল্প বলে। সপ্তম, পূর্ব্বোক্ত সঙ্কল্পভাবের পর স্ত্রীসংসর্গ করিব ইত্যাকার যে নিশ্চয়বুদ্ধি, তাহাকে অধ্যবসায় বলে। অষ্টম, মৈথুনান্ত শুক্র ত্যাগকে ক্রিয়ানিষ্পত্তি বলে।

মন এই অষ্ট অঙ্গের যে কোনও অঙ্গের দ্বারা শরীরকে মথিত করিয়া শুক্র নির্গত করিয়া আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তেজ নষ্ট করিয়া দেয়। এই অষ্ট অঙ্গের পরিবর্জ্জনকে ব্রহ্মচর্য্য বলে, অথবা এই অষ্ট অঙ্গের বিপরীত-যাহা তাহাই ব্রহ্মচর্য্য।

ভক্ত সাধকেরা বলেন, মনকে এই অষ্ট অঙ্গ, প্রাণসখা ভগবান্‌ই দিয়াছেন, ভগবৎদত্ত অঙ্গ কেন ধ্বংস করিব বা করিতে যাই। এই অষ্ট অঙ্গকে সৎব্যবহারে প্রয়োগ করিলেই হয়। এই অষ্ট অঙ্গকে ভগবৎ-অঙ্গে নিযুক্ত করিলে ইহার সৃষ্টির সার্থকতাও থাকে, ব্রহ্মচর্য্যও সিদ্ধ হয়, এবং অচিরাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তিও ঘটে। ভগবৎদত্ত পদার্থকে গ্রহণ না করিয়া কেন ত্যাগ করিতে যাই? যাহাতে বদ্ধাবস্থায়ও ব্রহ্মানন্দ ভোগ হয়, তাহাকে ত্যাগ না করিয়া গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। অতএব গ্রহণ করাই ভাল। ইহাদের ব্যবহার জানিলে ত্রিতাপযন্ত্রণা দূর হয়, ব্রহ্মানন্দ ভোগ হয়, এবং ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধ হয়। ভক্ত সাধকেরা ইহাকে কিরূপে ব্যবহার করেন, তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে।

ব্রহ্মচর্য্য

প্রথম শ্রবণ—ভগবৎতত্ত্বকথা বা ভগবদ্‌গুণানুবাদ শ্রবণকে শ্রবণ বলে। দ্বিতীয় কীর্ত্তন—ভগবদ্-নামগুণ কীর্ত্তনকে কীর্ত্তন বলে। তৃতীয় কেলি—ভগবৎক্রিয়া স্মরণ বা মনন ও ভগবানের অঙ্গ স্পর্শনাদিকে কেলি কহে। চতুর্থ প্রেক্ষণ—ভগবৎপ্রতিমা দর্শন, ভগবদ্‌রূপ স্মরণ করাকে প্রেক্ষণ বলে। পঞ্চম গুহ্যভাষণ—ভগবৎ সম্বন্ধে নানাপ্রকার গুহ্য কথাকে গুহ্যভাষণ বলে। ষষ্ঠ সঙ্কল্প—সংশয়াত্মক মনোভাব, ভগবৎসংসর্গ করিব কি না ইহাকে সঙ্কল্প বলে। সপ্তম অধ্যবসায়—সংশয়ের পর ভগবানে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকে অধ্যবসায় বলে। অষ্টম ক্রিয়ানিষ্পত্তি—পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ভাব তাঁহাতে সমর্পণ বা সমাধিকে ক্রিয়া-নিষ্পত্তি বলে।

উপরি-উক্ত অষ্টভাব যদি ভগবানে অর্পণ করা যায়, তাহা হইলে জগৎপ্রপঞ্চ ভুলিয়া যাইতে হয়, কাম ধ্বংস হয়, ব্রহ্মচর্য্য আপনা হইতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। যে ব্যক্তি স্ত্রীর চিন্তনাদি পরিবর্জ্জন করিয়া থাকেন, তিনিই ব্রহ্মচারী। যতকাল পর্য্যন্ত শুক্র ধৃত রহিবে, ব্রহ্মচর্য্যও সেই পরিমাণে সফলতা ধারণ করিবে; ব্রহ্মচর্য্য যে পরিমাণে সফলতা লাভ করিবে, সর্ব্ব-শক্তিসত্তাও সেই পরিমাণে আয়ত্ত হইবে।

বীর্য্যের বা চরম ধাতুর কণামাত্রও যদি বিকৃত না হয়, ভ্রমক্রমেও যদি তোমার মনে কামোদয় না হয়, স্বপ্নেও যদি তোমার কামচাঞ্চল্য না জন্মে, তাহা হইলে তোমার চিত্তে এমন এক অদ্ভুত সামর্থ্য জন্মিবে যে, তাহার বলে তোমার চিত্ত

সর্ব্বত্র অব্যাহত বা নিবিষ্ট থাকিবার যোগ্য হইবে। সর্ব্বপ্রকাশ-শক্তি আবির্ভূত হইবে। শরীরে যদি শুক্রধাতু প্রতিষ্ঠিত থাকে, বিকৃত না হয়, বিচ্যুত বা বিচলিত না হয়, কণামাত্রও যদি স্থানভ্রষ্ট বা স্খলিত না হয়, অচল, অটল্ এবং স্থির থাকে, ধৃত থাকে, তাহা হইলে বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়ের শক্তি বৃদ্ধি হয়, চিত্তের প্রকাশশক্তি বাড়িয়া যায়, রাগ দ্বেষ অন্তর্হিত হয়, কাম ক্রোধাদি হ্রাস হইয়া পড়ে। অতএব শরীরস্থ শুক্রধাতুকে অবিকৃত, অস্খলিত, অবিচলিত রাখিবার জন্য তুমি রসপূর্ব্বক বা কামভাবে স্ত্রীলোকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দর্শন ও স্পর্শনাদি পরিত্যাগ করিবে। ক্রীড়া, হাস্য, পরিহাস বর্জ্জন করিবে। তাহাদের রূপ লাবণ্য মনেও করিবে না। কিছুদিন এইরূপ করিলে তোমার ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধ হইবে এবং সুদৃঢ় হইবে। অনন্তর তাহা হইতে তোমার আত্মার এক-প্রকার আশ্চর্য্য শক্তি—যাহার নাম ব্রহ্মতেজ, তাহার প্রাদুর্ভাব হইবে এবং তাহা হইতে তোমার মুখশ্রী ফিরিয়া দাঁড়াইবে। মানসিক সৌন্দর্য্য ও সদ্‌গুণ সকল অপ্রতিহত হইয়া থাকিবে। স্ত্রীসঙ্গ-রাহিত্যে আয়ু, বর্ণ, বল স্থির থাকিবে; রোগ জন্মিবে না; ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু দ্বারা অভিভূত হইবে না; শরীরে জরা প্রবেশ করিবে না অর্থাৎ অজর ও অমর হইবে অর্থাৎ তুমি মৃত্যুর অধীনে না থাকিয়া, মৃত্যু তোমার অধীন হইবে। এই অনিত্য শরীরে নিত্যতা লাভের সাহায্যকারী যদি কোনও পদার্থ থাকে, তবে তাহা শুক্র; যাহার

ধারণে মোহ, তন্দ্রা, ভ্রম, রুক্ষ রস, উল্বণ কাম, লোলতা, মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা, খেদ, পরিশ্রম, অসত্য, ক্রোধ, আকাঙ্ক্ষা, আশঙ্কা, বিশ্ব বিভ্রম, বিষমত্ব, পরাপেক্ষা—এই অষ্টাদশ মহাদোষ-বর্জ্জিত হওয়া যায়।

শুক্রই দেহভাণ্ডারের পরম ধন। মানবের জীবনস্বরূপ এই পদার্থ পুনঃ পুনঃ রক্তমধ্যে পরিগৃহীত ও পরিচালিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গব্যাপী হয় এবং মানবকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব-সম্পন্ন, শূর, ধীর, গম্ভীর, একাগ্র, সুদৃঢ়াঙ্গ, সাহসী, কার্য্য-শক্তিমান্, বীর ও বীর্য্যবান্ করে। আর এই পদার্থের অপচয়ে মানুষকে ক্ষীণ, বলবীর্য্যহীন ও নিতান্ত চপলচিত্ততায় দীনভাবাপন্ন করিয়া ফেলে এবং তাহার শারীরিক ও মানসিক প্রতিভা-শক্তি সমস্তই হ্রাস হয়; তাহার আভ্যন্তরিক শরীর-যন্ত্রের ক্রিয়া-বিশৃঙ্খলা ঘটে, কর্ম্মেন্দ্রিয়-জ্ঞানেন্দ্রিয়-বৃত্তি বিকৃত হয়, পেশীসমূহের কার্য্য বিশৃঙ্খল হয়, স্নায়ুবিধান নিতান্ত হীনতাপ্রাপ্ত হয় এবং অবশেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে। শুক্র দ্বারা বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়। কামজিত মানব কামজয়ী হইতে পারিলে দিব্য দেহ ও দেবত্ব লাভে সমর্থ হয়। আমরা ভগবান্‌কে হৃদয়ে স্থাপিত করিতে ইচ্ছা করি, পারি না কেন? ব্রহ্মচর্য্যের অভাবই তাহার কারণ।

ব্রহ্মচর্য্য সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে, সেইজন্য সমস্ত ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যেহেতু মনুষ্য তাহা দ্বারা পরমগতি প্রাপ্ত হয়। যিনি পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয়, এই

সপ্তদশ-অবয়ববিশিষ্ট লিঙ্গশরীর-সংযোগবিহীন, যিনি শব্দ-স্পর্শ-বৰ্জ্জিত, শ্রোত্র দ্বারা যাঁহাকে শ্রবণ এবং চক্ষু দ্বারা যাঁহাকে দর্শন করিতে পারা যায় না, আর বাক্শক্তি যাঁহাকে ব্যক্ত করিতে সমর্থ নয়, যিনি বিষয়েন্দ্রিয়বৰ্জ্জিত হইয়া কেবল মনোমাত্রে অবস্থান করেন, সেই পাপস্পর্শ-বিরহিত ব্রহ্মচর্য্যকে জানিতে, যে সুধী, সে আপনি যত্নশীল হইবে। যিনি সম্যক্‌রূপে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতে পারেন, তিনি সৰ্ব্ব-শক্তিমান্ ও মোক্ষবান্ হইতে পারেন ; মধ্যমভাবে ব্রহ্মচারী মানব সত্য লোকে গমন করেন ; যিনি কনীয়সী অর্থাৎ নীচবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন, সেই দ্বিজবর বিদ্বান্ হন। যে ব্যক্তি ইহলোকে জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার কিছুই অপ্রাপ্য নাই। ঋষিগণের সেই ব্রহ্মচর্য্যের ফল ইহলোকেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মহর্ষিগণ স্বীয় স্বীয় বিজ্ঞানবলে নানাপ্রকার ধৰ্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়সংযমই তাঁহাদের মতে সৰ্ব্ব-প্রধান। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা দমগুণকে মুক্তিলাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। দমগুণ সকল লোকেরই, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের সনাতন ধৰ্ম্ম। দমগুণ-প্রভাবেই ব্রাহ্মণের সৰ্ব্বকাৰ্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। দমগুণ—দান, যজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; উহা দ্বারা তেজ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। দমগুণের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই। লোকে দমগুণ-প্রভাবেই পাপবিহীন তেজস্বী হইয়া ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকে।

ব্রহ্মচর্য্য

দমগুণ অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। দমগুণ হইতে ইহলোকে সিদ্ধি ও পরলোকে সুখ লাভ করিতে পারা যায়। দমগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তি অনায়াসে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম লাভে সমর্থ হয় এবং নির্ভয়ে নিদ্রাসুখ অনুভব, নির্ভয়ে জাগরণ ও নির্ভয়ে জনসমাজে বিচরণ করিতে পারে। তাহার অন্তঃকরণ সততই প্রসন্ন থাকে। যে ব্যক্তি দমগুণ-বিহীন, তাহাকে নিরন্তর ক্লেশ ভোগ করিতে হয় এবং সে আপনার দোষে বহু অনর্থ উৎপাদন করে। চারি আশ্রমেই দমগুণ উৎকৃষ্ট ব্রত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। দমগুণই ক্ষমা, ধৃতি, অহিংসা, সমদর্শিতা সত্য, সরলতা, ইন্দ্রিয়পরাজয়, দক্ষতা, মৃদুতা, লজ্জা, স্থিরতা, অদীনতা, অক্রোধ, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, অনসূয়া, গুরুপূজা প্রভৃতি, ও দয়ার উৎপত্তিকর কারণ। দমগুণান্বিত মহাত্মারা কদাচ ক্রুর ব্যবহার, মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ এবং অন্যের অপমান, উপাসনা বা নিন্দা করেন না। কাম, ক্রোধ, লোভ, দর্প, আত্মশ্লাঘা, ঈর্ষা ও বিষয়ানুরাগ এককালে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন; অনিত্য সুখ লাভে তাঁহাদিগের কখনই তৃপ্তি হয় না। দমগুণ-প্রভাবেই হৃৎপদ্মনিহিত অবিরোধী সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পিতামহের তপোরাশিসমুদ্ভব, গুহামধ্যে আবৃত যে নিত্য-লোক আছে, তাহা ইন্দ্রিয়বিজয় দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। দমগুণসম্পন্ন ব্যক্তির অরণ্য-গমনের প্রয়োজন নাই। তিনি যে স্থানে বাস করেন, সেই স্থানই অরণ্য ও পুণ্যাশ্রম।

তত্ত্ববোধ

যিনি ইন্দ্রিয়সমুদয়কে দমন এবং মনকে বশীভূত করেন, ইন্দ্রিয়গণ তাঁহার নিকট প্রকাশিত হয়। প্রকাশ হইবার পর প্রফুল্ল হইয়া পরমানন্দে সেই যোগীশ্বরে প্রবেশ করে। যেমন ইন্ধন দ্বারা হুতাশন বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইলে বুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। এই সমুদয় ইন্দ্রিয়গণের সহিত যাঁহার মন সংযুক্ত হইয়াছে, তাঁহার সকাশে সেই পরব্রহ্ম প্রকাশিত হন। এই সমস্ত ইন্দ্রিয় অপগত হইলে সত্ত্বমাত্রে অবস্থিত আত্মা ব্রহ্মরূপে কল্পিত হইয়া থাকেন।

দান্ত পুরুষেরা সর্ব্বত্র সুখ সম্ভোগ করেন এবং সকল স্থানেই নিবৃ'ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা যে স্থানে ইচ্ছা করেন, তথায় গমন করিতে পারেন; তাঁহাদের কুত্রাপি গমনের প্রতিরোধ নাই, অর্থাৎ তিনি অব্যাহতগতি হন এবং সমস্ত শত্রুগণকে মিথুন করেন। দান্ত পুরুষগণ যাহাই প্রার্থনা করেন, তাহাই প্রাপ্ত হন, তাহাতে কোনও সংশয় নাই। দান্ত পুরুষেরা সর্ব্বকামমুক্ত হইয়া থাকেন। দান অপেক্ষা দম বিশিষ্ট, যেহেতু দাতা কুপিত হইতে পারেন, কিন্তু দান্ত কুপিত হইতে পারেন না।

ব্রহ্মচর্য্য যাহা, ব্রহ্মও তাহা। ইহার লয় নাই, ক্ষয় নাই, ছেদ নাই, ভেদ নাই, দাহ নাই, মহাপ্রলয় নাই। ইহা ভূলোক, দ্যুলোক, দেবলোকের ধ্বংসকালেও দেদীপ্যমান। ইহা সর্ব্বকালের অতীত; কালের ধ্বংসে, স্থূল, সূক্ষ্ম, উভয়েরই সংহারে ইহার সত্তা সমভাবে বিদ্যমান থাকে।

ব্রহ্মচর্য্য

কোন্ পদার্থের নাম অমৃত ? যাহা পান করিলে মৃত হয় না, তাহাই অমৃত। যাহা পান করিলে মৃত্যু হয় না, ক্ষণস্থায়ী মৃত্যুময় সংসারে চিরস্থায়ী অমৃতময় হওয়া যায়, এমন মহান্ পদার্থ কি আছে ? তাহার নাম কি ? তাহার নাম অমৃত, তাহার নাম শুক্র ; শুক্রই অমৃত, অমৃতই শুক্র। উহা যে পান করে, সেই অমৃত হয় ; উহা আত্মার আহার্য্য। আমরা যেমন আহার করিলে পুষ্ট হই, আহার না করিলে ক্ষীণ হই, সেইরূপ আত্মাও আহার করিলে পুষ্ট হন, আহার না করিলে ক্ষীণ হন। আত্মার আহার কিরূপ ? শুক্রধারণ-রূপ ব্রহ্মচর্য্য আত্মার আহার, তদ্দারা আত্মার আহার সিদ্ধ হয়। তদ্দারা আত্মা পুষ্ট হন, তুষ্ট হন, হৃষ্ট হন, ও অমৃতময় হন। এইরূপে আত্মাকে অমৃত পান করাইয়া তাঁহার উদ্ধার করিতে হয়।

আমরা যেমন আহারের দ্বারা পুষ্ট করিয়া শরীরকে নিকট-মরণ হইতে উদ্ধার করি, আত্মাও সেইরূপ অমৃত পান করিয়া অমর হন। যে আত্মা নিজ আত্মাকে ব্রহ্মচর্য্যরূপ অমৃত পান করাইয়া মৃত্যু হইতে উদ্ধার করেন, যে আত্মা ব্রহ্মচর্য্যপুরঃসর জিতেন্দ্রিয় হইয়া আত্মজিত হইয়াছেন, যে আত্মা অমৃতবর্ষী ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠানে আপনাকে জন্ম-জরা-মরণাদি শোকসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া সত্যময়, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প, বিশোক, বিজর, বিমৃত্যু অর্থাৎ অমৃতময় করিয়াছেন, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু ; আর যে করে নাই, সেই আত্মাই আত্মার শত্রু।

তত্ত্ববোধ

এই মৃত্যুময় সংসারসাগরে বহিঃস্থ শত্রু আমাদিগের যে অনিষ্ট সাধন করে, তাহা অকিঞ্চিৎকর, মিথ্যা ও ক্ষণ-ধ্বংসী। বহিস্থ মিত্র আমাদের যে প্রীতি বর্দ্ধন করে, তাহা ক্ষণিক, কল্পিত ও যৎসামান্য মাত্র। আমিই আমার যে অনিষ্ট এবং ইষ্ট সংসাধন করি, তাহা অব্যর্থ, স্থায়ী ও বিশেষ ফল-প্রদ। তুমি জড়-বিজ্ঞানের সাহায্যে মারিবার কল, বাঁচাইবার কল, যাহাই কেন আবিষ্কার কর না, ব্রহ্মচর্য্য মহাবিজ্ঞানের আবিষ্কারের নিম্নে থাকিতেই হইবে। ব্রহ্মচর্য্য-উত্থিত যাহা, তাহাই বিজ্ঞান; ব্রহ্মচর্য্য-অনুত্থিত যাহা, তাহাই অজ্ঞান। ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত যে উৎপত্তি, তাহা উৎপত্তি নয়, প্রলয়; উত্থান নয়, পতন। জীব কেন এত হীন ? যেহেতু অমৃত পানে দীন। এত হীন থাকিবে কত দিন ? অমৃত পান না করিবে যত দিন। অমৃত পানে আত্মা পুষ্ট হইলে কি উপকার সাধিত হয়, কি লাভ হয়? শক্তিই আয়ত্ত হয়। এ বৃক্ষে সকল ফলই ফলে, সকল শক্তিই ধরে, কোনও শক্তিরই অভাব হয় না। এ বৃক্ষ হইতে যে শক্তি বাহির হইবে, তাহাও অমৃতময় হইবে অর্থাৎ সে শক্তিকে কোনও শক্তি পরাভব করিতে পারে না, সুতরাং অমৃতময়। এ বৃক্ষ হইতে যাহা বাহির হইবে, তাহা ধীর, স্থির, নির্ভীক ও বহুপ্রসারিণী শক্তির আধারভূত হইবে।

যে কল্পবৃক্ষের ছায়াতে ত্রিতাপী আর্য্য শীতল হইত, যাহা অতি স্বাদু, অমৃতবর্ষী, অতি আয়াসে সেই অমৃতময়

ব্রহ্মচর্য্য

ব্রহ্মচর্য্য-কল্পবৃক্ষ সাধারণের নিকট ধরিলাম। হে বিষাদ-দগ্ধ বিষয়বিষরত আর্য্যগণ, ভক্তিভাবে ইহার আশ্রয় লও, তাপিত প্রাণ শীতল কর, অমৃতময় ফল ভোগ করিয়া অমর হও। পুনঃ মধুর হাসি হাস, প্রেমানন্দে নাচ। এই অসীমের গুণ বর্ণনা করিতে হতবুদ্ধি হইতে হয়। যদি সুখে সংসারে বাস করিতে চাও, তবে ব্রহ্মচর্য্য-কল্পবৃক্ষের আশ্রয় ব্যতীত অন্য কোনও উপায় নাই।

সন্ন্যাস ও আনন্দ

যিনি কোনও পদার্থের দ্বেষ করেন না এবং কোনও পদার্থের আকাঙ্ক্ষাও রাখেন না, তিনিই নিত্য-সন্ন্যাসী। নিত্যতৃপ্তের আকাঙ্ক্ষা কোথায়? নিত্যানন্দের দ্বেষ কোথায়? সংসার ত্যাগ করিলেই যে প্রকৃত সন্ন্যাসী হওয়া যায়, তাহা নয়। অহংত্যাগী যিনি, প্রকৃত সন্ন্যাসী তিনি। যিনি মদবর্জ্জিত, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। যিনি অহংত্যাগী, তিনিই মদবর্জ্জিত। জীব অহংকারের অধীন, জীবের কার্য্য অহংমূলক স্বার্থপর। যিনি পরার্থপর, তিনিই সন্ন্যাসী। জীবের অহংতত্ত্ব স্বার্থ দ্বারা সঙ্কীর্ণ, আর প্রকৃত সন্ন্যাসী নিঃস্বার্থ-পরার্থ দ্বারা প্রশস্ত। সন্ন্যাসি-জীবনে যত কিছু কার্য্য, সমস্তই পরার্থ। যিনি নিজ রাজ-ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া ভোগবিরত হইয়া, অহংমমেতি আবরণ দূর করিয়াছেন, তিনিই পূর্ণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। সংসারে যদি প্রকৃত সন্ন্যাসী কেহ থাকেন, তবে তিনি অহংমমেতি ন্যাস করিয়া পূর্ণ ত্যাগী, ও বাসনা ক্ষয় করিয়া পূর্ণ সন্ন্যাসী হইয়াছেন, এবং তিনিই সন্ন্যাসিশ্রেষ্ঠ যোগিরাজ। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই সন্ন্যাসীর প্রধান লক্ষণ। দার-পরিত্যাগ হেতু কামিনীত্যাগ, সংসার বা রাজ্যত্যাগ হেতু কাঞ্চনত্যাগ সিদ্ধ হয়।

ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব, শিবের শিবত্ব, কৃষ্ণের ভোগ,

ইন্দ্রচন্দ্রাদির ভোগ, সমস্ত ভোগই পূর্ণ সন্ন্যাসি-ভোগের অন্তর্গত। তদতিরিক্ত পূর্ণভোগ যোগিরাজেতেই পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত, অথচ তিনি পূর্ণ উদাসীন, পূর্ণ ত্যাগী, পূর্ণ বিরাগী, সুতরাং পূর্ণ সন্ন্যাসী। কেহ কেহ এমন সন্ন্যাসিশ্রেষ্ঠ আছেন যে, তিনি পূর্ণ গৃহী, পূর্ণ কামিনী-কাঁঞ্চন-অধিপতি। কাঞ্চন-ত্যাগী বটে, অথচ পূর্ণ ঐশ্বর্য্যশালী, সুবর্ণ-কোদণ্ডধারী। নির্লিপ্ততা হেতু সন্ন্যাসী কামিনীত্যাগী বটে, কিন্তু সর্ব্বশক্তিপতি। ভগবান্ ব্রহ্মা গায়ত্রী ও সাবিত্রীপতি, বিষ্ণু লক্ষ্মী ও সরস্বতীপতি, শিব দশমহাবিদ্যাপতি, শ্রীকৃষ্ণ ষোড়শসহস্র-গোপীপতি কিন্তু যিনি পূর্ণ সন্ন্যাসী, তিনি সর্ব্বশক্তিপতি, সর্ব্বশক্তিভোগী, সুতরাং পূর্ণ গৃহী হইয়াও পূর্ণ সন্ন্যাসী।

প্রকৃত সন্ন্যাসী কি পদার্থ ? যে পুরুষ সন্ন্যাসপুরঃসর তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মবিদ্ হইয়াছেন এবং সর্ব্বাত্মক হইয়াছেন। শব্দস্পর্শাদি গুণপঞ্চক, পৃথিব্যাদি ভূতপঞ্চক, চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক, প্রাণাদি বায়ুপঞ্চক, সন্ন্যাসপ্রাপ্ত তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষ এই সকল বস্তুর স্বরূপভূত হইয়া থাকেন, এক কথায় সর্ব্বজগৎস্বরূপ হন। তত্ত্ববিদ্ পুরুষ ব্রহ্মার স্বরূপ বলিয়া সত্যময়। তিনি তেজোময় স্বয়ং-প্রকাশশীল, তিনি মায়াময় সংসারের উর্দ্ধে বাস করেন। অতএব দোষ গুণ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি দোষগুণবর্জ্জিত হন। আত্মদান অপেক্ষা দুষ্কর কর্ম্ম জগতে আর কিছুই নাই; জননীকে অতিক্রম করিয়া

আশ্রমান্তর-গমনে ধর্ম্ম নাই ; বেদজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠতর আর কেহই হইতে পারে না ; এবং সন্ন্যাস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তপস্যা আর কিছুই নাই। দুর্ব্বলচিতি সংসারত্যাগী—ত্যাগী সন্ন্যাসী, আর সরলচিতি সংসারভোগী—ভোগী সন্ন্যাসী।

জ্ঞান ও আনন্দে যে প্রভেদ, সুখ ও আনন্দে সেই প্রভেদ। যে সুখের বিচ্ছেদ নাই, তাহার নাম আনন্দ ; সুখের আশ্রয় বিষয়, আনন্দের আশ্রয় আত্মা। সুখ বিষয়কে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয়, সুখের আবির্ভাব তিরোভাব আছে ; আনন্দ চৈতন্যের সহচর, তাহা নিত্য, তাহার আবির্ভাব তিরোভাব নাই। প্রকৃতিসংযোগ-জন্য রূপরসাদির অনুভবে সুখের উৎপত্তি হয়। আত্মাতে যে আনন্দ, তাহা অবিচ্ছিন্ন, নিত্য ও চিরাভ্যস্ত বলিয়া বিশেষ প্রণিধান ব্যতিরেকে অনুভব হয় না। আবরণের তারতম্য-অনুযায়ী আনন্দের ইতরবিশেষ হয়। প্রাণী মাত্রেরই কিছু না কিছু আনন্দ আছে ; আত্মা মাত্রেই আনন্দ-অনুভব আছে। আত্মা যেমন স্বীয় অস্তিত্ব ও অবস্থা সর্ব্বদা অনুভব করে, তেমন সেই অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে একটি অনির্ব্বচনীয় প্রীতি বা মধুরভাবেরও অনুভব করে। আত্মার মধুরভাবের অনুভবের প্রমাণ কি ? তাহার প্রমাণ এই যে, আত্মার স্বীয় অস্তিত্বানুভব সর্ব্বদাই মধুরভাবময় ; সেই মধুরভাবের নামই আনন্দ। যখন মৃত্যুর বা আত্মার সম্ভাবিত বিনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হয়, তখন সেই মধুরভাব বিশেষ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। অসহ্য যন্ত্রণায়

মধ্যেও মনুষ্য মরিতে চাহে না, কেননা তৎকালেও স্বীয় সত্তানুভবের সঙ্গে সঙ্গে একটি আনন্দপ্রবাহ বিদ্যমান রহিয়াছে; মরিলে পাছে সেই অস্তিত্ব একেবারে দীপশিখার ন্যায় নির্ব্বাপিত হইয়া যায় এবং তৎসহকৃত আনন্দের বিলোপ হয় তজ্জন্যই মরণের এত ভয়। মরিলেও আত্মার অস্তিত্ব থাকিবে, এইরূপ বিশ্বাস জন্মিলে মরণের ভয় আর হইতে পারে না। যখন সুখ অনুভব হয়, তখন তাহার সঙ্গে যেন কিছু আনন্দ আছে বলিয়া বোধ হয়; তাহার কারণ এই; দুঃখকে সকলেই দুর করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সুখকে কেহ ছাড়িতে ইচ্ছা করে না। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, দুঃখ জীবের অত্যল্প আনন্দকেও দূর করিতে চায়, অর্থাৎ দুঃখ আনন্দকে আবরণ করে, সেইজন্য লোকে দুঃখের আবরণ উন্মোচন করিবার চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে সুখ আনন্দের সাহায্যকারী, সেই হেতু সুখ পাইবার জন্য লোকের আগ্রহ; তাহার কারণ দেখা যায় যে, লোকে সৎকার্য্য করিয়া সুখ এবং আনন্দ দুই পায়, সেইজন্য সুখ আনন্দের আবরণকারী না হইয়া প্রত্যুত সাহায্যকারী হয়।

বিশ্ব আনন্দ হইতে উৎপন্ন হইয়া আনন্দ দ্বারা জীবিত থাকে এবং অন্তকালে আনন্দেতে বিলীন হয়, অতএব আনন্দ হইতে জগৎ কি প্রকারে পৃথক্ হইবে? কোন্ পদার্থের নাম আনন্দ? শুক্রই আনন্দ, আনন্দই শুক্র। শুক্রমূলী যে কাম, তাহার স্মরণে আনন্দ, ব্যবহারে আনন্দ, ত্যাগে আনন্দ। যে

পদার্থ শরীর হইতে নির্গত হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আনন্দ দিতে বিরত হয় না, যাহার স্মরণ হইতে ত্যাগ পর্য্যন্ত আনন্দ জন্মে, তাহা আনন্দময়। সেই আনন্দময় পদার্থ যদি শরীরে ধৃত থাকে, তাহা হইলে শরীর কত নীরোগ, মন কত পুলকিত থাকে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। আনন্দ দুই ভাগে বিভক্ত—পূর্ণানন্দ ও খণ্ডানন্দ। খণ্ড শুক্রে খণ্ডানন্দ; অখণ্ড শুক্রে পূর্ণানন্দ বা অখণ্ডানন্দ। বীর্য্যানুযায়ী আনন্দের তারতম্য কল্পিত হয়। যার যত বীর্য্য, তার তত আনন্দ। মনুষ্যের স্বাভাবিক আনন্দ এক, মনুষ্য হইতে মনুষ্য গায়কের একশত গুণ আনন্দ, মনুষ্য গায়ক হইতে একশতগুণ গন্ধর্ব্বানন্দ, গন্ধর্ব্বানন্দ হইভে শতগুণ পিতৃলোকের, পিতৃলোক হইতে শত গুণ অজানজ দেবতাদের, অজানজ দেবতা হইতে শতগুণ দেবতাদের, দেবতাদের হইতে শতগুণ কর্ম্মদেবের, কর্ম্মদেব হইতে শতগুণ ইন্দ্রানন্দ, ইন্দ্রানন্দ হইতে শতগুণ বৃহস্পতির, বৃহস্পতি হইতে শতগুণ ব্রহ্মার বা ব্রহ্মালোকবাসীর। এই সমস্তই খণ্ডানন্দ। এতদূর্দ্ধ বাক্যমনের অগোচর যে আনন্দ, তাহাই অখণ্ড পূর্ণানন্দ।

গ্লানি হইলেই আনন্দের হ্রাস, আনন্দ হইতেই গ্লানির নাশ অবশ্যম্ভাবী। সদানন্দ পদার্থে গ্লানি নাই, বিষাদ নাই, দৈন্য নাই। সদানন্দ পদার্থে ব্যাধি কোথায়, জরা কোথায়, দুঃখ কোথায়, বিষাদ কোথায়? নাহি রোগ, নাহি শোক, নাহি দুঃখ, নাহি ভোগ; নাহি খেদ, নাহি শ্রান্তি, নাহি কাম, নাহি ভ্রান্তি,

সন্ন্যাস ও আনন্দ

নাহি তৃষ্ণা, নাহি ক্লান্তি ; নাহি ক্ষুধা, নাহি ক্ষোভ, নাহি ক্রোধ, নাহি লোভ। পূর্ণানন্দ পদার্থে যখন শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, দুঃখ নাই, চিন্তা নাই, ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, ছেদ নাই, ভেদ নাই, শোষণ নাই, দাহ নাই, সুতরাং যিনি পূর্ণানন্দ, তাঁহাতে এবং ঈশ্বরে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

স্বাধীন ও পরাধীন

এই বিশ্ব শক্তিরই খেলা। বিশ্বের যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, সেই দিকেই দেখি কোনও এক মহাশক্তি স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল, দ্যুলোক, ভূলোক, গোলোক, ব্রহ্মলোক ব্যাপিয়া আব্রহ্ম কীট সকলেরই উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। যে দিকে যে ভাবে ইচ্ছা, সেই দিকে সেই ভাবে চালাইতেছে। শক্তিচক্রে কলুর বলদের ন্যায় সমস্ত ঘুরিতেছে, যেন কাহারও স্বাধীনতা নাই, সকলেই শক্তির বশ, সকলেই শক্তির অধীন। বিশ্ব যেন শক্তিবশে চলিতেছে, শক্তিবশেই কার্য্য করিতেছে। সংসারে সকলেই স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য লালায়িত, কেবল আপন বশে থাকিতে অর্থাৎ স্বাধীন ভাবে থাকিতে চায়। সংসারে স্বতন্ত্র হইতে ইচ্ছুক সকলেই; কয়জনে সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে, এবং কয়জনে স্বাধীন হইতে পারে? সংসারে কামের অধীন থাকিয়া কে কবে স্বাধীন হইতে পারিয়াছে? কামনাধীনই পরাধীন। কামনার অধীন থাকিয়া কেহ স্বাধীন হইতে পারে নাই, পারিবেও না। কামনা-মুক্ত যে দিন, স্বাধীন হবে সেই দিন। সংসারে কামনাহীন কে আছে? দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি, তাঁহারাও কোন না কোন রিপুর, কোন না কোন ভাবের অধীন আছেনই। কেহ লোভের অধীন, কেহ ক্রোধের অধীন, কেহ অভাবের অধীন, কেহ স্বভাবের অধীন,

কেহ ভোগের অধীন, কেহ যোগের অধীন, কেহ শোকের অধীন, কেহ মোহের অধীন, ইত্যাদি। অধীনতা-শৃঙ্খলে বিশ্ব শৃঙ্খলিত। কাহার সোণার বেড়ী, কাহার রূপার বেড়ী, কাহার লোহার বেড়ী, এই মাত্র প্রভেদ। তবে কেমন করিয়া বলিব বিশ্ব স্বাধীন? কেমন করিয়া বলিব তুমি বিশ্ব ছাড়া স্বতন্ত্র? তুমি যে নিজেকে স্বাধীন বলিয়া মনে করিতেছ, বল দেখি তোমার জীবনে কোনও দিন স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছ? আজীবনই দেখিতেছি তুমি পরাধীন।

মাতৃ-কুক্ষিতে আবির্ভূত হইতে পুনঃ মাতৃগর্ভে প্রবেশ পর্য্যন্ত তোমার ধারাবাহিক জীবনই পরাধীন। কে স্ব-ইচ্ছায় মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিতে চায়? বাল্যকাল বল, যৌবন বল আর বার্দ্ধক্য বল, কোনও কালেই সুখ নাই। পীড়ার যন্ত্রণায় চিরকালই কষ্টভোগ করিতে হয়, অবশেষে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। যখন মৃত্যুকাল আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন মৃত্যুযন্ত্রণায় ও ভয়ে ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে, তথাপি মরিতে চাহে না, তবু যেন কোনও অজ্ঞাত শক্তি আসিয়া ঘাড় ধরিয়া লইয়া যায়; ইহাকেই কি বলিবে স্বাধীনতা? অবোধ আর কারে বলে? সুদীর্ঘ জীবন শক্তিবশে দীনহীনের ন্যায় পরাধীন ভাবে কাটাইলে, বল দেখি কোন্ সময় তুমি স্বাধীন ও সুখী হইয়া কাটাইয়াছ। কেমন করিয়া বলিব তুমি স্বাধীন? মাতৃগর্ভ হইতে পরতন্ত্র হইয়া বাহির হইয়াছ, পুনঃ পরতন্ত্র হইয়া মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিবে, বল দেখি তুমি স্বতন্ত্র ছিলে?

তত্ত্ববোধ

আশা-তৃষ্ণার জোরে, কাম-যন্ত্রণার ঘোরে বিশ্বে সকলেই মোহাভিভূত। এই যে আব্রহ্ম কীট ক্ষুধাতৃষ্ণার জোরে, রাত-শ্লেষ্মার বিকারে, রোগশোকের তাড়নে, শীতগ্রীষ্মের পীড়নে ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, তাহা স্ববশে কি অবশে ? ইচ্ছায় কি অনি-চ্ছায় ? অবশ্য বলিতে হইবে অবশে ও অনিচ্ছায়। যদি অবশে ও অনিচ্ছায় সকলকেই যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল, তাহা হইলে তাহাদিগকে স্বাধীন বলিব কিরূপে ? সেইজন্য বলিতে বাধ্য, বিশ্বশক্তি পরাধীন। তবে কি জগতে স্বাধীন শক্তি নাই ? বিশ্বে কি পূর্ণশক্তির অভাব ? পূর্ণশক্তির অভাব হইলে পূর্ণের আদর্শ কোথায় পাইবে ? কোন্ আদর্শে আমরা পূর্ণাভিমুখে ধাবিত হইব ? কোন্ আদর্শে আমরা স্বাধীনতা লাভ করিব ? অতএব জগতে যখন অধীন শক্তি আছে, তখন স্বাধীন শক্তিও আছে। অপূর্ণ থাকিলেই পূর্ণ আছে।

সর্ব্বশক্তির উপর আধিপত্যকারী স্বাধীন শক্তি কোথায় আছে ? শিবলোক, ব্রহ্মলোক, ভূলোক, গোলোক খুজিলাম, কোথাও স্বাধীন শক্তির সমাবেশ দেখিতে পাইলাম না ; তবে কি স্বাধীন শক্তি বিশ্বে নাই ? হাঁ আছে। সর্ব্বাধিপত্য স্বাধীন পূর্ণ শক্তি গোলোক, শিবলোক, ব্রহ্মলোকে নাই, আছে তাহা মর্ত্তে ; বিশ্বে নাই, আছে তাহা বিশ্বকেন্দ্রে ; দেব, যক্ষ, নরে নাই, আছে তাহা আর্য্যে। বিশ্বকেন্দ্র ভারতে, শক্তিকেন্দ্র আর্য্যাতে একমাত্র এই স্বাধীন শক্তির সমাবেশ। এই শক্তির নাম "ভীষ্মশক্তি" ও "হনুমংশক্তি"। ইঁহাদিগের শুক্র অচ্যুত, সেইজন্য পূর্ণ স্বাধীন।

স্বাধীন ও পরাধীন

যাঁহার শক্তি খণ্ডিত হয় নাই, তিনিই অখণ্ডশক্তিমান্। অখণ্ডশক্তিমান্, পূর্ণশক্তিমান্, সর্ব্বশক্তিমান্ একই কথা। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহাতে শক্তিবশ ও শক্তি বিরাজমান; সুতরাং তিনি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। জীব মাত্রেই অষ্টাদশ-মহাদোষ-সংযুক্ত, সেইজন্য অধীন বা পরাধীন। অষ্টাদশ মহাদোষ কি? মোহ, তন্দ্রা, ভ্রম, রুক্ষ রস, উল্বণ কাম, লোলতা, মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা, খেদ, পরিশ্রম, অসত্য, ক্রোধ, আকাঙ্ক্ষা, আশঙ্কা, বিশ্ববিভ্রম, বিষমত্ব ও পরাপেক্ষা—এই অষ্টাদশ মহাদোষ।

মোহ—দেহাদিতে আত্মবুদ্ধির নাম মোহ। কোনও বস্তুতে আত্মসম্বন্ধ স্থাপন করার নাম মোহ। মুগ্ধত্বই সকল দুঃখের মূল। প্রকৃতি নানা সাজে হাবভাবে পুরুষকে মোহিত করিতেছে, পুরুষ তাহাতেই মুগ্ধ হইতেছে, ইহারই নাম মোহ, অজ্ঞান, অবিদ্যা ইত্যাদি। ইহাই সমস্ত দুঃখের মূল। হর্ষ, বিচ্ছেদ, দুঃখ, ভয়, বিষাদাদি হইতে মনের যে মূঢ়তা, দৈন্যাদি হইতে কাতরতা, তাহারই নাম মোহ। প্রকৃতি কাহাকে মুগ্ধ করে? লোভীকেই মুগ্ধ করে, লোভীরই মোহ, মোহগ্রস্তেরই পতন।

মোহ একটি বৃক্ষ, পাপরূপী লোভ ইহার বীজ, মিথ্যা তাহার সুবিস্তীর্ণ শাখা, দম্ভ ও কুটিলতা তাহার পত্র, কুকার্য্যরূপ পুষ্প দ্বারা সদাই পুষ্পিত, পরনিন্দা-গন্ধের দ্বারা সুরভিত, অজ্ঞানরূপ ফলের দ্বারা ফলিত। মোহরূপ বৃক্ষে মায়ারূপ শাখাকে ছদ্ম, পাষণ্ড, চৌর, কূট, ক্রূর, পাপী সকল আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে; সেই অজ্ঞানরূপ ফল হইতে অধর্ম্মরূপ মধু নির্গত হইতেছে।

যে সকল লোক এই বৃক্ষের ছায়া আশ্রয় করিয়া তাহার ফল খাইয়া দিন দিন পুষ্ট হইতেছে, মৃত্যুরূপ পতনে তাহারা রসাতলগামী হয়।

মোহ কার? লোভ যার। লোভ কার? অভাব যার। অভাব কার? অপূর্ণ যার। অপূর্ণ কার? ভাগ হয় যার। মোহ নাই কার? লোভ নাই যার। লোভ নাই কার? অভাব নাহি যার। অভাব নাহি কার? অপূর্ণ নাই যার। অপূর্ণ নাই কার? ভাগ হয় নাই যার। যাহার অভাব হইয়াছে, তাহার অভাব পূরণের জন্য লোভ হইয়াছে; সুতরাং মোহ জন্মিয়াছে।

তন্দ্রা—কার্য্যহেতু ইন্দ্রিয়ের শ্রান্তি উপস্থিত হইলে আলস্য, জৃম্ভণ অর্থাৎ হাই আগমন করে, তাহার পরেই নিদ্রা আবির্ভূত হয়। কোন্ বৃত্তির নাম নিদ্রা? যাহাতে সমুদয় মনোবৃত্তি লীন হয়, সেই অজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া যখন মনোবৃত্তি উদিত থাকে, তখন তাহা নিদ্রা বা সুষুপ্তি নামে অভিহিত হয়। প্রকাশ-স্বভাব সত্ত্বগুণের আচ্ছাদক তমোগুণের উদ্রেক অবস্থাকেই আমরা নিদ্রা বলি। তমঃ বা অজ্ঞান পদার্থই নিদ্রাবৃত্তির অবলম্বন। যখন তমোময় অজ্ঞানাত্মক নিদ্রাবৃত্তির উদয় হয়, তখন সর্ব্বপ্রকাশক সত্ত্বগুণটি অভিভূত থাকে। তৎকালে কোনপ্রকার প্রকাশ্য বস্তুর প্রকাশ থাকে না। সেইজন্য লোকে বলে আমি নিদ্রিত ছিলাম, আমার জ্ঞান ছিল না। বস্তুতঃ তখন তাহার কোন জ্ঞান ছিল না এরূপ নহে, অজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান ছিল। সেই জন্যই সে নিদ্রাভঙ্গের পর তৎকালের অজ্ঞান-

বৃত্তিকে স্মরণ করিয়া থাকে। নিদ্রাকালে অজ্ঞানময় বা তমোময় বৃত্তি অনুভূত হইয়াছিল বলিয়াই নিদ্রাভঙ্গের পর তাহা তাহার স্মরণ হয়, এবং সেই স্মরণের দ্বারাই নিদ্রার বৃত্তি নির্ণয় হয়। বিশ্বে এমন কোনও প্রাণী নাই, যে নিদ্রার অধীন নহে ; কেহ অল্পকাল নিদ্রা যায়, কেহ দীর্ঘ সময় নিদ্রা যায়। দিবা রাত্রি সকলেরই আছে ; জাগ্রৎ-সময় দিন, নিদ্রার সময় রাত্রি।

যাহাদের হ্রস্ব রাত্রি, তাহাদের হ্রস্ব নিদ্রা ; যাহাদের দীর্ঘ রাত্রি, তাহাদের দীর্ঘ নিদ্রা। মনুষ্যের নিদ্রার সময় চারি প্রহর, পিতৃলোকের পনর দিন, দেবলোকের ছয় মাস, ব্রহ্মা প্রভৃতির চতুর্যুগসহস্র-পরিমাণ নিদ্রার সময়। প্রাণী মাত্রেই নিদ্রায় সমাচ্ছন্ন। নিদ্রার ক্ষমতা অসীম ; রাজা, প্রজা, দীন, ভিখারী, চন্দ্র, হরিহর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কয় না, সকলেই ইহার বশ। বিশ্ব নিদ্রার বশ, নিদ্রার অধীন। নিদ্রা মায়াবিনী কুহকিনী ; এই মায়ার কুহকে সকলেই বশীভূত। নিদ্রাজয়ী কোনও লোক নাই। বিশ্ব-মহানিশায় মোহনিদ্রায় সকলেই নিদ্রিত। এ নিশায় জাগ্রৎ কে ? মোহহীন যে। মোহহীন কে ? সংযমী যে। সংযমী কে ? জিতেন্দ্রিয় যে, সংযমী সে। সংযমী যে, জাগ্রৎ সে।

ভ্রম—ভ্রম শব্দে ভ্রান্তি, মিথ্যাজ্ঞান, বুদ্ধিবিপর্য্যয়। যে জ্ঞান মিথ্যা, যাহা সেইরূপে স্থায়ী হয় না, যাহা বিষয় দর্শনের পর অন্যথা হইয়া যায়, সেই জ্ঞানের নাম ভ্রান্তিজ্ঞান। ভ্রম দুই-প্রকার—এক সংবাদী ভ্রম, আর এক বিসংবাদী ভ্রম। সংবাদী

ভ্রম যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম, মরীচিকায় জলাশয়ভ্রম, শুক্তিকাতে রজতভ্রম ইত্যাদি। আর বিসংবাদী ভ্রম, ইহাকে সংশয়ভ্রম বলে; যেমন—এইটা মনুষ্য কি মুড়া গাছ, ইহা গ্রাম কি বন, এই কথা বলিয়াছে হয় রাম না হয় রমেশ, ইত্যাদি যত কিছু অনর্থের মূলই ভ্রম। ভ্রমের মূল শক্তিবিপর্যায়। দেখায় ভুল, শোনায় ভুল, বুদ্ধির ভুল,—সমস্ত শক্তিবিপর্য্যয়। দেখায় ভুল দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, শোনায় ভুল শ্রবণশক্তির হ্রাস, বুদ্ধির ভুল ধারণাশক্তির হ্রাস, ইত্যাদি। মূলে শক্তির হ্রাসই ভ্রমের কারণ। বুদ্ধিতে যাহার পূর্ণশক্তি নাই, ইন্দ্রিয়ে যাহার পূর্ণশক্তির অভাব, মনে করিতে হইবে তাহারই শক্তিবিপর্য্যয় এবং সেই ভ্রমের অধীন। যাহার বুদ্ধি শক্তিপূর্ণ, ইন্দ্রিয় শক্তিপূর্ণ, তিনিই ভ্রমরহিত, তিনিই স্বাধীন।

কর্কশ—যাহার বাক্য কঠোর কর্কশ, তাহাই রুক্ষরসাশ্রিত। ঈর্ষা, দ্বেষ, ক্রোধ—রুক্ষ বাক্যের কারণ। বিকারী জগতে ক্রোধ নাই কার? ক্রোধের কারণ ইচ্ছার ব্যাঘাত, ইচ্ছা-ব্যাঘাতের কারণ ইচ্ছাপূরণের শক্তির অভাব। অপূর্ণশক্তিমানের ইচ্ছাপূরণের শক্তির অভাব। ইচ্ছাপূরণ-শক্তির অভাবে ক্রোধের উদয় হয়, ক্রোধের উদয়ে যে বাক্য বলা হয়, তাহাই কর্কশ বাণী। ক্রোধের সময় শান্ত বাক্য আসিতে পারে না। ইচ্ছার ব্যাঘাত আছে, সেইজন্য ক্রোধ আছে, সুতরাং বাক্যে রুক্ষরস আছে। যাহার শরীরে ক্রোধ নাই, তাহার বাক্য কখনই কর্কশ হইতে পারে না।

স্বাধীন ও পরাধীন

কাম—কাম আদি রিপু, ইহা ষড় রিপুর অগ্রগণ্য। কাম অর্থে সাধারণতঃ কামনা, বাসনা, জীবের বিষয়ভোগের ইচ্ছা। আবার কামনা অর্থে স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের যৌবনসংযোগ-ইচ্ছাও বুঝায়। কাম হইতে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে, ও কোনও স্থলে সকল কর্ম্মই কামজন্য হইয়া থাকে। এই জগতে যত কিছু কর্ম্ম, তাহার মূল কারণ কাম বা কর্ম্মেচ্ছা। স্নান, সন্ধ্যা, যোগাদি কার্য্যকলাপ ও আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ-ফলকামনায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই জগতে কামনা ছাড়া কোনও কার্য্যই নাই।

কামনা সঙ্কল্পস্বরূপ, ইহা না থাকিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ভাস্কর, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। কাম কাহারও অধীন নহে; কাম ছাড়া জগতে আদরের জিনিস আর কিছু নাই। আমরা যাহাকে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু, গুরু, অর্থদাতা, রক্ষক ও নন্দনকানন বলিয়া বোধ করিয়া থাকি, সে সকল কামনা ভিন্ন আর কিছুই নহে; কামনাই সকল বিকৃতস্বরূপ ও স্বকীয় কল্পনাবলে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার স্বরূপ বর্ণনা করা কাহারও সাধ্য নহে; কেবল বুদ্ধির দ্বারা ইহার প্রতীতি হইয়া থাকে, আর কামনাই সকলপ্রকার আনন্দের পরা কাষ্ঠা রূপে অবস্থিতি করিতেছে; ইহা ভিন্ন যাহা, তাহা অনশ্বর জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, তাহাকেই তত্ত্ববেত্তারা ব্রহ্ম বা ব্রহ্মানন্দ বলিয়া থাকেন। সেই ব্রহ্ম হইতেই ইচ্ছা, জ্ঞান ও স্ফূর্তিস্বরূপ কামনা উৎপন্ন হইয়াছে। এই কাম অতি সূক্ষ্ম, সেইজন্য অতীন্দ্রিয়। দেহরাজ্যে কামই রাজা, ক্রোধ তাহার

সেনাপতি, লোভ তাহার মন্ত্রী, মোহ তাহার মহিষী, মদ তাহার পুত্র, মাৎসর্য্য তাহার কন্যা।

ক্রোধ—ক্রোধ শব্দে চঞ্চলতা, বা রাগদ্বেষাদি নিমিত্ত চিত্তের যে লঘুতা, তাহাই ক্রোধ। বিকারী জগতে রাগহীন প্রাণী নাই, সুতরাং চাঞ্চল্যবর্জ্জিত জীব নাই। রাগদ্বেষাদি লইয়াই সংসার। যতক্ষণ সংসার, ততক্ষণ রাগদ্বেষ; যতক্ষণ রাগদ্বেষ, ততক্ষণ সংসার। রাগ কার? অতৃপ্ত মানবের। অতৃপ্ত কে? অপূর্ণ যে। যিনি অপূর্ণ, যাঁহার অভাব, তিনিই অতৃপ্ত; যে হেতু অতৃপ্ত, সেই হেতু রাগান্বিত; যে হেতু রাগান্বিত, সেই হেতু চিত্ত চঞ্চল। কলসী যদি বারিপূর্ণ থাকে, তবে নড়ে চড়ে না; কিঞ্চিৎ বারিতেও যদি অপূর্ণ থাকে, তবেই নড়ে চড়ে। চিৎ-কলসীতে শক্তি-বারি অপূর্ণ, সেইজন্য চাঞ্চল্যযুক্ত ও অধীন।

কামের প্রতিবন্ধকই ক্রোধ অর্থাৎ বাঞ্ছিত পদার্থ লাভের প্রতিবন্ধক বা ইচ্ছার প্রতিঘাতে যে আক্রোশ, তাহারই নাম ক্রোধ। যাহার কামনা আছে, তাহারই ক্রোধ আছে; কামনা থাকিলেই তাহার প্রতিবন্ধক আছে, সেইজন্য ক্রোধও আছে। জীব মাত্রেই বিকারী, কামদাস ও ক্রোধান্বিত, সেইজন্য জগৎ ক্রোধের অধীন। ক্রোধহীন কে? নিষ্কাম যে। নিষ্কাম, সেই জন্য ক্রোধরহিত।

লোভ—লোভ শব্দে আকাঙ্ক্ষা, আশা, পরদ্রব্যপ্রাপ্তির অভিলাষ ইত্যাদি। ক্ষুধা ও তৃষ্ণাদি দ্বারা লোকে কামের অন্ত পাইতে পারে; ক্রোধের ফল যে হিংসা, তাহার নিষ্পত্তি করিয়া,

ক্রোধেরও অন্ত পাইতে পারে ; কিন্তু সমস্ত জয় করিয়া এবং সমুদয় পৃথিবী ভোগ করিয়াও লোভের অন্ত, আশার পার বা আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি পাইতে পারে না। কাম, ক্রোধ ও লোভ, এই তিনই আত্মজ্ঞানাপহারক, নরকের দ্বারস্বরূপ। জ্ঞানিগণ এই তিনকেই ত্যাগ করিয়া থাকেন। কখনও অসন্তোষ হইবে না। অসন্তোষই অধঃপতনের মূল কারণ। আকাঙ্ক্ষা হইতে চিত্ত-বিক্ষেপ হয়, সত্ত্বগুণ হ্রাস হয়, অন্য গুণ বিষমতা ধারণ করে, এবং নানা ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া জীবকে স্বরূপ হইতে পতিত করে।

বিশ্বে সকলেই দীন, কেননা পূর্ণশক্তি নাই ; পূর্ণশক্তির অভাব, সেইজন্য দীন। অপূর্ণ যে, দীন সে ; দীন যে, আকাঙ্ক্ষী সে ; আকাঙ্ক্ষী যে, অধীন সে। জীব মাত্রেই অপূর্ণ, অভাবী, দীন, সুতরাং অধীন। আকাঙ্ক্ষা নাই কার? অপূর্ণ নাই যার। যিনি পূর্ণ, তিনিই ধন্য ; তিনিই পূর্ণানন্দে আনন্দিত, তাঁহাকে সংসারের কোনও বিকারী পদার্থ আনন্দ জন্মাইতে বাধা দিতে পারে না। সর্ব্বসিদ্ধির অন্তর্গত প্রাকাম্য-সিদ্ধি যাঁহাকে দাসীর ন্যায় পরিচর্য্যা করে, তাঁহার কোনও পদার্থের অভাব থাকে না।

মোহ—হৃদয়ক্ষেত্রে মোহমূলক এক বিচিত্র কামতরু বিরাজিত রহিয়াছে ; ক্রোধ ও মান তাহার স্কন্ধ, কর্ত্তব্য-অভিলাষ উহার আলবাল অর্থাৎ বাঁধ, অজ্ঞান তাহার আধার, প্রমাদ উহার সেচন-সলিল, অসূয়া বা নিন্দা তাহার পত্র, পূর্ব্বজন্ম-

উপার্জ্জিত পাপ উহার সার, চিন্তা উহার পল্লব, শোক তাহার শাখা, ভয় তাহার অঙ্কুর; সেই বৃক্ষ মোহিনী-পিপাসারূপ লতাজাল দ্বারা নিয়ত বেষ্টিত রহিয়াছে। নিতান্ত লুব্ধ মানবগণ লৌহময় পাশ দ্বারা সংযত হইয়া, সেই ফলদ মহাবৃক্ষের ফল লাভে অভিলাষ করত তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া সেবা করিতেছে। যিনি সেই সমুদয় পাশকে বশীভূত করিয়া উক্ত বৃক্ষকে ছেদন করেন, তিনি বৈষয়িক সুখদুঃখ ত্যাগ করিতে বাসনা করিলে, অনায়াসে সুখদুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হন। যে অকৃতজ্ঞ অজ্ঞ পুরুষ সেই কামতরুকে সতত বর্দ্ধিত করে, সেই বিষয়ই—বিষ যেমন আতুরকে বিনষ্ট করে সেইরূপ—তাহাকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। কৃতিব্যক্তি সেই বদ্ধমূল বৃক্ষের অজ্ঞানরূপ মূলকে যোগপ্রসাদে সমাধিরূপ অসি দ্বারা বলপূর্ব্বক ছেদন করেন। তাঁহাকে আর মোহ দ্বারা আচ্ছন্ন হইতে হয় না। তিনি বন্ধন বিমোচনপূর্ব্বক সমস্ত দুঃখ অতিক্রম করেন।

দেহীর হৃদয়ে মোহ উৎপাদনের মূল কারণস্বরূপ কামবৃত্তি প্রকৃতিদত্ত মূল উপাদান। অতএব ভগবৎ-ইচ্ছায়, যাহা সৃষ্টিরক্ষার হেতুভূত হওয়ায় ঈশ্বরের অভিপ্রেত, প্রকৃতিপ্রণোদিত, সুতরাং শাস্ত্রসম্মত বৈধ, তাহা অবশ্য কামরিপু নামে গণ্য নহে; পরন্তু তাহারই শাস্ত্রবিরুদ্ধ অত্যাচার, ব্যভিচার ও অপব্যবহারই উহার রিপুত্ব-পরিণতির হেতু। মানবসমাজ স্থানবিশেষে জাতিবিশেষে মূলতঃ ইহারই অত্যাচারে উৎসন্ন গিয়াছে।

কাম বালকে অবিকশিত, যুবকে সুবিকশিত, প্রৌঢ়ে অব-

সাদিত, বৃদ্ধে নিদ্রিত, আর সাধকে শমিত, সংযত, সংহৃত, ফলে রিপুত্ব-পরিহারে মিত্রত্বে পরিণত। শত্রু মিত্ররূপে পরিণত হইলে আর তাহার বধের আয়োজনের প্রয়োজন কি ? কাম শরীরের উৎপাদকও বটে, উচ্ছেদকও বটে। কিন্তু হায় ! কামের কি মোহ-উন্মাদিনী কুহকিনী শক্তি। লোকে জানিয়া শুনিয়া প্রবৃত্তিপিশাচীর পূজায় এই করাল কাম-খড়্গে আত্ম-সর্ব্বস্ব উৎফুল্লচিত্তে বলিদান করে।

কাম ত্রিভুবনবিজয়ী। ইহা অঙ্গরহিত, অশরীরী। জর জর হ'ল অঙ্গ অশরীরীর প্রহারে, অনঙ্গ হইল অঙ্গ অনঙ্গ-প্রহারে। ইহার গর্ব্ব ও দর্প এত হইবারই কথা ; কারণ কাম সর্ব্বজয়ী, ইহা কাহাকেও ছাড়িয়া দেয় না, সকলেই ইহার অধীন, সকলেই ইহার নিকট বিজিত। জগতে কেবলমাত্র ছয় জন কাম জয় করিয়াছেন—সনক, সনন্দ, সনৎকুমার, সনাতন, হনুমান্ ও ভীষ্মদেব। প্রথম চারিজন—সনক, সনন্দ, সনৎকুমার ও সনাতনকে কামদেব আক্রমণ করিলেন ; ইহারা দেখিলেন কামের আক্রমণ প্রতিহত করা কাহারও সাধ্য নহে, সুতরাং সকলেই দুর্গ আশ্রয় করিলেন। যেমন কোনও পক্ষ অন্যপক্ষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, তাহা যদি প্রতিরোধ করিতে না পারে, তবে দৃঢ় দুর্গ আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহা হইলে বিপক্ষ আক্রমণ করিলেও কিছু করিতে পারিবে না, এই বিশ্বাসে ; এবং যে পক্ষ দুর্ব্বল, সেই পক্ষই দুর্গ আশ্রয় করে, সবল হইলে কেহ কখনও দুর্গ আশ্রয় করে না, বরং আক্রমণই করিয়া থাকে। সেইরূপ ইহারাও দুর্ব্ব-

লতা প্রযুক্ত দুর্গ আশ্রয় করিয়াছেন। ইঁহাদিগের কামপরাহত দুর্গ কি? পঞ্চমবর্ষীয় কুমার-বয়সই ইঁহাদিগের কামপরাহত দুর্গ অর্থাৎ পঞ্চমবর্ষীয় বালকের যেরূপ আকৃতি, আজীবন তদাকৃতি হইয়াই রহিলেন। বালকে কাম অবিকশিত, সুতরাং কাম এখানে পরাহত হইলেন, কিন্তু পরাস্ত হইলেন না; সুতরাং গর্ব্বও খর্ব্ব হইল না, দর্পও চূর্ণ হইল না।

দ্বিতীয়তঃ কন্দর্প হনুমান্‌কে আক্রমণ করিলেন; হনুমান্ নিজে তাঁহাকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া এবং উপযুক্ত দুর্গ আশ্রয় না পাইয়া প্রবলের শরণাপন্ন হইলেন। শরণাপন্ন হওয়াই দুর্ব্বলতার লক্ষণ। তিনি সর্ব্বশরণ ভগবানের আশ্রয় লইলেন। যেমন কোনও পক্ষ অন্যপক্ষকে আঁটিতে না পারিলে, কোনও প্রবল পক্ষের শরণ লয়, সেইরূপ ইনিও ভগবানের শরণ লইলেন। তাঁহারও কাম পরাহত হইল, কিন্তু পরাস্ত হইল না; সুতরাং গর্ব্বও খর্ব্ব হইল না, দর্পও চূর্ণ হইল না।

তৃতীয়তঃ মনসিজ ভীষ্মদেবকে আক্রমণ করিলেন, ভীষ্মদেব সমর্থতা প্রযুক্ত কোনও দুর্গ আশ্রয় করিলেন না এবং কাহারও শরণ গ্রহণও করিলেন না, নিজ শক্তিতেই কামকে পরাস্ত করিলেন; সুতরাং এখানে কাম পরাস্ত হইল, এবং তাহার গর্ব্বও খর্ব্ব হইল, দর্পও চূর্ণ হইল। ধন্য বীর, যিনি ত্রিভুবনবিজয়ীকে জয় করিলেন। ধন্য বীর, যিনি ত্রিভুবনবাসীকে বশ করিয়া স্বাধীন হইয়াছেন। ভীষ্মদেব নিষ্কাম অথচ পূর্ণকাম, সকল কামনাই তাঁহাতে পূর্ণ অর্থাৎ পূর্ণতৃপ্ত। এই অনঙ্গ-

প্রতাপে কৃষ্ণ বিষ্ণু অন্ধ, শিব উন্মত্ত, ব্রহ্মা মোহিত, মুনি ভ্রান্ত, পশু পক্ষী ক্ষিপ্ত, মনুষ্য মুগ্ধ; অতএব তাহার তুল্য প্রতাপী আর কে আছে ? এ হেন প্রতাপীর প্রতাপ যৎসকাশে প্রতিহত, গর্ব্ব খর্ব্বিত, দর্প চূর্ণিত, তাঁহার তুল্য বীর জগতে কে আছে ? তিনিই স্বাধীন, অন্য সমস্তই কামকিঙ্কর ও পরাধীন।

মদ—মদ শব্দে মত্ততা, গর্ব্ব। অহংকার হইতে মদের উৎপত্তি, অহংকার অজ্ঞানপ্রসূত। জ্ঞাননাশক আহ্লাদের নাম মদ। যেমন মদ খাইয়া মত্ততা, তাহাতে জ্ঞানের নাশ অথচ আহ্লাদ আছে। আব্রহ্ম কীট, হরি-হর-বিরিঞ্চ্যাদি অণিমাদি ঐশ্বর্য্যে মত্ত, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের আধিপত্যে গর্ব্বিত অথচ ঐশ্বর্য্য প্রাকৃতিক, সুতরাং বিকারী, আধিপত্যও ক্ষণিক অথচ ইহা নিত্য অপ্রাকৃতিক। ব্রহ্ম-ঐশ্বর্য্য, ব্রহ্মানন্দ জ্ঞাননাশক ; আমরা যেমন বিকারী ক্ষণস্থায়ী পঞ্চভূত-ঐশ্বর্য্যমত্ত, দুই এক জন পুরুষের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া গর্ব্বিত, অহংকারে স্ফীত ; উঁহাদিগের না হয় দুই চারি দশ হাজারের উপর কর্ত্তৃত্ব : সমস্ত শক্তির উপর কর্ত্তৃত্ব নাই অথচ ইহাতেই মত্ত, ইহাতেই গর্ব্বিত, ভুলেও ব্রহ্মৈশ্বর্য্যে ব্রহ্মানন্দের দিকে মন দেন না ; ইহা হইতে জ্ঞাননাশক আহ্লাদ আর কারে বলি ? যাহার অহংকার আছে, তাহারই মদ আছে। সেইজন্য সকলেই অহংকারী ও মত্ত, সেই জন্য মদাধীন।

মাৎসর্য্য—মাৎসর্য্য অর্থে মৎসরতা অর্থাৎ পরশ্রী-কাতরতা। বিকারী জগতে কে মৎসরতা-হীন ? যাহারা খণ্ডশ্রী, তাহারা

পূর্ণশ্রী দেখিলে কাতর হইয়াই থাকে এবং পূর্ণশ্রী লাভে ঈর্ষান্বিত হয়। সকলেরই শ্রী খণ্ডিত, সেইজন্য সকলেই ঈর্ষান্বিত এবং মাৎসর্য্যযুক্ত, সুতরাং পরাধীন। লোকের ঈর্ষা জন্মে সমকক্ষের উপর আর উর্দ্ধতমের উপর ; নিম্ন শ্রেণীর উপর কাহারও ঈর্ষা জন্মে না, কারণ সকলেরই ইচ্ছা বড়লোক হই। সমস্ত জীবনে আশা ত পূর্ণ হয় না। স্বাধীন হইবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকিলেও মনের দুঃখে পরাধীন হইয়া কাল যাপন করিয়া থাকে।

হিংসা—হিংসা অর্থাৎ পরপীড়ন। পরপীড়নের উদ্দেশ্য কি ? কোনও একটা ঈপ্সিত বিষয়ে কেহ যদি প্রতিবন্ধক হয়, তবে সেই প্রতিবন্ধক দূরীভূত করিবার জন্য পরপীড়ন আবশ্যক হয়। হিংসার মূল স্বার্থ, আবার স্বার্থের মূল কাম। সমস্ত লোকই বিকারী, সকাম, স্বার্থপর ও হিংস্রক ; সুতরাং হিংসার অধীন। তবে অহিংস্রক কে ? যিনি কামিনী-কাঞ্চন-বর্জ্জিত, যাঁহার স্বার্থ পরার্থে ন্যস্ত, তিনি লোভহীন, নিষ্কাম, নিস্পৃহ, নির্ব্বিকারী, মুক্ত, সুতরাং স্বাধীন।

খেদ—খেদ শব্দে ক্লেশ, শোক, দুঃখ, বিষাদ। ক্লেশ অর্থাৎ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ, এই পাঁচপ্রকার অজ্ঞান,—যাহা আত্মা চিত্তের সহিত একীভূত হইয়া ভোগ করিতেছেন। জগৎ বিকারী, সুতরাং পাঁচপ্রকার ক্লেশে ক্লেশিত। জগতে যত কিছু ক্লেশ আছে, এ পাঁচেরই অন্তর্গত। যার অবিদ্যা, তাহারই অস্মিতা ; যার অস্মিতা, তাহারই রাগ ; যার

রাগ, তাহারই দ্বেষ ; যার দ্বেষ, তাহারই অভিনিবেশ। ইহারা কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া নাই,—পরস্পর জড়িত ; এই পাঁচের একের অভাব হইলে সকলের অভাব ; প্রাণী মাত্রেই ইহার অধীনে।

অবিদ্যা—অবিদ্যা হেতু ক্লেশ, বিষয়ভোগ। বিষয়ভোগ বাস্তবিক দুঃখ ; পরন্তু তাহাকে আমরা যার পর নাই সুখ মনে করিয়া তাহা পাইবার জন্য ব্যাকুল হই। যাহার মান আছে, তাহার মান নাশে বিষাদও আছে। সকলেরই অহঙ্কার আছে, সুতরাং বেদনাও আছে।

রাগ—রাগ হেতু ক্লেশ হয়। দ্বেষ হেতু ক্লেশ, ক্রোধ, হিংসা, বিপ্রলিপ্সা। অভিনিবেশ হেতু ক্লেশ, ত্রাস, ভয়, মরণ-যন্ত্রণা ; কষ্ট ভিন্ন সুখ কিছুতেই নাই ; সুতরাং পরাধীন।

পরিশ্রম—কার্য্যান্তে ইন্দ্রিয়ের অক্ষমতারূপ যে গ্লানি, তাহাই পরিশ্রম। বিন্দু বিন্দু শক্তির হ্রাস, ক্রমে অত্যধিক হইলেই অনুভবযোগ্য হয়। কার্য্যের মূল শক্তি ; শক্তির হ্রাস-অবস্থাই পরিশ্রম। শক্তির মূল শুক্র ; যার শুক্র যত ধৃত, তার শক্তিও সেই পরিমাণে রক্ষিত ; পরিশ্রমেও সেই পরিমাণে শক্ত। জগতে অনবরত কার্য্যক্ষম কেহই নাই। ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়াও ক্লান্ত হইয়াছিলেন। শক্তি অনুসারে কেহ অল্পেই কষ্ট বোধ করে, কেহ দীর্ঘ সময়ে ক্লেশ বোধ করে, এই মাত্র প্রভেদ। বিশ্বশক্তি ক্লমশীল অর্থাৎ শ্রমশীল, সুতরাং পরাধীন।

খণ্ড—ব্রহ্মচর্য্যধারীরাই অণিমা-মহিমাদি-ঐশ্বর্য্যশালী হয়, তাহাতে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যধারীর ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতার তুলনাই নাই। হনুমান্ ইচ্ছা করিলে, কোটী সূর্য্য থাকিতে পারে এমন শরীর ধারণ করিতে পারেন, আবার সত্যসঙ্কল্পপ্রভাবে ইহাও পারেন যে, সূর্য্যসহিত পৃথিবীকে ক্ষুদ্রাকারে পরিণত করিয়া একটি বালুকার মধ্যে প্রবেশ করাইতে পারেন। একটি সূর্য্যকে বগলে পোরা আশ্চর্য্য কিছুই নহে।

ব্রহ্মচর্য্যধারীরা মনোজব অর্থাৎ মনের ন্যায় অত্যধিক-গতি-বিশিষ্ট; আমরা যেমন মনকে সঙ্কল্পপ্রভাবে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে হিমালয়ের উত্তরে লইতে পারি, কিন্তু শরীর সেরূপ লইতে পারি না। যাহারা মনোজব, তাহাদের মন যে মুহূর্ত্তে যে স্থানে কল্পনা করিবে, তাহাদের শরীর সেই মুহূর্ত্তে সেই স্থানে উপস্থিত হইবে।

হনুমানেতে এত তেজ নিহিত আছে যে, হনুমান্ ইচ্ছা করিলে কোটী কোটী সূর্য্যকে দগ্ধ করিয়া ফেলিতে পারেন। এক সময় অর্জ্জুন হনুমান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তোমার শক্তি কত? হনুমান্ হাসিয়া উত্তর করেন,—আমার শক্তি কত, তাহা আমি বলিতে পারি না; তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, এইরূপ অগণিত বিশ্ব অনন্তকাল জন্য শরীরের একটি লোমেতে ধারণ করিয়া রাখিব, তাহাতে আমি জানিতে পারিব না যে, কোনও একটা ভার আমার শরীরে আছে; যেমন কাশ্মীরী জামার উপর একটা পিপড়া বা মাছি বসিলে, জামা-

ধারক যেমন জানিতে পারে না, তাহার উপর কোনও ভার আছে। ইহা অত্যুক্তি নহে, অখণ্ডব্রহ্মচর্য্যশক্তি ব্রহ্মশক্তির তুল্য। এই দুই বীরের শক্তির ইয়ত্তা নাই। অসীম শক্তির কার্য্য দেখাইবার স্থান, অসীম জগতে নাই; সুতরাং শক্তিমানেরা অসীম শক্তি দেখান নাই। ভীষ্মদেব ও হনুমান্ পূর্ণ শক্তিমান্, সুতরাং স্বাধীন।

বৈষম্য—জগতে যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই বৈষম্য দৃষ্টিগোচর হয়। কাহারও সহিত কাহারও সমতা নাই, সর্ব্ববস্তুই বিষমতাপূর্ণ। যেন বিষমতাই জগতের ধর্ম্ম। সম বিষম গতিতে, সম বিষম ভাবে জগৎচক্র চলিতেছে, বিশ্বকার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। মনুষ্যে মনুষ্যে বিষমতা, পশুতে পশুতে বিষমতা, স্থাবরে স্থাবরে বিষমতা। একজন মনুষ্যের সহিত আর একজন মনুষ্যের কোন না কোন বিষয়ে বৈষম্য আছে। সমতা কিছুতেই হইতে পারে না; কারণ সমস্ত পদার্থই ত্রিগুণের বিষমতাতে সৃষ্ট। ত্রিগুণের সমতা হইলে জগৎ প্রলয়দশাগ্রস্ত হয়। সেই জন্য প্রকৃতির সৃষ্টির নিয়মই বিষমতা। বৈষম্যের আর এক হেতু স্বার্থপরতা; সেই কারণে যেখানে স্বার্থপরতা, সেইখানেই বিষমতা। বৈষম্য কার? স্বার্থ আছে যার। স্বার্থ আছে কার? কাম আছে যার। কাম হইতে স্বার্থ, স্বার্থ হইতে বৈষম্য। সকলেই স্বার্থপর, সেইজন্যই বিষম; সুতরাং পরাধীন।

পরাপেক্ষা—পরাপেক্ষা অর্থাৎ পরকে অপেক্ষা করে

যাহাতে বা যে কোনও কার্য্যে। যাহাতে বা যে কোনও কার্য্যে পরের সাহায্যপ্রার্থী হইলেই তাহাকে ভিখারী বলিতে হইবে। অতএব পরাপেক্ষীও যে, ভিখারীও সে। আমরা সংসারে যত কিছু কার্য্য করি, তাহাদের কোনটাই একা নিজের সাহায্যে হয় না, অন্যের সহায়তার প্রয়োজন ; খাইতে, শুইতে, উঠিতে, বসিতে, সকল কার্য্যেই অপরের সাহায্য আবশ্যক হয়। যে দিন তুমি মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলে, ম্লানমুখে মাতৃ-মুখ তাকাইতে লাগিলে, তোমার দর-বিগলিত-ধারা দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন তোমার নিজের কোনও শক্তি নাই, কাহারও যেন অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছ, কাহারও সাহায্য না পাইলে প্রাণ যায়, ক্ষুধা তৃষ্ণায় অস্থির হইয়াছ, কাতরে কাঁদিয়া বলিলে—মাগো ! কিছু খেতে দাও ; মাতা অনুগ্রহ করিলেন, এবং স্তন মুখে দিলেন ; ভিক্ষা পাইয়া কৃতার্থ হইলে, এই তোমার জীবনের প্রথম ভিক্ষা, প্রথম পরাপেক্ষা আরম্ভ হইল। এই প্রকারে বাল্যকালে—কেহ উঠাইলে উঠিতে পার, শুয়াইলে শুইতে পার, বসাইলে বসিতে পার, খাওয়াইলে খাইতে পার, নচেৎ নয়। এই প্রকারে বাল্যকালে ভিখারীর বেশে পরাপেক্ষায় কাটাইলে। আসিল যৌবন কাল ; এই সময় তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয় পটু, সকলপ্রকার কার্য্যক্ষম, তবু পরাপেক্ষী। কি যেন তোমার অভাব, কাহার সাহায্য না পাইলে তোমার চলে না, সংসার শ্মশানবৎ প্রতীয়মান হয়, সংসারে সুখ নাই, শান্তি নাই ;

স্বাধীন ও পরাধীন

সুখ পাইবার লালসায়, শান্তিতে থাকিবার আশায়, ভিখারীর বেশে পরাপেক্ষী হইয়া পরের দ্বারে দণ্ডায়মান; শৈশব-কালে নেঙ্গটা হইয়া ভিক্ষা চাহিয়াছিলে, এক্ষণে গায়ে জামা-জোড়া মাথায় মুকুট পরিয়া বর-বেশে ভিক্ষা চাহিতেছ— মাগো! ছুটি ভিক্ষা পাই, আমাকে সংসারী করিয়া দাও। পান্থশালায় অতিথি ফিরে না; মাতা পিতার যত্নে ও চেষ্টায় শাশুড়ী তাঁহার কন্যাটিকে তোমায় ভিক্ষা দিলেন, তুমি কৃতার্থ হইলে, যেন সকল কষ্ট দূর হইল; দিন কয়েক মনে একটু সুখ বোধ হইল। দুই একটি সন্তান হইলে পর, পয়সার অভাববোধ হইল, ক্রমে সংসারের ভার মাথায় পড়িল, তখন কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল; এই প্রকারে সুখ দুঃখ মিশাইয়া অর্থচিন্তায় পরাধীন হইয়া দিন যাপন করিতে লাগিলে। তার পর যৌবনে ভাঁটা পড়িল, আর যৌবনে জোয়ার নাই, সঙ্গে সঙ্গেই বার্দ্ধক্য আসিল, শক্তি হ্রাস হইল, রোগ আক্রমণ করিল, উত্থানশক্তি রহিত হইয়া আসিল, এত আদরের এত যত্নের সংসার ছাড়িতে হইবে ভাবিয়া প্রাণ আকুল হইল। সেই সময় বড় লোভ হয়—নানাপ্রকার দ্রব্যাদি খাইতে ইচ্ছা হয়, কেহ খাইতে দিলে খাও, নচেৎ নয়; তৃষ্ণায় জল কেহ দিলে পাও, না দিলে নয়। যাহাদিগকে কত ভাল বাসিতে, এখন কিন্তু তাহারা প্রকাশ্যে না পারিলেও মনে মনে তাচ্ছল্য-ভাবে তোমার সেবা করে। এক্ষণে তোমার প্রত্যেক কাজেই, প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই পরের সাহায্য আবশ্যক হয়। আজীবন

তত্ত্ববোধ

ভিক্ষুকবেশে দীনহীনের ন্যায় পরাপেক্ষাতে সুদীর্ঘ জীবন কাটাইলে, কবে তুমি স্বাপেক্ষ হইয়াছিলে? কবেই বা তুমি স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছিলে? কবেই বা তুমি ভিখারীত্ব ঘুচাইয়া সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করিয়াছিলে?

সত্য

যে তত্ত্ব নিয়ত স্থির, যাহার ধ্বংস নাই, যাহা নষ্ট হয় না, তাহা সৎ ; যাহা সৎ, যাহা অব্যভিচারি, তাহাই সত্য। যে রূপে যাহা নিশ্চিত হয়, বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয়, যদি তাহা কদাচ সে রূপ ত্যাগ না করে, সে রূপের যদি কখনও অন্যথা না হয়, ব্যভিচার না ঘটে, তবে তাহাই সত্য। যে পথ অবলম্বন করিয়া চলিলে, মরণধর্ম্মা জীব সত্যত্ব, অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, দুঃখসঙ্কুল ভবধাম অতিক্রম করিয়া নিত্যানন্দ অমৃত-ধামে উপনীত হয়, সেই সত্যপথ সত্য দ্বারা ধৃত, সত্য দ্বারা বিস্তীর্ণ, সত্যই তৎপথের প্রতিষ্ঠা ; যিনি সত্যাশ্রয়ী সত্যবান্, জয়লাভ বা কর্ম্মসিদ্ধি তাঁহারই হইয়া থাকে : মিথ্যাবাদীর কখনও জয় হয় না, মিথ্যাবাদী যে সর্ব্বত্রই সত্যবাদীর দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে, তাহা লোকপ্রসিদ্ধ নিয়ম ; এ নিয়মের কখনও বিপর্য্যয় ঘটে না। সত্যই বাক্যের প্রতিষ্ঠা, স্থিরাবস্থান। সত্যবচনই স্থিরভাবে সর্ব্বত্র আদৃত হইয়া থাকে। মিথ্যার প্রতিষ্ঠা বা স্থিরাবস্থান নাই। মিথ্যা ব্যভিচারী, মিথ্যার জয় কদাচ হয় না। জগৎ সত্যেই বিধৃত। মূলে যাহার সত্য নাই, তাহা মিথ্যা, তাহার স্থায়িত্ব নাই। ঈশ্বর যে উদ্দেশে মনুষ্যকে যে শক্তি প্রদান করিয়াছেন, সে শক্তিকে ঠিক তদুদ্দেশে ব্যবহার করাই যথার্থ ধর্ম্ম। ঈশ্বর সকল

প্রাণী হইতে মনুষ্যকে নিজ ও পরোপকার প্রয়োজনার্থ বিশেষ বাক্‌শক্তি প্রদান করিয়াছেন, অসত্যকথন দ্বারা তাহার ব্যভিচার মূঢ় ছাড়া আর কে করিবে? যে বাক্য পরপ্রতারণার্থ প্রযুক্ত হয়, যাহা ভ্রান্তিময়; যে বাক্যের অর্থ পরিগ্রহ হয় না—অবোধ্য, যাহা সর্ব্বভূতের উপকারার্থ উচ্চারিত না হয়, তাহা মিথ্যা বাক্য। তুমি বন্ধুর অনুরোধে, কার্য্যের অনুরোধে বা অন্য কোনও স্বার্থসাধনার্থ সত্যকথা বলিলে বটে; কিন্তু তোমার মনোমধ্যে মিথ্যা বা দুরভিসন্ধি থাকিয়া গেল; এরূপে বা সেরূপে তোমার সত্যানুষ্ঠান সিদ্ধ হইবে না। রাজসভায়, ধর্ম্মসভায় অথবা সামাজিক সভায় বসিয়া এরূপ পদবিন্যাস করিয়া বাক্য প্রয়োগ করিলে, যাহাতে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলা যাইতে পারে না অথচ যাহার ফল, মিথ্যা বলার ফলের সঙ্গে সমান, এইরূপ কুটিল সত্যের দ্বারাও তোমার কোনও উপকার সাধিত হইবে না, সত্য সিদ্ধ হইবে না। পরের সর্ব্বনাশ লক্ষ্য করিয়া যদি সত্য উচ্চারণ কর, তবে সে সত্যেও কোন উপকার হইবে না। পরের অকপট হিত জন্য, সরল হইয়া ছল পরিত্যাগ করিয়া, দুরভিসন্ধি বর্জ্জন করিয়া যদি সত্য উচ্চারণ কর, তবে তাহা দ্বারা সত্য সফলতা লাভ করিবে।

সত্যব্রত পালন দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়াফল লাভ হয়। যজ্ঞাদি, তপস্যাদি, দানাদি ক্রিয়া দ্বারা যে ফল, যে স্বর্গ লাভ হয়, যাগ ও তপস্যাদি না করিলেও কেবলমাত্র সত্য দ্বারা

সেই ফল, সেই স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। যিনি সত্যপরায়ণ, যিনি সত্য-ব্রত পালন করেন, তিনি সত্যসঙ্কল্প, তাঁহার বাক্য অমোঘ, অব্যর্থ ও সত্যফলপ্রদ হয়। তাঁহার কার্য্যের ফল তাঁহার অধীন থাকিবে, অর্থাৎ যে কোনও কার্য্য করুন তাহারই সমফল পাই-বেন, বাক্‌সিদ্ধি হইবে। তাঁহার অব্যর্থ বাক্‌শক্তি ; যাহাকে যাহা বলিবেন, তাহাই সিদ্ধ হইবে। মিথ্যাবাদী, কপট, শঠ বা অতি পাপাচারীকেও তিনি যদি বলেন—ধার্ম্মিক হও, তাহা হইলে ধার্ম্মিক হইবে ; যদি বলেন—স্বর্গে যাও, পুণ্য না থাকিলেও সে সে স্বর্গে যাইবে।

পৃথিবীর যাহা সার ভাগ বা সত্য, তাহাই গন্ধ,—পৃথিবী যদি তাহার গন্ধ ত্যাগ করে, জলের যাহা সার ভাগ বা সত্য, তাহাই মধুর রস,—জল যদি সেই সত্য ভাগ ত্যাগ করে, শশী, সূর্য্য যদি প্রভা পরিত্যাগ করে, জ্যোতি যদি রূপ পরিত্যাগ করে, বায়ু যদি স্পর্শ ত্যাগ করে, অগ্নি যদি উষ্ণতা ত্যাগ করে, আকাশ যদি শব্দগুণ পরিত্যাগ করে, শীতাংশু যদি শীতরশ্মিতা পরি-ত্যাগ করে, দেবরাজ যদি বিক্রম পরিত্যাগ করেন, ধর্ম্মরাজ যদি ধর্ম্ম ত্যাগ করেন, তথাপি যিনি সত্যপরায়ণ, তিনি কখনও কোন মতে সত্যকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। যিনি সত্যধর্ম্ম আশ্রয় না করেন, তিনি মনুষ্যপদবাচ্য হইবার উপযুক্ত নহেন।

যিনি সত্যসঙ্কল্প, সত্যপ্রিয়, উৎপত্তি স্থিতি ও লয় পর্য্যন্ত সত্য যাঁতে অবিচলিত নিত্য বর্ত্তমান, বা জ্ঞান বল ও ক্রিয়া যাঁহার সত্যাশ্রয়ী, যিনি সমদর্শী, যিনি সত্যে নিহিত ও স্থিত.

তত্ত্ববোধ

যিনি সত্যের প্রকাশক ও প্রবর্ত্তক, যাঁহার সমস্তই সত্যময় অর্থাৎ যাঁহার শরীর সত্যময়, বাক্য সত্যময়, ইন্দ্রিয় সকল সত্যময়, এই প্রকারে যিনি সত্যাত্মক, সকলেরই সেই সত্যস্বরূপের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

যাহা দুষ্কর, যাহা দুর্লভ, যাহা দূরবর্ত্তী, যাহা দুরতিক্রম, সে সকলই তপঃসাধ্য ; তপস্যা দুর্লঙ্ঘনীয়। দেব-মানুষ-পূর্ণ এই জগৎ তপোমূলক। তপস্যাই ইহার আদি মধ্য ও অন্ত। ইহা তপস্যা দ্বারাই আবৃত। তপস্যা দ্বারা যে যাহা প্রার্থনা করে, সে তাহাই পায়,—বিদ্যার্থী বিদ্বান্ হয়, আয়ুঃপ্রার্থী আয়ূ পায় এবং শ্রীপ্রার্থী মহতী শ্রী প্রাপ্ত হয়।

চৌর্য্য

মনের দ্বারা, বাক্য দ্বারা, কার্য্য দ্বারা, পরদ্রব্যে নিস্পৃহার নাম অচৌর্য্য। চোর কারে বলি? চোর দুইপ্রকার,—এক আত্মচোর, আর এক পরদ্রব্য-চোর। আত্মতত্ত্ব অজ্ঞানাকে আত্মচোর বলে—অর্থাৎ যে ব্যক্তি একপ্রকার আত্মাকে অর্থাৎ আপনাকে অন্যপ্রকার জানে, দেহাদির অতীত আপন আত্মাকে দেহাদিবিশিষ্ট বলিয়া জানে, সেই ব্যক্তি আত্মচোর। এই আত্মচোর মানব কি পাপ না করিতেছে? আত্মচোর হইতেই যত কিছু পাপের উৎপত্তি। আত্মা নিত্যতৃপ্ত, তাঁহাকে অতৃপ্তের ন্যায় বোধ করিয়া দীন ও অভাবগ্রস্তের ন্যায় অনুভব করে। আত্মচোর সকলেই। অভাব বোধ হইতেই আকাঙ্ক্ষা, আকাঙ্ক্ষা হইতে লোভ, লোভ হইতে চৌর্য্যবৃত্তি উৎপন্ন হয়। লোকে কথায় বলিয়া থাকে,—অভাবে স্বভাব নষ্ট। চৌর্য্যবৃত্তি কার? স্বভাব নষ্ট যার। স্বভাব নষ্ট কার? আকাঙ্ক্ষা যার। আকাঙ্ক্ষা কার? লোভ যার। লোভ কার? অভাব যার। অভাব কার? অপূর্ণ যার। প্রাণী মাত্রেই সকর্ম্মক; কর্ম্মের মূল অভাব, অপূর্ণই পূর্ণ হইবার চেষ্টা করে, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। বিশ্ব অভাবগ্রস্ত, অসন্তুষ্ট, মন কষ্ট, স্বভাব নষ্ট, সুতরাং চোর। মনে কর, তোমার কোনও একটা পদার্থের অভাব আছে, তাহা পাইবার সততই ইচ্ছা আছে, অথচ কোনও সহজ উপায়ে

তাহা পাইতেছ না; সুতরাং তোমার চুরি করিবার ইচ্ছা হয়। ইচ্ছা মনের ধর্ম্ম। একই উপাদানে সকলেরই মন গঠিত। চোরের মন যে উপাদানে গঠিত, সাধুর মনও সেই উপাদানে গঠিত। আব্রহ্ম কীট সকলেরই মন সেই উপাদানে গঠিত, সকলের মনেই চৌর্য্য উপাদান আছে, অচৌর্য্য উপাদানও আছে; যখন চৌর্য্য-উপাদানে গুণক্ষোভ হয়, তখনই লোকে চুরি করিয়া থাকে। দিলীপ রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন, অশ্ব রক্ষার্থ রঘুকে নিযুক্ত করিলেন। ইন্দ্রের হিংসা জন্মিল ; যজ্ঞ যাহাতে নষ্ট হয়, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মহাদেবের সহিত পরামর্শ করিয়া ইন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া চুরি করিতে গমন করিলেন। দিবা দ্বিতীয় প্রহরের সময় অন্ধকার করিয়া রাত্রি উপস্থিত করিলেন। তাহার পর সেই যজ্ঞের অশ্ব হরণ করিয়া লইয়া গেলেন। বলিহারি ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব !

জ্ঞানে, ধ্যানে যখন তোমার অভাব বোধ থাকিবে না, পূর্ণ তৃপ্তি অনুভব করিবে, তখনই পূর্ণতা লাভ করিবে। অভাব নষ্ট হইবে, সন্তোষ লাভ করিবে, মনকষ্ট দূর হইবে, স্বভাব রক্ষিত হইবে, সুতরাং চৌর্য্যবৃত্তি ধ্বংস হইবে। যখন অচৌর্য্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, তখন সর্ব্বরত্ন আপনা হইতে উপস্থিত হইবে, সর্ব্বরত্ন লাভের তৃপ্তি জন্মিবে। যেখানে সেখানে ভূগর্ভে যখন রত্ননিহিত দেখিতে পাইবে, তখনই মনে করিবে— তোমার চৌর্য্যবৃত্তি ধ্বংস হইয়াছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি চোর।

চৌর্য্য

তুমি একজন লক্ষপতি। কাহার সাধ্য তোমাকে চোর বলে। তুমি দুই চারি হাজার চুরি না করিতে পার, কিন্তু লক্ষ স্থানে বিশ লক্ষ পাইলে নিশ্চয়ই চুরি করিবে। যদি বল, মনের অগোচর পাপ নাই, আমি মনেতে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে, মনেতে চুরি করিবার ইচ্ছা হইতেছে না, অতএব আমি চোর নই। তাহা নহে ; মনের চৌর্য্যবৃত্তি এখন সুপ্ত। তুমি সুপ্ত থাকিলে তোমার যেমন কার্য্য বন্ধ থাকে, সেইরূপ মনের চৌর্য্যবৃত্তি সুপ্ত বলিয়া এখন চৌর্য্যবৃত্তি নাই ; যদি সুপ্ত না হইয়া ধ্বংস হইত, তবে সর্ব্বরত্ন লাভ হইত। চৌর্য্যবৃত্তি যে সুপ্ত, তাহা তুমি দেখিতে পাইবে না, তাহা একমাত্র প্রকৃতি দেখিতেছে। তুমি যেমন চোরের ভয়ে সিন্দূকে রত্ন প্রভৃতি লুকাইয়া রাখ, প্রকৃতিও সেইরূপ তোমার আমার দৃষ্টির অন্তরালে অদৃশ্য সিন্দূকে রত্ন লুকাইয়া রাখিয়াছে ; যখন চৌর্য্যবৃত্তি ধ্বংস হইবে, তখন প্রকৃতিও ভাণ্ডার খুলিয়া দিবে। যেখানে সেখানে ভূগর্ভে রত্ন নিহিত রহিয়াছে দেখিতে পাইবে।

হরিদাস সাধুকে একজন একখানা স্পর্শমণি দিয়াছিলেন, তিনি তাহা যমুনায় ফেলিয়া দেন। যিনি দিয়াছিলেন, তিনি দুঃখ অনুভব করিলেন ; অন্তর্যামী হরিদাস তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি দাতাকে সঙ্গে করিয়া একটি অরণ্যে প্রবেশ করিলেন, বনের মধ্যে একটি স্থান দেখাইয়া বলিলেন, তুমি যে মণি হারাইয়াছ, তাহার অতিরিক্ত মণিও ইচ্ছা করিলে ঐ স্থান হইতে লইতে পার। তিনি দেখিয়া অবাক্। তিনি

ভাবিলেন—ফণীর মণি আমাদের কাছে এই,—না জানি ফণীর মণির মণি কিরূপ। তাহার পর তিনি হরিদাসের শিষ্য হইলেন। কেন এইরূপ হইল? হরিদাসের অস্তেয় প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বলিয়াই এইরূপ হইল। ইহা দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায়, জীব মাত্রেই চোর। তবে বিশ্বে চোর নয় কে? অস্তেয় হইয়াছে যে। তিনি সদানন্দ নিত্য তৃপ্ত। যিনি পূর্ণ, তাঁহার কিসের অভাব, কিসের লোভ, কিসের আকাঙ্ক্ষা, কিসের চৌর্য্য? তিনি নির্লোভ, নিরাকাঙ্ক্ষ, নিস্পৃহ, সুতরাং অস্তেয়স্বরূপ।

———

শরীর

শরীর শব্দের অর্থ তনু। সেই শরীর তিনপ্রকার। স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর, ও কারণ শরীর। সূক্ষ্ম শরীরের আর এক নাম লিঙ্গ শরীর। লয়ের দ্বারা লীন হয় বলিয়া লিঙ্গ শরীর নাম হইয়াছে। স্থূল শরীর মৃত্যুতে ধ্বংস হয়, সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীর মহাপ্রলয়ে ধ্বংস হয়, কারণ শরীর মুক্তিতে ধ্বংস হয়। স্থূল শরীর স্থূল পাঞ্চভৌতিক, সূক্ষ্ম শরীর সূক্ষ্ম পাঞ্চভৌতিক, কারণ শরীর কারণ পাঞ্চভৌতিক। সকলেরই কারণ শরীর অব্যক্ত অনাদ্যা মূল প্রকৃতি এবং সকলেরই সূক্ষ্ম শরীর সপ্তদশ-অবয়ব-বিশিষ্ট অর্থাৎ পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি-বিশিষ্ট। সূক্ষ্ম শরীর আছে তাহার প্রমাণ কি ? তাহার প্রমাণ এই—প্রাণী মাত্রেরই বুদ্ধি আছে, বুদ্ধি নিরাশ্রয়ে থাকিবার নহে ; অবশ্য তাহার আশ্রয় আছে। অভিনিবেশপূর্ব্বক চিন্তা করিলে প্রতীতি হইবে, বুদ্ধি মাংসলিপ্ত অস্থি-পঞ্জরে অবস্থিত নহে, নিরুপাধিক আত্মাতেও অবস্থিত নহে ; সুতরাং বুদ্ধির পৃথক্ আশ্রয় অনুমেয়। যাহা বুদ্ধির আশ্রয়, তাহাই সূক্ষ্ম শরীর। সূক্ষ্ম শরীর অতিশয় সূক্ষ্ম, অতিশয় সূক্ষ্মতা হেতু শিলা-মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, সর্ব্বত্র অব্যাহতগতি, সেইহেতু

ইহা চর্ম্মচক্ষুর অগোচর, অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোচ্য। তাহার মূর্ত্তি নাই, অবয়ব নাই, কেবল জ্ঞানময় পদার্থ। কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না, কেহ তাহাকে ছেদ করিতে পারে না, কেহ তাহাকে ভেদ করিতে পারে না, কেহ তাহাকে দাহ করিতে পারে না। জীব সকল শরীরের দ্বারা, মনের দ্বারা ও বাক্যের দ্বারা যে কোনপ্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান বা যে কোনপ্রকার জ্ঞান অনুষ্ঠান করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে, সেই সমস্তই তাহাদের চিত্তক্ষেত্রে বা অন্তঃকরণময় সূক্ষ্ম শরীরে অতি সূক্ষ্মভাবে, বীজে অঙ্কুরশক্তির ন্যায়, থাকিয়া যাইতেছে। সেই থাকার নাম বাসনা বা সংস্কার। সেই সকল সংস্কার বা বাসনা তাহাদের বর্ত্তমান জীবনের পরিবর্ত্তক ও ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ। জীবের সমস্ত ক্রিয়াই সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া সূক্ষ্ম শরীরে তাদৃশরূপে অঙ্কিত থাকে, ছাপ্ বা দাগ্ লাগার ন্যায় হইয়া থাকে। কালক্রমে সেই সকল দাগ বা সংস্কার প্রবল হইয়া স্বীয় আত্মাকে অর্থাৎ জীবকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পতিত করে। সেই সকল দাগের বা সংস্কারের নাম কর্ম্ম, অদৃষ্ট, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ ও পুণ্য ইত্যাদি। মধ্যে পশু, মানব, দেবতাদি জাতি, স্বর্গাদি দেশ, যুগাদিকাল ও শত শত নিদ্রাদি পরিবর্ত্তন হইয়া গেলেও সে কর্ম্ম, সে পাপ পুণ্য, সে সংস্কার লুপ্ত হয় না,—কালান্তরে, দেশান্তরে ও অবস্থান্তরে গিয়া প্রকাশিত হয়, স্মৃতি বা স্মরণ জন্মায়, মধ্যে ব্যবধান আছে বলিয়া লুপ্ত হয় না। মনে কর, তুমি মনুষ্যজীবনে

শরীর

অনেক পাপ-পুণ্য করিয়াছ, তোমার মৃত্যু হইল, তুমি দেব কি পশু শরীর ধারণ করিলে, তোমার মনুষ্যজীবনের বাসনা এখন লীন থাকিল ; আবার যখন মনুষ্যশরীর ধারণ করিবে, তখন তোমার সেই বাসনা মনুষ্যোচিত কর্ম্মে প্রবুদ্ধ হইবে। সেই কর্ম্মবীজ হইতেই আবার সেই সেই পূর্ব্বানুভূত কর্ম্মের অনুরূপ অঙ্কুর জন্মে এবং সেই সেই অঙ্কুর আবার শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত হইয়া পুনর্ব্বার তৎসদৃশ অন্যান্য কর্ম্মবীজ উৎপাদন করে; জীব এইরূপ নিয়মের অধীন হইয়া সংসার-চক্রে ঘূর্ণমান হইতেছে। সূক্ষ্ম শরীরে ভোগ নাই। সূক্ষ্মশরীরের উপর ভোগায়তন কৌশিক শরীর ধারণ করিয়া জীবের ভোগ নিষ্পন্ন হয়। সূক্ষ্ম শরীরই যাতায়াত করে ; যাবৎ না প্রাকৃতিক প্রলয় উপস্থিত হয়, তাবৎকাল ইহপরলোক গমনাগমন করে। ইহারই নাম জন্ম মৃত্যু। সকল জীবেরই ভিতরে সূক্ষ্ম দেহ, উপরে স্থূল দেহ। স্থূলদেহ ফেলিয়া সূক্ষ্মদেহ দেহান্তর গ্রহণ করে।

মনুষ্য যেমন জীর্ণবেশ ছাড়িয়া অন্য অভিনব নূতন বেশ গ্রহণ করে, সূক্ষ্মদেহের দেহান্তরগ্রহণও সেইরূপ। রঙ্গালয়ের অভিনেতা, রাজা প্রজা কত সাজে সাজিয়া, রঙ্গমঞ্চে ভিন্ন ভিন্ন রূপে নানাপ্রকার তামাসা দেখায়, সেইরূপ সূক্ষ্ম দেহও নানা সাজে নানা আকারে সংসারে দেখা দিয়া থাকে। এমন বিভিন্ন সাজসজ্জা প্রকৃতির প্রভাবেই মিলিয়া থাকে। বিনা ভোগে কর্ম্ম ক্ষয় হয় না। কর্ম্মভোগের জন্যই শরীর ধারণ এবং জন্ম গ্রহণ। জীবের যখন কর্ম্মভোগ শেষ হয় নাই, তখন কর্ম্ম

ধ্বংসও হয় নাই ; প্রলয় হউক বা মহাপ্রলয় হউক, তাহাকে জন্ম গ্রহণ করিতেই হইবে, শরীর ধারণ করিবেই করিবে, তাহা অনিবার্য্য। তবে কিনা, মহাপ্রলয়ে সূক্ষ্ম শরীর ধ্বংস হইলেও কারণ শরীর বর্ত্তমান থাকে ; সূক্ষ্ম শরীরের সংস্কার, কর্ম্মবাসনা কারণশরীরে লীন থাকে ; পুনঃ সৃষ্টিকালে জীব কারণশরীর হইতে কর্ম্মকূট সংগ্রহ করিয়া সূক্ষ্ম শরীর ও স্থূল শরীর ধারণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্র সংসারে আবির্ভূত হয়। ইহারই নাম জন্ম বা সৃষ্টি।

জীবের কারণ শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর সম্বন্ধে কোনও পার্থক্য নাই ; কেবলমাত্র ভোগায়তন স্থূল শরীরেই পার্থক্য আছে। স্থূলশরীর চারিপ্রকার—পার্থিব, জলীয়, আগ্নেয় ও বায়বীয়। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর, জঙ্গমাদির শরীর পার্থিব পরমাণু হইতে। বরুণলোকবাসীদের শরীর জলীয় পরমাণু হইতে। ইন্দ্রাদির শরীর তৈজস পরমাণু হইতে। পিশাচাদির শরীর বায়বীয় পরমাণু হইতে। এই সমস্ত শরীরই বিকারী, ছেদ্য, ভেদ্য, দাহ্য, শ্রান্তি-ক্লান্তিযুক্ত, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অভিভূত, ব্যাধির দ্বারায় ক্লেশিত, জরা দ্বারা জর্জ্জরিত, মৃত্যু কর্ত্তৃক গ্রাসিত। এই সমস্ত শরীর হইতে শ্রেষ্ঠ-শক্তিসম্পন্ন নির্ব্বিকার আনন্দময় তনু আছে, তাহার নাম ব্রহ্মচর্য্যতনু। এই শরীর ধারণ সকলের ভাগ্যে ঘটে না। সৃষ্টিতে কেবল মাত্র দুই জন এই শরীর ধারণ করিয়াছিলেন, এক হনুমান্ আর এক ভীষ্মদেব।

শরীর

ব্রহ্মশরীর শুক্রময়। যে শরীর শুক্রময়, তাহাই অবিকারী, সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মতনু। যে তনু হইতে এক বিন্দুও শুক্র চ্যুত হয় নাই, বিকৃতও হয় নাই, তাহাই নির্ব্বিকার শুক্রময় তনু। যে তনু হইতে এক বিন্দুও শুক্র ক্ষরিত হইয়াছে, তাহাই বিকারী তনু। আব্রহ্ম কীট সকলেরই তনু হইতে শুক্র চ্যুত হইয়াছে, সার পদার্থ নির্গত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং সে সমস্ত তনুই অসার বিকারী তনু।

পঞ্চভূতের অতিশয় সাররূপ যে পদার্থ, তাহাই শুক্র। আমরা আহারের দ্বারা পঞ্চভূত হইতে সার পদার্থ আকর্ষণ করিয়া লইয়া শরীর পোষণ করি। সেই সার পদার্থ পুনঃ পুনঃ রক্তমধ্যে পরিগৃহীত ও পরিচালিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গব্যাপী হয়; যাহার সেই সার পদার্থ চ্যুত না হয়, তাহার সর্ব্বাঙ্গই সারের দ্বারা গঠিত হয়; সুতরাং তাহার সর্ব্বাঙ্গই শুক্রময় বা সারময়, সেই জন্য সারাৎসার। ঈশতনু সারাৎসার। ঈশে ও বিশ্বে ভেদ। কেন ভেদ? আব্রহ্ম কীট সকলেরই ব্রহ্মচর্য্যধারা খণ্ডিত হইয়াছে, সুতরাং অবিচ্ছিন্ন ধারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, সেইজন্য ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে। ঈশে বিশ্বে ভেদ বুঝা যায় কিসে? দেখা যাইতেছে, সমস্ত জীবের আত্মশক্তি পরশক্তিবশ, সকলেই জরা-মৃত্যু-গ্রস্ত, কাম-ক্রোধের বশীভূত। আত্মশক্তি পরশক্তির অধীন বুঝা যাইতেছে কি প্রকারে? মনে কর, তোমার ক্রোধ উপস্থিত হইয়াছে, তুমি জান ক্রোধ মহাদোষ; তোমার আত্মশক্তি বলিতেছে—ক্রোধ যখন দোষ, তখন আমি উহা

করিব না, তবু তুমি সময়ে সময়ে রাগ না করিয়া থাকিতে পার না। তোমার আত্মশক্তি বেশ জানে যে, পরস্ত্রী স্পর্শ করা মহাদোষ. বুঝিয়াও কেন জ্ঞানী অজ্ঞানী মহারথী সকলেই এই কার্য্য করিয়া থাকেন? এখানে দেখা যাইতেছে---আত্মশক্তি কোনও পরম শক্তিবলে এইরূপ করিতেছে। এখানে দুই শক্তির স্ফুরণ হইতেছে---এক আত্মশক্তি আর এক পরশক্তি অর্থাৎ ঈশশক্তি। ঈশশক্তি পূর্ণ, আত্মশক্তি অপূর্ণ; যে হেতু অপূর্ণ, সেই হেতু পূর্ণের অধীন, পূর্ণের বশ; একজন স্ববশ, একজন অবশ, সেইজন্য এই ভেদাভেদ। ঈশ্বর কারে বলি? যিনি পূর্ণ শক্তিকে পূর্ণ বশে রাখিয়া কার্য্য করিতেছেন অর্থাৎ যিনি শক্তির অনধীন, প্রত্যুত শক্তি অর্থাৎ বিপরীত শক্তি যাঁহার অধীন, তিনিই ঈশ্বর।

যিনি পূর্ণ শক্তিকে পূর্ণ বশে রাখিয়া স্বেচ্ছায় কার্য্য করিতেছেন, যাঁহাকে কাম ক্রোধাদি পরশক্তি বশে আনিতে পারে নাই, যাঁহার আত্মশক্তি পরশক্তির অধীন নহে, পর-শক্তিকে আত্মশক্তির বশে আনিয়া, ঈশাত্মশক্তিকে স্ববশে স্বেচ্ছায় পরিণামিত করিতেছেন, তিনিই মহাপুরুষ। এক্ষণে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ঐশ্বরিক শক্তি ঈশ্বরের অধীন এবং মহাপুরুষেরও অধীন; সুতরাং মহাপুরুষেরা পূর্ণ শক্তিমান্, ঈশ্বরও পূর্ণ শক্তিমান্, সুতরাং অভেদ। মলমূত্রে গ্রথিত, সম-ধারায় প্রবাহিত, পূর্ণাবেশে আবেশিত, পূর্ণ শোভায় শোভিত, পূর্ণানন্দে আনন্দিত, পূর্ণতেজে দীপ্ত, পূর্ণ জ্ঞানে জ্ঞানবান্,

শরীর

পূর্ণভোগে ভোগবান্, পূর্ণ সত্যে সত্যবান্, পূর্ণ রূপে রূপবান্, পূর্ণরসে রসবান্, এক কথায় ঈশে আর মহাপুরুষে অভেদ হেতু ঈশ পূর্ণাত্মগুণ মহাপুরুষে অবস্থান করে।

মহাপুরুষের তনু নিত্য নূতন। মাতাপিতার নিকট মাধুর্য্যময়, পিত্রাদির নিকট প্রিয়দর্শন, স্ত্রীলোকের নিকট মনোমোহন, জ্ঞানীর নিকট শান্তিপ্রদ, দুষ্টের নিকট ভীতিপ্রদ, শিষ্টের নিকট আশাপ্রদ, অসৎ লোকের নিকট শাস্তা, যোদ্ধার নিকট মহাবীর, লোকের নিকট নরশ্রেষ্ঠ, শ্রান্তি-ক্লান্তিরহিত, ছেদ্য ভেদ্য দাহ্যাদির অতীত, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অক্ষোভিত, রোগবর্জ্জিত, জরাহীন, মৃত্যুরহিত, আনন্দময়, তেজোময়, শক্তিময়, জ্ঞানময়, কল্পময়, চিন্ময়, সত্যময়।

ব্যাধি।

শরীরের শক্তির হ্রাস ও বিকৃতি অবস্থাই ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু। এই তিন পরস্পর সহচর ও সাহায্যকারী; ব্যাধি জরা-দূত, জরা মৃত্যু-দূত। ব্যাধি কার? বিকারী শরীর যার। শরীর ব্যাধির আগার। শরীর থাকিলেই ব্যাধি থাকিবে, অল্প আর বেশী এইমাত্র প্রভেদ। যাহার যেরূপ শরীর, তাহার সেই-রূপ ব্যাধি। স্থূল শরীরে স্থূল ব্যাধি, যেমন—জ্বর, কাসি, অম্ল, বিস্ফোটক ইত্যাদি। সূক্ষ্ম শরীরে সূক্ষ্ম ব্যাধি, যেমন—কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি; ইহাতেও শরীরের মহৎ অনিষ্ট করিয়া থাকে।

ব্যাধি দুইপ্রকার,—শারীরিক ও মানসিক; এই উভয়বিধ ব্যাধিই পরস্পরের সাহায্যে পরস্পর সমুৎপন্ন হয়। একের সাহায্য না থাকিলে অন্যের উৎপত্তি হয় না। শরীর অসুস্থ হইলেই মনের অসুখ ও মন অসুস্থ হইলে শরীরের অসুখ হয়। বায়ু, পিত্ত, কফ ও শোণিতের বৈষম্য প্রযুক্ত শরীর ব্যাধি-গ্রস্ত হয়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা, মৃত্যু এই সকল শরীরের স্বাভা-বিক ব্যাধি; আর মনের বৈষম্য প্রযুক্ত কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মাৎসর্য্য, শোক, ভয়, বিষাদ, দৈন্য, ঈর্ষা ইচ্ছা ইত্যাদি মনের শান্তিনাশক বলিয়া মানস ব্যাধি। দুঃখ পাপের ফল। পাপ

করিলে রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতেই হইবে। এমন কোনও প্রাণী নাই যে, তাহার পাপ নাই ; যে হেতু পাপ আছে, সেই হেতু রোগ আছে ; পাপবর্জ্জিত জীব নাই, সেইজন্য রোগবর্জ্জিত দেহ নাই।

জ্ঞান, তপস্যা ও যোগ, এই তিনের একেতেও যাহার মতি আছে, রোগে তাহাকে কোন মতেই কষ্ট দিতে পারে না ; দীর্ঘকাল পরে অতি সামান্য কোনও রোগ হইতেও পারে, এইমাত্র বিশেষ। সমস্ত জীবই বিকারযুক্ত-শরীর, সুতরাং ব্যাধিযুক্ত। হরিহর-ব্রহ্মাদি সকলেরই ব্যাধি দৃষ্ট হয় ; বিষ্ণুর বৈষ্ণব জ্বর, শিবের শৈব জ্বর, ব্রহ্মার ব্রহ্মজ্বর, ইন্দ্রের ভগন্দর, চন্দ্রের যক্ষ্মা ইত্যাদি। স্বর্গীয় কবিরাজ ধন্বন্তরি প্রভৃতির নাম শুনা যায় ; স্বর্গে যদি ব্যাধি না থাকিবে, তবে কবিরাজের প্রয়োজন কি ? ব্যাধিবর্জ্জিত প্রাণী নাই, সুতরাং মৃত্যুবর্জ্জিত জীব নাই !

পরাভব নাই কার ? ব্যাধি নাই যার। ব্যাধি নাই কার ? বিকারী শরীর নয় যার। যে শরীরে ব্যাধি নাই, যে শরীর সার পদার্থের দ্বারা গঠিত, সে শরীর ব্যাধিরূপ ঘুণে ধরে না ; শক্তিহ্রাস নাই, সেই জন্য অজেয়। বিশ্ব ব্যাধি কর্ত্তৃক জেয় ; সেই ব্যাধি যাঁহার দ্বারা জেয়, তিনি অজেয়। মহাত্মা-দিগের শরীরে স্বাভাবিক ব্যাধি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা, মৃত্যু নাই ; বায়ু, পিত্ত, কফ ও শোণিতের বৈষম্য প্রযুক্ত বিস্ফোটক, শূল, জ্বরাদি এই সকল ব্যাধিও নাই ; আর মনের বৈষম্য প্রযুক্ত কাম ক্রোধ মদ মাৎসর্য্য শোক ভয় বিষাদ ইত্যাদি মনের শান্তি-

নাশক মানসিক ব্যাধি নাই। মহাপুরুষেরা সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিত; সেই জন্য সকলেই তাঁহাদিগের নিকট পরাভূত। জীবমাত্রেই বিকারী, সেইজন্য ব্যাধি জরা মৃত্যু অনিবার্য্য।

জরা

জীব মাত্রেই রোগী, কেননা সকলেই জরা কর্ত্তৃক জরিত। জরা মৃত্যু-দূত। দূত দ্বারা যেমন সংবাদ প্রেরণ করা হয়, মৃত্যুও সেইরূপ জরা দ্বারা সংবাদ প্রদান করে যে, তোমার শক্তির হ্রাস হইয়াছে, তুমি অচল হইয়াছ, সচল হইবার জন্য শক্তির প্রয়োজন, সুতরাং নূতন শরীর আবশ্যক, অতএব আমি যাই-তেছি, যাইয়া নূতন শরীর প্রদান করিব ; ইহাই জরার খবর। বাল্যকালের সুখভোগ সম্পূর্ণ হইতে না হইতেই যৌবন সহসা উহাকে গ্রাস করে। তার পর যৌবন ভয়ঙ্কর জরা-কবলে সহসা নিপতিত হইয়া থাকে। হিম যেমন পদ্মের, নদী যেমন তীরজাত তরুর, জরা তেমনি দেহের শক্তি ধ্বংস করে। জরা-প্রভাবে তাড়িত হইয়া প্রজ্ঞা দেহ ত্যাগ করে। অন্ধকারের আবির্ভাবে পেচকের ন্যায়, জরার আবির্ভাবে মৃত্যু উপস্থিত হইয়া থাকে। জরা যৌবনকে ভক্ষণ করিয়া উল্লাসিত হয়। বর্ষা যেমন জলাশয় কলুষিত করে, জরা তেমনি মন মলিন করে। অন্ধকার যেমন দৃষ্টি হরণ করে, জরা তেমনি জ্ঞান বিনাশ করে। এই জরার হাতে কাহারও রক্ষা নাই, জন্মিলেই জরা ধরিবে, সকলকেই ইহার নিকট পরাজিত ও উপহসিত হইয়া থাকিতে হইবে।

তত্ত্ববোধ

যাহা শরীরের শক্তিকে জীর্ণ করে, তাহাই জরা। বিকারী পদার্থ মাত্রেই পরিবর্ত্তনশীল, পরিবর্ত্তন মাত্রেই জরাগ্রস্ত। বাল্যে তিল তিল করিয়া শক্তি বর্দ্ধন হইয়া যৌবনাবস্থাপ্রাপ্ত হয়, আবার যৌবনের শক্তি তিল তিল হ্রাস হইয়া জরা প্রাপ্ত হয়। পরিবর্ত্তন দুইপ্রকার,—তীব্র ও মৃদু। তীব্র পরিণাম আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি; মৃদু পরিণাম সহজে অনুমান করা যায় না। মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি তীব্র পরিণামী, আর সূর্য্য, চন্দ্র, হরি-হর-বিরিঞ্চ্যাদি মৃদু পরিণামী; তাঁহাদের পরিবর্ত্তন আমরা সহজে অনুমান করিতে পারি না, সেইজন্য তাঁহাদিগকে আমরা অজরামর মনে করি; প্রত্যুত, শরীর ধারণ করিয়া কেহই অজর হইতে পারে না। খণ্ড শক্তিরই জরা, এবং খণ্ড শক্তিমানেরই পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। নির্ব্বিকার কে? অজর যে। অজর কে? আনন্দময় নির্ব্বিকার যে। আনন্দময় নির্ব্বিকার কে? মহাপুরুষ, দেবর্ষি, মহর্ষি, মহাভক্ত যোগিগণ। তাঁহাদিগের শরীর পূর্ণ শক্তির আধার, সেই শরীরে শক্তির হ্রাস নাই, সেইজন্য জরাও নাই। যেহেতু শক্তির হ্রাস নাই, সেই হেতু নির্ব্বিকার।

মৃত্যু

সকলেই কালভয়ে ভীত এবং মৃত্যুভয়ে ত্রাসিত। যিনি ভীত, তিনিই মৃত। ব্যাধি যার, জরা তার ; জরা যার, মৃত্যু তার। ব্যাধি জরা ও মৃত্যু, সমস্তই শক্তির হ্রাস অবস্থায় হইয়া থাকে। এই যে মৃত্যু কথাটি, ইহা বিশ্বত্রাসক নাম। প্রাণী মাত্রেই যার নামে কম্পিত, স্বয়ং মৃত্যুপতি আতঙ্কিত, যাহার স্মরণে দেব, দানব, মানব, পশু, পক্ষী, কীট, তরু, লতা যাহার ভয়ে ভীত ; পৃথিবী নিজে, স্বয়ং সৌর জগৎ পর্য্যন্ত মহাভীত। জন্ম ও মৃত্যু পরস্পর আপেক্ষিক, জাত হইলেই মরিতে হইবে।

মৃত্যু দেহের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ; আজ হউক, কাল হউক, শতাব্দী বাদে হউক, একদিন না একদিন মৃত্যুর কবলে পড়িতেই হইবে। জন্ম ও মৃত্যু—এক বস্তুরই দুই পিঠ, সেইজন্য জগৎ মৃত্যুর অধীন। মরণ নিশ্চয়, নাহিক সংশয়। জগতের সমস্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে মৃত্যু একটি ধ্রুব নিশ্চয় এবং মহাসত্য। আমরা যখন জগতে আসিয়াছি, তখন নিশ্চয়ই এক-দিন ইহা ছাড়িয়া যাইতে হইবে। জানি না কোন্ বয়সে, কোন্ মুহূর্ত্তে মৃত্যু ঘটিবে। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহ ঠিক যে, একদিন মৃত্যু আসিবেই আসিবে। একদিন মরিতে হইবে, মানুষ মাত্রেই

তাহা জানে, সর্ব্বদা মনে না হইলেও একদিন যে মৃত্যুর কঠোর করাল কবলে অবশভাবে কবলিত হইতে হইবে, নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত প্রিয়তম ধনজনাদির মমতাপাশ ছেদন করিতে হইবে, তাহা নিশ্চয় ; সেইজন্য মৃত্যুর নামে এত আতঙ্ক, স্মরণে রোমাঞ্চ, চিন্তা করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। যাহাদিগকে আমি এত ভালবাসি, এবং আমাকে যাহারা এত ভালবাসে, যাহাদিগের সঙ্গ ছাড়িতে হইবে ভাবিলে প্রাণ আকুল হয়, হৃদয় শোকে অভিভূত হয়, আমাকে এই সমস্ত ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে ভাবিলে যাহাদের প্রাণ আকুল হয়, মৃত্যুর পর তাহারাই বা কোথায় যাইবে, আমিই বা কোথায় থাকিব ? এ হেন সোণার সংসার, স্ত্রী, পুত্র, ভোগ, ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া না জানি কি অদ্ভুত জায়গায় যাইয়া পড়িতে হইবে, তাহার ঠিক নাই। সুখে থাকি বা দুঃখে থাকি, এ জগতের সঙ্গে একপ্রকার আপোষ নিষ্পত্তি করিয়া যাইতে হইবে। এখানে যে সকল আত্মীয় স্বজনের প্রেমশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া সুখে দিন কাটাইতেছি, মরণের পর, তাহাদিগের সহিত এই ভাবে আর কি মিলিতে পারিব, তাহারাই কি আমার সহিত মিলিতে পারিবে ? মৃত্যুর পর কি তাহাদের সহিত আর দেখা হইবে ? এই-প্রকার চিন্তায় মানুষকে মরণের নামে ব্যাকুল করিয়া ফেলে। বাস্তবিক পারলৌকিক রহস্য, জীবন-যবনিকার চির অন্তরালে রহিয়াছে ও রহিবে।

কোন্ পদার্থের নাম মৃত্যু ? মমতা বা ভয়ই মৃত্যু ; ইহা

ছাড়া দ্বিতীয় কোনরূপ মৃত্যু জগতে নাই। মমতা এবং ভয় অজ্ঞানপ্রসূত। যাহার অহংজ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহারই মমতা জন্মিয়াছে। অহংজ্ঞানই মমতা। যাহার শরীরে বা আত্মীয় স্বজনের উপর মমতা জন্মিয়াছে, তাহার আগে দুঃখও জন্মিয়াছে, দুঃখ হইবে বলিয়া ভয়ও জন্মিয়াছে, সুতরাং মমতা বা ভয়ই মৃত্যু। মৃত্যু কেবল একটি পরিবর্ত্তন মাত্র। কার পরিবর্ত্তন? শক্তির কালিক পরিবর্ত্তন। বাল্যশক্তি যেকালে বর্দ্ধিত হয়, তাহা যৌবনকাল; যৌবনশক্তি যে কালে হ্রাস প্রাপ্ত হয়. তৎকাল জরা; তাহার পর মৃত্যুকাল। মৃত্যুর আর এক নাম কাল। বাল্যের পরিবর্ত্তন যৌবন, যৌবনের পরিবর্ত্তন বার্দ্ধক্য, বার্দ্ধক্যের পরিবর্ত্তন জরা, জরার পরিবর্ত্তন মৃত্যু। সব্রহ্মা সৌরজগৎ মুহুর্মুহুঃ পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহা কেবল মৃত্যুরই রূপান্তর মাত্র।

স্থূল শরীরের ভোগশক্তি ও কার্য্যশক্তি ধ্বংস হইলে, যে কালশক্তি আসিয়া পুনঃ নব শক্তিতে শক্তিমান্ করে, তাহাই মৃত্যু। সর্পদংশনে হউক, বজ্রপাতে হউক, ব্যাধিতে হউক, যে কোনপ্রকার মৃত্যুর কারণই স্থূল শরীরের ভোগ ও কার্য্যে অক্ষমতা। মৃত্যু হয় কেন? স্থূল শরীর যখন ভোগ ও কার্য্য করিতে অক্ষম হয়, তখন লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্ম শরীর, স্থূল শরীরকে ত্যাগ করিয়া, অভিনব নূতন শরীর ধারণ করে। জন্ম ও মৃত্যু উভয়ই আত্মার উন্নতির জন্য। আত্মাতে জ্ঞানোৎপাদনের জন্যই শরীর। এই শরীর যখন জ্ঞানোৎপাদনে অসমর্থ

হয়, তখন আত্মার জ্ঞানোৎপাদনার্থ নূতন শরীর হইয়া থাকে, ইহাই জন্মমৃত্যুর রহস্য। মৃত্যু একজন মহা উপকারী বন্ধু, পরম দয়াবান্ ও মহাদাতা। মৃত্যু আত্মার জ্ঞানোৎপাদনের জন্য স্থূল শরীর হইতে সূক্ষ্ম শরীরকে পৃথক্ করে, এইজন্য মৃত্যু উপকারি মিত্র। বার্দ্ধক্যে জীব বড় কষ্ট পায়, সেই কষ্টকে মৃত্যুই দূর করিয়া থাকে, এইজন্য মৃত্যু পরম দয়াল। মৃত্যু প্রাণী মাত্রেরই পুরাতন শরীর গ্রহণ করিয়া নূতন শরীর দান করিয়া থাকে, এই জন্য মৃত্যু মহাদাতা।

জীর্ণবাস ত্যাগে নববস্ত্র পরিধানে লোকে আনন্দই বোধ করিয়া থাকে। কিন্তু মৃত্যুর বেলায় পুরাতন শরীর ত্যাগে নব শরীর ধারণে আনন্দ বোধ করে না কেন ? মনে কর তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, তোমার শরীর অপটু হইয়াছে, অপটু শরীর লইয়া কেবল যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ, সেই সময় যদি কেহ আসিয়া বলে যে, তোমার শরীর নূতন করিয়া দিব, তাহা হইলে তুমি কি আনন্দিত হও না ? অবশ্যই হও ; কেননা তুমি নূতন শরীর পাইলে নিত্য নূতন ভোগ করিতে পারিবে। মৃত্যুও তোমাকে নূতন শরীর দিবে, তবে কেন মরণের নামে এত ভয় পাও ? ইহার কারণ এই যে, দেহের উপর, আত্মীয় স্বজনের উপর তোমার অতিশয় মমতা জন্মিয়াছে, সুতরাং তাহাদের ত্যাগে দুঃখও জন্মিয়াছে, দুঃখ পাইবে বলিয়া ভয়ও জন্মিয়াছে। বস্ত্রের উপর তোমার মমতা জন্মে নাই, সেইজন্য বস্ত্র ত্যাগে দুঃখও জন্মে নাই, সুতরাং ভয়ও উৎপন্ন হয় নাই, বরং আনন্দই

মৃত্যু

জন্মিয়াছে। সেইরূপ বিবেকবলে দেহের প্রতি যদি মমতা না জন্মে, তবে তাহা ত্যাগে দুঃখেরও কারণ থাকে না; দুঃখা-ভাবে ভয়ও উৎপন্ন হয় না, বরং অকর্ম্মণ্য পুরাণ শরীর ত্যাগে আনন্দই জন্মিতে পারে; সুতরাং ভয়ই মৃত্যু, মৃত্যুই ভয়। অন্য কোনপ্রকার মৃত্যু জগতে নাই।

কাল জগৎ-নাশক। বিশ্ব মহাপ্রলয়ে কাল-কুক্ষিগত হইবে, ব্যক্ত জগৎ অব্যক্তে লীন হইবে, ইহার কিছুই থাকিবে না। বিশ্ববাল্য অতীতে লীন হইয়াছে, যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, যৌবনান্তে বার্দ্ধক্যে কাল-কুক্ষিগত হইবে। জাগতিক শক্তি যখন হ্রাস প্রাপ্ত হইবে, তখনই মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে।

জগৎ শব্দের অর্থ—যাহা গতিশীল, অনন্ত কালাভিমুখে যাহার গতি অথবা যাহা গত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, অর্থাৎ যাহা থাকিবার নহে, তাহাই জগৎ। মরণই নিয়তি, নিয়তিই প্রকৃতির গতি, এই গতিতে জগৎচক্র নিয়ত কালের পথে চলিয়াছে। অনিত্য সর্ব্বভূত নিত্যকালের ক্রীড়ার সামগ্রী মাত্র। বাজীকর যেমন বিবিধ খেলনা বস্তুর দ্বারা বাজী দেখাইয়া, আবার সেইগুলিকে থলিয়ার মধ্যে পূরিয়া রাখে, বিশ্ববাজীকর কালও নিয়ত বিবিধ বিচিত্র ভৌতিক বাজী দেখাইতেছে ও এক একটা খেলনা অতীতের থলিয়াতে পূরি-তেছে। কালেই সমস্ত লয় হইবে, এইজন্য মরণের আর এক নাম কাল। কালপ্রাপ্তিই জগতের ব্যাপার, ইহাই একমাত্র সমাচার।

কালে সমস্তই গ্রাস করিবে, কিছুই থাকিবে না, ইহাই জগতের একমাত্র মূল খবর, ইহাই একমাত্র জ্ঞাতব্য, জগতের অনিত্যতাই বিষয়। এই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপারটী মায়াজাত মহামোহেরই মোহিনী শক্তির ফল। জগতে যিনি যত বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান, রূপ, গুণ, যশ, সৌরভ, পদ, গৌরবাদিতে বিভূষিত হউন না কেন, মরণ হরণের উপায় করিতে না পারিলে সকলই বৃথা, সমস্তই বিড়ম্বনা। এই সংসারখানা এবং কসাইখানা দুই-ই সমান, কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। একবার মনোযোগের সহিত বিবেচনা করিয়া দেখ; আমরা নিতান্ত দীন হীন ছাগমেষাদির ন্যায় কর্ম্ম-ডোরে বদ্ধ হইয়া মহাকালের কসাইখানায় নীত হইতেছি। সময়কালে একটু ছটফটানি ভিন্ন আর কোনও ক্ষমতাই নাই, কোনও শক্তিই নাই; কি ভয়ানক শোচনীয় অবস্থা!

এই সংসারে বুদ্ধিমত্তার বিশেষ খ্যাতি আছে বটে, কিন্তু কালের কাল আসিলে, সকলেরই বুদ্ধি ফুরাইয়া যায়, তখন আর কাহারও বুদ্ধি বাহির হয় না। যাহার বুদ্ধি তাহার প্রতিকারে সমর্থ, সেই যথার্থ বুদ্ধিমান্, নচেৎ নেঙ্গুড় নাড়াই সার। মহাপ্রলয়ে দেহলয় অবশ্যম্ভাবী, কালে ভূতের উপর কালের অধিকার নিশ্চয়ই হইবে। পুরুষকার প্রয়োগ দ্বারা যত ইচ্ছা ততকাল বাঁচিতে পার, অসাধারণ শক্তিবলে আসন্ন মৃত্যুর আক্রমণ অতিক্রম করিলেও একদিন দেহের উপর কালের অধিকার আসিবেই আসিবে।

মৃত্যু

কি উৰ্দ্ধ লোকের জীব, কি অধোলোকগত জীব, জরা মরণাদিজনিত দুঃখ, ক্লেশ সকলেরই সমান। অশ্বত্থামাদি সাতজন চিরজীবী, দেবতারা অমৃত পানে অমর, এক একটি মন্বন্তরে এক একটি ইন্দ্রের পতনে লোমশমুনির এক এক-গাছি লোম খসে, সমস্ত লোম খসিলে তাঁহার মৃত্যু। চির-জীবিত্ব, অমরত্ব বিরাট্ কালের এক ক্ষুদ্র অংশব্যাপী মাত্র। মৃত্যুর শক্তি সর্ব্বনাশী, কালের করাল কবল বিশ্বগ্রাসী, তাহাতে আর সংশয় নাই। প্রলয়-অন্তে ব্রহ্মা জাগরিত হইয়া যখন কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কেবল চতুর্দ্দিকে ধূ ধূ শূন্যময়, তখন তিনি ভীত হইলেন ; যেহেতু ভীত, সেই হেতু মৃত। সেই অবধি লোকে একাকী থাকিতে ভয় পায়।

ভয় কার ? মমতা যার। মমতা কার ? মোহ যার। মোহ কার ? জ্ঞান অপূর্ণ যার। জ্ঞান অপূর্ণ কার ? বীর্য্য চ্যুত যার। জীব মাত্রেই বিকারী, সেইজন্য পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুগ্রস্ত। যার ব্যাধি জরা মৃত্যু আছে, তাহারই শক্তিহ্রাস অনুমেয় ; যাহার শক্তিহ্রাস আছে, তাহার ব্যাধি জরা ও মৃত্যু অনুমেয়।

পূর্ণজ্ঞানে অজ্ঞান কোথায় ? পূর্ণ শক্তিতে ভয় কোথায় ? অভয় বলিয়া অমৃত। অমৃত কে ? মমতাশূন্য যে। যাহার শরীরে মমতা নাই, তাহা ত্যাগে দুঃখও নাই, সেইজন্য দুঃখ-প্রাপ্তির ভয়ও নাই, প্রকৃতপক্ষে তিনিই নির্ভীক। যিনি নির্ভীক, তিনিই হাসিতে হাসিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে

পারেন। যিনি হাসিতে হাসিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারেন, তিনিই কালকে জয় করিয়াছেন। তিনিই অমৃত, ইহা ছাড়া কালনাশক বিশ্বে দ্বিতীয় আর কিছু নাই। যিনি মৃত্যুসময়ে সহাস্য বদনে আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে বিদায় লইতে পারেন, মনে করিতে হইবে মর্ত্তে তিনিই মহা-পুণ্যবান্। যিনি বহু কষ্ট ভোগ, নানাপ্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, হাত-পা-অবশ, মায়ায় মুগ্ধ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মৃত্যুভয়ে ব্যাকুল হন, তাঁহার মৃত্যু অপমৃত্যুরই সমান, তাঁহার মত দুর্ভাগ্য ও শোচনীয় অবস্থা আর কাহারও নাই; মনে করিতে হইবে তাহার মহাপাপের জীবন।

মনুষ্য যদি সংসারে আসিয়া হাসিয়া মরিতে না পারিল, তবে মনুষ্যজীবন ধারণ করিল কেন? মরিবার সময় পশুরাও অতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মরিয়া থাকে, মনুষ্য ও পশুতে প্রভেদ কি? যিনি হাসিতে হাসিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া, কালের মুখে কালী দিয়া, কালকে জয় করিয়া মরিতে পারেন, তিনিই মহাপুরুষ এবং তাঁহার মহা-পুণ্যের জীবন মনে করিতে হইবে। যাঁহার মৃত্যুভয় নাই, এই সংসারে তাঁহার কোনও ভয় নাই। মৃত্যুকে জয় করিতে পারিলে সমস্ত বিশ্ব জয় করা হয়।

শ্মশান

বিশ্ব-নাট্যের বিরামস্থান শ্মশান। অভিমান, গর্ব্ব, দুঃখ, শোক, তাপ, আধি, ব্যাধি, জ্বালা, যন্ত্রণার অবসান-নিকেতন। ধনী, নির্ধন, দুঃখী, সুখী, রাজা, প্রজা, দীন, ভিখারী যেখানে সমভাব, তাহারই নাম শ্মশান। বিশ্ব একটি মহাশ্মশান; কেননা জগতে অদাহ স্থান নাই, তবে কেন শ্মশানের নামে এত ভয়? পৃথিবীতে যদি কোনও পবিত্র স্থান থাকে, তাহা এই শ্মশান। যে পূতধামে পূতমনা সদানন্দে বিরাজিত, সেই স্থানের নাম শ্মশান।

একদিন মহেশ্বর কহিলেন—দেবি! আমি পবিত্র স্থান অন্বেষণ করিয়া অদ্যাপি সমুদয় পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া থাকি; কিন্তু শ্মশান অপেক্ষা কোনও স্থানই পবিত্র বলিয়া জ্ঞান হয় না। তাই শ্মশানবাস করিতে আমি নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি। পবিত্রস্থান-লাভাকাঙ্ক্ষী মহাত্মারা এই পরম পবিত্র শ্মশানেই সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকেন। যাঁহারা পবিত্রমনা, পবিত্রধাম শ্মশানেই তাঁহারা আনন্দ অনুভব করেন। এখানে ক্রোধ নাই, মাৎসর্য্য নাই, কাম নাই, ভয় নাই, লোভ নাই, ক্ষয় নাই, হিংসা নাই, কুটিলতা নাই; নাই অসূয়া, নাই অশুচি; সেই

জন্য এই শ্মশানে মহাপুরুষেরা মহানন্দে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন।

জীবের মহাবিশ্রামস্থান, চির শান্তিধাম এই সেই মহা-শ্মশান। এই মহাশ্মশানে, মহাশয্যায়, মহাশয়নে, মহাশয়েরা তিনজনে, নির্জ্জনে, এই ঘোর নিশিতে এখানে কিসের যুক্তি করিতেছেন? এক মহাপুরুষের পাশে একটি বালক দণ্ডায়মান, বালকটি বলিতেছে—পিতঃ! এস; ক্রোড়ে একটী বালিকা শায়িত ও নিদ্রিত, মাঝে মাঝে চমকিয়া উঠিতেছে আর বলিতেছে—বাবা! চল, আর যন্ত্রণা সয় না। মহাপুরুষ বলিতেছেন—বৎস! এখনও নিশা অবসান হয় নাই, চতুর্দ্দিক্ গাঢ় নিস্তব্ধ, ঘোর অন্ধকার, আমি এ নিশায় তোকে লইয়া কোথায় যাইব? আমি কি তোদের ছেলে মানুষের কথায় যাইব? যখন আমার ইচ্ছা হইবে, যাইবার উপযুক্ত সময় বোধ করিব, তখনই তোকে লইয়া যাইব, তোর যদি যন্ত্রণা হইয়া থাকে, আয়, তোর গায়ে হাত বুলাইয়া দিই। মহাপুরুষ বালিকার গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন, বালিকা পুনঃ নিদ্রিত হইল। বালিকা কিয়ৎক্ষণ পরে আবার চমকিয়া উঠিয়া বলিল—পিতঃ! আর যন্ত্রণা সয় না, এইবার চল, এ শয্যা আমার পক্ষে বড়ই যন্ত্রণাদায়ক, বাবা! তুমি প্রফুল্ল মনে কেমন করিয়া শুইয়া রহিয়াছ? যদি তুমি না যাও, তবে আমি তোমাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইব, আমার আর এ যন্ত্রণা সয় না, তুমি কেমন করিয়া সহ্য করিতেছ? বাবা!

তুমি কি আমার কথা শুনিতে পাইতেছ না, তুমি কি ভাব্‌ছ? বালিকা যথার্থই বলিয়াছে, মহাপুরুষ কি ভাবিতেছেন, মহাপুরুষকে দেখিলে বোধ হয়, যেন কি এক মহাচিন্তায় নিমগ্ন, যেন কন্যাদায়গ্রস্ত; "শাঁগ নাই তার পুতের দিব্বি করা"র ন্যায়, এই মহাপুরুষও কন্যাদায়গ্রস্ত। মহাপুরুষ এবার হাসিয়া বলিলেন—তোর বিবাহের কথা ভাবিতেছি, কার সঙ্গে তোর বিয়ে দিই। তোকে বিবাহ করিতে কেহ রাজি হয় না, তুই যে বড় দুরন্ত মেয়ে। তোর নামে বিশ্বত্রাসিত, জীবমাত্রেই ভাবিত, সুরাসুরনাগলোক কম্পিত, তাই ভাবিতেছি তোকে বিয়ে ক'র্‌বে কে? তোর বিয়ের জন্য আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি, তোর কাছে কেহ স্বেচ্ছায় ঘেঁসে না, তোর রাক্ষসগণ, সেইজন্য পাত্র জুটে না; যাহার সঙ্গে বিবাহ দিব, তাহাকেই খাইয়া ফেলিবি, সুতরাং বিবাহ দেওয়া আর না দেওয়া সমান ও বৃথা; যেখানে বিবাহ দিলে নিশ্চয়ই বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, জানিয়া শুনিয়া কিপ্রকারে সেখানে বিবাহ দিই। বালিকার জন্য মহাপুরুষ ত্রিভুবন খুজিলেন, কোথাও পাত্র মিলিল না। অগত্যা পাশের সেই বালকটীর সহিত বিবাহ দিলেন। উপযুক্ত পাত্রে উপযুক্ত পাত্রী সম্প্রদান করা হইল। বালক স্থির-যৌবন, মৃত্যুরহিত, সুতরাং বালিকাকে আর বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। মহাপুরুষ এই বিবাহে ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মহা ঘটা করিয়া এই বিবাহ দিবেন

স্থির করিয়াছিলেন ; দুঃখের বিষয়, নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে কেহই আসেন নাই। মনুষ্য দেবাসুর যক্ষ রক্ষ, স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল হইতে, কেহই বরযাত্র বা কন্যাযাত্র হইয়া আসেন নাই। হরি হর বিরিঞ্চি নামে ত্রাসিত, বাজনা বাজায় কে ? লক্ষ্মী সরস্বতী সাবিত্রী দুর্গা ভয়ে কম্পিত, তবে হুলু বা উলু দিবে কে ? দেব-কন্যা কেহ ভয়ে বাহির হইলেন না, শাঁক বাজাবে কে ? পাঠক ! এ বিবাহে কেহই আসিলেন না, তোমরা কেহ বরযাত্র যাইতে রাজী আছ কি ? দেখো সাবধান ! কন্যা দেখিলে সকলেরই চক্ষু স্থির হইবে, কেহই কিন্তু ঘরে ফিরিয়া আসিতে পারিবেন না, শেষে যেন আমি গালাগালি না খাই। সরস্বতী সাবিত্রী প্রভৃতি দেবীরা এ বাসরে বাসর জাগিতে কেহ আসিলেন না। মা বঙ্গলক্ষ্মীগণ ! এ বাসরে বাসর জাগিতে কেহ রাজী আছ কি মা ? মনে রাখিও, এখন আসিলে না বটে, কিন্তু একদিন এই বাসরে আসিয়া বাসর জাগিতেই হবে। মাগো ! কেহই আটক করিয়া রাখিতে পারিবে না। যাঁহাদিগকে কত ভয় কর, কত মান্য কর, কত কায়দার মধ্যে থাক, কত আধিপত্য, কত রকমের বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া সুখে দিন কাটাও, একদিন, তোমার সাধের যাহা কিছু আছে, সমস্ত ত্যাগ করিয়া, দীন হীন বেশে এই বাসর জাগিতে আসিতেই হইবে।

পাঠক মহাশয় ! এই মহাপুরুষ কে, যিনি এই মহাশ্মশানে প্রফুল্লমনে বিবাহকার্য্য সমাধা করিতেছেন ? আর ঐ বালক বালিকাই বা কে, ইঁহাদিগকে চিনিতে পারিলেন কি ? এই

মহাপুরুষ আত্মা, সম্মুখে দণ্ডায়মান বালকটি কাল, ক্রোড়ে শায়িত বালিকাটি মৃত্যু। নিত্য বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য ভোগ করিতেছে যে পদার্থ, তাহাই কাল ও মৃত্যু; সুতরাং বালক বালিকা বলা যায়। পুত্র কন্যা যেমন পিতা মাতার আজ্ঞাধীন ও বশীভূত, এই বালক বালিকা বা কাল ও মৃত্যু আত্মার আজ্ঞাধীন ও বশীভূত। বিশ্বে এমন কোনও প্রাণী নাই, যাহার মহাকাল ও মহামৃত্যু বশীভূত। যে কাল এবং মৃত্যু সকল-কেই কেশে আকর্ষণ করিয়া বলপূর্ববক লইয়া যায়, তাহারা আজ আত্মার আজ্ঞাবহ। কাল ও মৃত্যু বলিতেছে—চল, আত্মা বলিতেছেন এখন যাইব না, আমার যখন ইচ্ছা হইবে তখন যাইব। আব্রহ্ম কীট মৃত্যুকে কে বলিতে পারিয়াছে—আজ আমি যাইব না কাল যাইব, বা যখন ইচ্ছা তখন যাইব, এবং মৃত্যুই বা কাহার কথায় প্রতীক্ষা করিয়াছে? সেই মৃত্যু বিষদাঁত-ভাঙ্গা সর্পের ন্যায় শান্ত মূর্ত্তিতে আত্মার বা পরমাত্মার আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া থাকে, আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া থাকে।

কাল এবং মৃত্যু করজোড়ে ভীষ্মদেবের প্রতীক্ষা করিয়াছে। মৃত্যু যে শয্যায় মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে, সেই শর-শয্যায় ভীষ্মদেব মৃত্যুকে ক্রোড়ে করিয়া মহানন্দে মহাশয়নে উত্তরায়ণ দিবা অপেক্ষা করিয়াছেন। সেই মহাপুরুষ বীর-ই ধন্য। মৃত্যুই যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে, তিনি কিন্তু প্রফুল্ল মনে মহানন্দে ছিলেন। মৃত্যু বলিতেছে—পিতঃ! যদি তুমি আমার

সঙ্গে না যাও, তবে আমি যাই। এমন মহাপুরুষ কে আছেন, যাঁহাকে মৃত্যু দায়ে ঠেকিয়া ত্যাগ করিয়া যাইতে চাহিতেছে ? পক্ষান্তরে যিনি করুণাবশ হইয়া মৃত্যুকে ছাড়িতে চাহিতেছেন না, প্রত্যুত তাঁহার আবদার রক্ষার্থে ইচ্ছুক হইয়াছেন, সেই মহাপুরুষ মৃত্যুর গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছেন আর বলিতেছেন, বৎসে! এখন দক্ষিণায়ন-নিশা অবসান হয় নাই। নিশা অবসান হইলে, উত্তরায়ণ-দিবা আগমন করিলেই আমি তোরে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব। অমনি মৃত্যু-কন্যা নতশির, তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর কিছু করিতে পারিল না, করিবার সাধ্যও নাই। এইজন্য মহাপুরুষ ও আত্মায় প্রভেদ নাই ; তাঁহাদিগের ইচ্ছা-মৃত্যু কালজয়ী, সুতরাং কাল বশীভূত আজ্ঞাধীন, সুতরাং পুত্রস্থানীয়। পুত্র যাঁর কাল, কন্যা যাঁর মৃত্যু, তিনিই কালজয়ী মহাপুরুষ।

জগতে সেই যোগিবরই ধন্য, যিনি এই সংসারের ছায়াবাজী ভুলিয়া চিরকাল শ্মশানে বাস করেন এবং এই স্থানে বসিয়া একমনে যোগ অভ্যাস করত নিশ্চয়ই ভগবান্‌কে পাইয়া থাকেন। এই সেই শ্মশান, যেখানে যোগীর প্রধান মহাদেব বসিয়া যোগ করিতেন। প্রকৃতির লীলাভূমি রজত-কৈলাস যাঁহার সুখের নিবাস, তিনি এই শ্মশানকে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়-তম জ্ঞান করিতেন। প্রাণ খুলে এই বিশ্ব সংসার ভুলিয়া তিনি যাহা ভাবিতেন, যদি আমরা সেই ভাবনা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরাও এ হেন শ্মশান ছাড়িয়া কখনও

এই অনিত্য সংসারে মজিয়া থাকিতে পারিতাম না। এখানে সাম্য বৈষম্যের তারতম্য নাই; এখানে ছোট বড় বিচার নাই, এখানে স্বার্থপরতা নাই, এখানে পরনিন্দা নাই, এখানে বিদ্বান্ ও নির্ব্বোধ অভিন্নহৃদয়; যেমন নানা দিক্ হইতে নদী সকল প্রবাহিত হইয়া শেষে সমুদ্রে মিশিয়া এক হইয়া যায়, সেই-রূপ নানা দেশের নানা লোক, নানা জাতি আসিয়া এই পুণ্য-ভূমি শ্মশানে সমবেত হয়।

শ্মশান পরম পবিত্র ও পরম যোগের স্থান; এখানে পাপী বা পুণ্যবান্, মূর্খ বা বিদ্বান্, সকলকে সমভাবে সরল হৃদয়ে একত্রে শয়ন করিতে হয়। এখানে অন্ধ, খঞ্জ, বধির, গলিত-কুষ্ঠধারী, রূপের কন্দর্প, রাজা, প্রজা, ভিখারী, সকলকেই এক শয্যায় শয়ন করিতে হয়। এই স্থানে জাতিভেদ কোনও কালেই নাই। ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালে, সবল এবং দুর্ব্বলে, দাতা আর কৃপণে মনের সুখে এক শয্যায় শয়ন করিয়া থাকে। রাজা মহারাজ অথবা জমিদার, কোমল পুষ্পশয্যা বা দুগ্ধফেননিভ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া, এখানে সেই এক শয্যায় শয়ন করিয়া মহাসুখে চিরকালের জন্য নিদ্রা গিয়া থাকেন। এই স্থানে সতী নাই, অসতী নাই, বন্ধ্যা নাই, পুত্রবতী নাই, অবীরা নাই, সকলেরই তুল্য গতি। এখানে ঘুমাইলে জন্মের মত রোগ শোক ঘুচিয়া যায়, চির দুঃখের অবসান হইয়া চিরসুখ ভোগ হয়।

এখানে আসিলে প্রাণায়াম সিদ্ধ হয়, এখানে আসিলে বিনা

বায়ুরোধে কুম্ভকের উদয় হয়, এখানে আসিলে শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া একেবারে লয় হইয়া সকলের প্রাণ চিরসমাধির সুখ অনুভব করত চিরকালের জন্য সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া চিরদিনের জন্য সুখ ও শান্তি উপভোগ করে।

শান্তি! শান্তি! শান্তি!

।। শ্রী শ্রী শঙ্করী মাতা জি ।।

Published By

Shri Tailanga Swami Math

K-23/95, Pancha Ganga Ghat, Varanasi - 221001